আত্মঘাতী বাঙালী

প্রথম খণ্ড

আজি হতে শতবর্ষ আগে

আত্মঘাতী বাঙালী ঃ প্রথম খণ্ড

আজি হতে শতবর্ষ আগে

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

যা নিশা সর্বভূতানাং
তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি
সা নিশা পশ্যতোঃ মুনেঃ।

—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
২য় অধ্যায়, ৬৯তম শ্লোক

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও দি ইন্ডিয়ান প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৯৩এ
লেনিন সরণী, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

'আত্মঘাতী বাঙালী' শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর দ্বিতীয় বাংলা গ্রন্থ। তাঁর প্রথম বাংলা বই 'বাঙালী জীবনে রমণী' আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে প্রকাশিত হয়। সে বই যখন প্রকাশিত হয়, তখন নীরদবাবু দেশে ছিলেন, দিল্লীবাসী। তারপর দীর্ঘদিন তিনি প্রবাসে, ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ডে বাস করছেন। বিরহে ও অদর্শনে প্রেম গাঢ়তর হয়, এই বৈষ্ণব তত্ত্বটির আবার মর্মোপলব্ধি হবে পাঠক যখন এই বইটি পড়বেন। গোটা বঙ্গভূমি এবং বাঙালী সমাজ আগে কী অবস্থায় ছিল, ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে কোন্ সু-উচ্চ গরিমার চূড়ায় উঠেছিল এবং কোথায় নেমেছে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন লেখক তাঁর 'আত্মঘাতী বাঙালী'তে। ক্ষোভ ও জ্বালার পিছনে ঐকান্তিক প্রেম না থাকলে ৯১ বছর বয়সের লেখনী থেকে এ-রচনা বার হওয়া সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'আত্মঘাতী বাঙালী' তিন খণ্ডে সমাপ্ত হবে। বর্তমান গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড; এটির শিরোনাম—'আজি হতে শতবর্ষ আগে'। এই খণ্ডে ১৯০০ সনের কাছাকাছি বাঙালীর সামাজিক ও মানসিক জীবন কি ধরনের ছিল তার পরিচয় লেখক দিয়েছেন। এই জীবনের একটা বড় দিক ছিল নরনারীর প্রেমের নতুন ধারণার প্রকাশ। এগুলো যেমন বিবাহের ভেতর ছিল, তেমনি বাইরেও ছিল। নীরদবাবু তাঁর বইয়ে ঘরের প্রেমের যেমন বিবরণ দিয়েছেন, বাইরের প্রেমেরও তেমনি দিয়েছেন। বিদেশী শিক্ষায় বাঙালীর সমাজজীবনে ও ব্যক্তিজীবনে নবচেতনার পুষ্পসম উন্মেষ ও তার পূর্ণ বিকশিত রূপটি লেখক বিবৃত করেছেন এই খণ্ডে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের কাজে আমরা সবচেয়ে যাঁর কাছে ঋণী তিনি লেখক-পত্নী স্বয়ং, শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অমিয়া চৌধুরাণী। লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রেস-কপি তৈরী করে না দিলে এই গ্রন্থ-প্রকাশ সম্ভব হত না। মাত্র ঋণ স্বীকারে তাঁর কাজের সামান্যই মূল্য পরিশোধ হয়।

তিন খণ্ড প্রকাশ হবার পর সমগ্র গ্রন্থের বিস্তৃত সূচীপত্র নির্ঘণ্ট দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় মুদ্রণের নিবেদন

প্রথম প্রকাশের সময়ে দ্রুততার জন্য যে সকল মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছিল, বর্তমান মুদ্রণে সেগুলি সংশোধিত হল। তবু সহৃদয় পাঠকের চোখে যদি আরও কোন ভ্রান্তি ধরা পড়ে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমরা একান্তই বাধিত হব।

গ্রন্থকারের ঋণস্বীকার

কতকগুলি বাংলা বই আমি বিলাতে পাই নাই। শ্রীমতী নন্দিনী পান্ডী সে-গুলি আমাকে কলিকাতা হইতে আনিয়া দিয়াছেন। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাটিও আমার কাছে ছিল না। এটি নকল করিয়া আমাকে দিয়াছেন শ্রীমান বিশ্বদেব ভট্টাচার্য। এছাড়া শ্রীযুক্ত তপন রায়চৌধুরী ও শ্রীমান ত্রিলোকেশ মুখোপাধ্যায় আমাকে বই-এর ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

ইহা ছাড়া আর একটি ঋণও স্বীকার করিবার আছে, যাহাতে আমার দাম্পত্যজীবনের একটি নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। আমার প্রথম বই-এর ভূমিকাতে আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমার বই-সংক্রান্ত কোনও কাজ আমি পত্নীর উপর চাপাই নাই। তিনিও বই সম্বন্ধে নির্লিপ্তভাব দেখাইয়াছেন। কেবল আমাকে ভাল করিয়া খাইতে দিয়া এবং নানা সাংসারিক বাধাবিপত্তিতে ভরসা দিয়া আমার লেখকবৃত্তি বজায় রাখিয়াছেন। এবার কিন্তু তাঁহাকে দিয়া বইটির পান্ডুলিপি প্রস্তুত করাইতে হইল, আমার হস্তাক্ষর অত্যন্ত খারাপ বলিয়া এবং আমি নিজে প্রুফ দেখিতে পারিব না বলিয়া। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ শরীর লইয়াও শ্রমসাধ্য কাজটি করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রীর কাজের প্রশংসা করা স্বামীর পক্ষে শোভা পায় না। তাঁহার সহায়তায় বইখানা ছাপিবার সুবিধা হইয়াছে কিনা প্রকাশক বলিতে পারিবেন।

সূচীপত্র



অক্সফোর্ডে নিজের বাড়ির বাগানে

গ্রন্থকারের নিবেদন

আমার প্রথম বাংলা বই 'বাঙালী জীবনে রমণী' সত্তর বছরে পড়িবার পর লিখিয়াছিলাম। দ্বিতীয়টি নব্বুই বছরে পড়িবার পর আরম্ভ করিয়া একানব্বুই পূর্ণ হইবার প্রাক্কালে শেষ করিলাম। বলিয়া রাখি, আমার জন্ম হয় বাংলা ১৩০৪ সনের ৯ই অগ্রহায়ণ (ইংরেজী ২৩শে নভেম্বর, ১৮৯৭)।

যাঁহারা এই বই পড়িতে মনস্থ করিবেন, তাঁহারা বয়সের কথা শুনিয়া নিশ্চয় মনে করিবেন—জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের আবোল-তাবোল শুনিতে হইবে। তবে পড়িবার পর কি বলিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। নিজের দিক হইতে এইটুকুই জানাইব যে, বইখানা লিখিবার জন্য আমি যযাতির মত নিজের জরা পুত্রদের ঘাড়ে চাপাই নাই, শঙ্করাচার্যের মত সন্ন্যাসীদেহ ছাড়িয়া যুবক রাজার দেহেও প্রবেশ করি নাই। নিজের অবশিষ্ট জীবনীশক্তি দিয়াই বইখানা লিখিয়াছি। যে-জাতীয়জীবনের অবসানের কথা এই বই-এ লিখিয়াছি, উহার স্মৃতিই আমাকে বইটি লিখিবার শক্তি দিয়াছে।

আমার শেষ লেখা ইংরেজী বই-ও গত বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট অবনতির কাহিনী লিখিয়াছি। বাংলা বইটার বিষয়ও তাহারই অন্তর্ভুক্ত। দুই-এরই বিষয়—মানবজীবন ও সভ্যতার ক্ষয়; তবে একটা কাহিনী জগদ্ব্যাপী, আর একটা বাংলাদেশের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু ক্ষুদ্রতর বলিয়াই বাঙালী জীবন তুচ্ছ ছিল না। পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালীর স্থান থাকিবে সেই লুপ্ত জীবনের উৎকর্ষের জন্যেই।

সুতরাং সেই জীবনের অবসানের কাহিনী একটা ট্র্যাজেডী বলিতে হইবে। তবু মনে রাখা প্রয়োজন, পড়িতে যন্ত্রণাদায়ক হইলেও ট্র্যাজেডীর আঘাত গ্লানিকর নয়, উহা কোন তামসিকতার সৃষ্টি করে না। 'ট্র্যাজেডী' পাবক, আগুনের মত পোড়াইয়া বিশুদ্ধ করে, এই কথা সাহিত্যে 'ট্র্যাজেডী'র আবির্ভাবের সময় হইতেই সাহিত্যবিচারকেরা বলিয়াছেন। আশা করি বাঙালী জীবনে এই বইটি একটা শুদ্ধি আনিবে ও নূতন প্রয়াসের ইচ্ছা জাগাইবে।

আমার যে বয়স হইয়াছে, তাহাতে নিজের আর বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার পক্ষে যেটা অনিবার্য তাহা দুঃখ। তবে সে-দুঃখ নিজের জন্য নয়। এই কথাটা পাঠকদের বিশেষ করিয়া মনে রাখতে বলিব। আমার বাঙালী জীবন অবস্থাচক্রে বিদেশে—নির্বাসনেও বলা চলে, শেষ হইতে চলিয়াছে। কিন্তু সেটাও আমার জীবনে ব্যর্থতা না আনিয়া সার্থকতাই আনিয়াছে। বিলাতে বাস করিয়া আমি যে-ভাবে কাজ করিতে পারিতেছি দেশে থাকিলে কখনই তাহা সম্ভব হইত না। ইহাই যদি যথেষ্ট না হয় আমি এটাও বলিতে পারি যে, বিদেশে আরও বেশী পাইয়াছি। প্রথম কথা, দেশে আমার সারা জীবন দৈনন্দিন অন্নসংস্থানের চেষ্টায় কাটিয়াছে; অন্য কাজ

যাহা করিতে পারিয়াছিলাম তাহা সেই ধান্দার ফাঁকে ফাঁকে। বিদেশে আমি সেই চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি। তারপর, খ্যাতি বা সমাদর লাভও কম হয় নাই। যাহা দিবার মত শক্তি আমার ছিল, ও তাহার জোরে যাহা দাবী করিবার অধিকার আমার ছিল, তাহার অতিরিক্ত আমি না চাহিয়াও অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়াছি। অবশ্য একথা আমি কখনই বলিব না যে, আমি দেশবাসীর কাছ হইতে সমাদর পাই নাই, কিন্তু তাহা গোপনে, অপ্রকাশিত-ভাবে। বিদেশে সে-বিষয়ে আমাকে অনুমানের শরণ নিতে হয় নাই। বিদেশীরা প্রকাশ্যে আমাকে পুরস্কার দিয়াছে।

নিজের জীবনের প্রারম্ভ ও শেষের কথা মনে করিয়া আমি রবীন্দ্রনাথের একটি গান শুনিয়া থাকি।

সেটি এই—

আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধরেছে কলি
তোমারি লাগিয়া তখনি, বন্ধু বেঁধেছিনু অঞ্জলি ॥
তখনো কুহেলীজালে,
সখা, তরুণী ঊষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা উঠিতেছে ছলোছলি ॥
এখনো বনের গান, বন্ধু, হয়নি তো অবসান—
তবু এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর করুণ বল্লিকা,
ও তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরোঝরো হল, এই বেলা তোর শেষ কথা দিস্ বলি ॥

গানটি নিশ্চয় আমি যুবাবয়সেও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু জানি না কি করিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাই সম্প্রতি অক্সফোর্ডে বসিয়া রেকর্ডে শুনিবার পর অভিভূত হইয়া পড়িলাম। স্ত্রীকে ইহার নূতনত্বের কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, 'নতুন বলছ কেন? আমাদের ফুলশয্যার রাত্তিরে প্রিয়বালা (আমার বোন) তো গেয়েছিল।' আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না, উহা মেয়েমহলে ঘটিয়াছিল। তাই শুনি নাই। কিন্তু পত্নীর উক্তি শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগিনী সেই বিশেষ রাত্রিতেই গানটা গাহিয়াছিল কেন। হয়ত নূতন গান বলিয়াই গাহিয়াছিল, তাৎপর্যের কথা ভাবে নাই। সে নিশ্চয়ই মনে করে নাই যে, আমাদের জীবনবল্লিকাতে যে-মল্লিকাফুলের প্রথম কলি সবে দেখা দিয়াছিল, তাহা ফুলশয্যার রাত্রিতেই (২৩শে এপ্রিল, ১৯৩২ সন, ১০ই বৈশাখ, ১৩৩৯) শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং শেষ কথা বলিবার লগ্ন আসে নাই। আমাদের দুইজনের পক্ষে শ্রান্ত হইয়া শেষ কথা বলিবার সময় আজও আসে নাই।

তবু আমাকে অপরিসীম দুঃখে বলিতে হইবে—বাঙালী জীবনের শেষ কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। আমি বাঙালী জীবনের শ্রান্তি ও অবসাদ ১৯২২-২৩ সন হইতে অনুভব করিতে আরম্ভ করি। ১৯৩৬-৩৭ সনে

এবিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখি। সেই পুরাতন রচনা হইতে অনেক কথা এই বই-এ উদ্ধৃত করিব।

কিন্তু ১৯৩৭ সনের পূর্বে যাহা শুধু অনুভূতিসাপেক্ষ ছিল, সেই বৎসরে তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ হইল। সেই বৎসরে ১৯৩৫ সনের ভারতশাসনের নূতন আইন প্রবর্তিত হইল। উহা যে হিন্দু বাঙালীর মৃত্যুদণ্ড তাহার প্রকৃত ধারণা আজ পর্যন্তও হয় নাই। আমার নূতন ইংরেজী বই-এ এই ব্যাপারটার আলোচনা করিয়াছি। তখন হইতে বাঙালী জীবনের ক্ষয় বাড়িয়া চলিল। অবশেষে ১৯৪৭ সনে চরমে পৌঁছিল। সেই মৃত্যুশয্যার বিবরণই এই বই-এ দিব।

তবু এই জাতীয় মৃত্যুই কি বাঙালীর পক্ষে শেষ কথা? ব্যক্তি-বিশেষের পুনর্জন্ম হয়, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু জাতির বেলায় হইতেও পারে। বাঙালীর জাতীয় পুনর্জন্ম অতীতে দুইবার হইয়াছে। উহার উল্লেখ ও আলোচনা পরে করিব। ভবিষ্যতে আর একবার হইতে পারে এই আশা করিয়াই বইখানা লিখিলাম। যদিও বা হয়, সে পুনর্জন্ম আমি দেখিব না। কিন্তু আমার দেখা-না-দেখার কোনো অর্থ আছে কি? কাল নিরবধি। আমার জীবনের সঙ্গেই বাঙালীর জাতীয় জীবন শেষ হইয়া যাইবে না। বাঙালীর ইতিহাস থাকিবে, বাঙালী আবার যদি উন্নত নাও হয়, তাহা হইলেও তাহার সৃষ্ট যে কীর্তি তাহার ঐতিহাসিক সার্থকতা থাকিবে। সেই ইতিহাসে আমার নাম থাকিবে এই ভরসা আমি রাখি। সেই ভরসাতেই ৯১ বছরে পড়িয়াও বইখানা লিখিবার আগ্রহ ও শক্তি দুই-ই পাইলাম।

এরপর শুধু একটা কথা বলিতে বাকী। এই বইএ যাহা লিখিয়াছি, তাহা বানানো ছেঁদো কথা নয়। ইহাতে সত্যকার ইতিহাসের উপর কোন দার্শনিক তত্ত্বও চাপাই নাই। ইহাতে যাহা আছে তাহা সত্যকার ঘটনা; সত্যকার চিন্তা ও কর্ম এবং সত্যকার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বর্ণনা। অবশ্য আজিকার দিনে বাঙালীর মনে হইতে পারে যে, এই কাহিনীতে কাল্পনিক কথা আছে, কল্পনার রং ও সুর চাপানো হইয়াছে। আসলে এই আপত্তিটাই কাল্পনিক হইবে। সকল যুগে ব্যক্তি বিশেষের বা জাতি বিশেষের মনের স্বর এক পর্দায় বাঁধা থাকে না। উহা জাতীয় জীবনের প্রাণের জোয়ার ও প্রাণের ভাঁটার সঙ্গে চড়ায় ওঠে ও খাদে নামে। তাই খাদ একমাত্র সত্য, চড়া মিথ্যা মনে করা ভুল হইবে। আজ বাঙালী জীবনে যে জিনিষটা প্রকৃতপক্ষেই ভয়াবহ সেটা এই: মৃত্যুযন্ত্রণারও অনুভূতি নাই; আছে হয় পাষাণ হইয়া মুখ বুজিয়া সহ্য করা, অথবা সংজ্ঞাহীন হইয়া প্রাণ মাত্র রাখা; আরেকটা ব্যাপারও আছে—জাতির মৃত্যুশয্যার চারিদিকে ধনগর্বে উল্লসিত বাঙালী প্রেত ও প্রেতিনীর নৃত্য।

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

উপক্রমণিকা

আজি হতে শতবর্ষ আগে

গ্রন্থের এই ভাগে বাঙালীর জাতীয় যৌবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। বাঙালীর জাতীয় আত্মহত্যা অকালমৃত্যু। প্রাকৃতিক নিয়মে উহা ঘটিবার কোনও কারণ ছিল না। সুতরাং শুধু এই কারণেই উহা শোচনীয়। তাহার উপর যদি সেই যৌবনধর্মের রূপ কি ছিল তাহার সন্ধান লওয়া যায় তাহা হইলে ব্যাপারটা আরও মর্মান্তিক মনে হইবে। তাই যে কাহিনী আমি লিখিতে চাহিতেছি তাহার ভূমিকা হিসাবে অতীত জীবনের কথা বলিতে চাই।

যে-বাঙালীর মধ্যে সেই যৌবনের ভরা জোয়ার দেখা গিয়াছিল, তিনি যুবক রবীন্দ্রনাথ। সে-যুগেও তাঁহার জীবনের জোয়ার ও সমসাময়িক সাধারণ বাঙালীর জীবনের জোয়ারের মধ্যে বেশ তফাৎ ছিল। উপমা হিসাবে কলিকাতার গঙ্গায় জোয়ার ও কালিঘাটের আদি গঙ্গায় জোয়ারের উল্লেখ করিব। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে আদি গঙ্গার জোয়ার কলকাতার বড় গঙ্গার জোয়ার হইতেই আসে। তেমনই রবীন্দ্রনাথের জীবনের জোয়ার হইতেই তাঁহার সমসাময়িক বাঙালীর জীবনে জোয়ার আসিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে জোয়ার অনুভব করিয়া, বাঙালীর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া বাংলা ১৩০২ সনের ২রা ফাল্গুন তারিখে এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন,—

> আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
> কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
> কৌতূহলভরে,
> আজি হ'তে শতবর্ষ পরে।
> আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
> লেশমাত্র ভাগ,
> আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
> আজিকার কোনো রক্তরাগ—
> অনুরাগে সিক্ত করি' পারিব কি পাঠাইতে
> তোমাদের করে,
> আজি হতে শতবর্ষ পরে ॥

যে ১৪০০ সনের কথা মনে করিয়া তিনি এই কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন, সেই বৎসর আসিতে মাত্র পাঁচ বৎসর বাকী। ১৩০০ সনের নববসন্তের প্রভাতের বিভা দূরে থাকুক, উহার অস্তের রক্তিমচ্ছটাও আজ বাঙালীর জীবনে দেখা যায় না। এমন কি সেই প্রভাতের স্মৃতিও প্রায় লুপ্ত। আশ্চর্যের কথা এই 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' লিখিবার পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ

নিজের জীবনেই যেন অনুভব করিয়াছিলেন যে, সেই বসন্তের অবসান হইয়া গিয়াছে। এই অনুভূতি ১৩২৩ (ইং ১৯১৬) সনে প্রকাশিত 'বলাকা'র একটি অতি সুন্দর কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছিল। সেটি এই—

'যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণ-তলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে :
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল রক্তিমচুম্বনে—'

তাহার কি হইল ? রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

'সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।'

সেই নিস্তব্ধ সকরুণ অপরাহ্নও আর নাই। বাঙালীর জাতীয় যৌবনের প্রভাতের কথা দূরে থাকুক উহার সন্ধ্যার কথাও কেহ বলে না। শুধু উহাই আত্মঘাতী হইবার একটা লক্ষণ। 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' কবিতাটি লিখিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যেই আমার জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং আমি সেই জীবনের মধ্যাহ্ন হইতে সায়াহ্ন পর্যন্ত দেখিয়াছি। তাই উহার অবসানের কাহিনী আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতে পারিব।

প্রথম অধ্যায়

বাঙালীর পুনর্জন্ম

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই বাঙালীর জীবনে একটা পরিবর্তন আরম্ভ হয়। উহা ইংরেজের সহিত সংশ্রব ও আংশিক ভাবে ইংরেজী ভাষা জানার ফল। গোড়ায় এই পরিবর্তনটা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই শুধু আচার-ব্যবহারে দেখা গিয়াছিল। ক্রমে উহা মনোজগতে পৌঁছিল। সেটা ইংরেজী সাহিত্য পড়ার ফল। এই সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে। ইহার পর ১৮৩৫ সনে যখন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার বাহন বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন হইতে বাঙালীর মনের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আরও বাড়িতে লাগিল। অবশেষে ১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাঙালী মনের নূতন রূপ সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। ইহাকে বাঙালী জীবনের "রিনেসেন্স" বলা যাইতে পারে। আসলে এই পরিবর্তনকে একটা মানসিক "রিভল্যুশ্যন"ই বলা উচিত। এই নূতন ধরনের বাঙালীকে "ইয়ং বেঙ্গল" নাম দেওয়া হইল। এই নামকরণ হইল জার্মানীর "ইয়ুঙ্গে ডয়েচ্" নামের অনুকরণে।

কিন্তু ইহার আগে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেও বাঙালীর আর একবার নবজন্মলাভ ঘটিয়াছিল। উহা চৈতন্যদেবের জন্য, তাঁহার প্রবর্তিত নূতন বৈষ্ণব ভক্তি প্রচারের ফলে। উহার আগে বাঙালীর মানসিক জীবন কি ছিল তাহার সম্পূর্ণ ধারণা করার মত তথ্য প্রমাণ নাই। তবে যতটুকু আছে তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, মানসিক জীবনে সংস্কারের বিচারহীন বশ্যতা বা দাসত্ব ভিন্ন সক্রিয় বা উচ্চস্তরের কিছুই ছিল না। এ-বিষয়ে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে' কয়েকটা কথা আছে, তাহা উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপে 'লক্ষ কোটি' অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আচারে ও ব্যবহারেই তাহাদের কাল ব্যর্থ হয়। যেমন,

'কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥

শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এইমাত্র করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে ডুবে মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বহি গুণ কেহ করে না কথন॥
যে বা সব বিরক্ত তপস্বী-অভিমানী।
তা-সভার মুখেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জানে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার।
কেমতে এই সব জীব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥'

(এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও না বলিয়া পারিলাম না যে, কলিকাতা হইতে বাঙালীর অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে ধরনের সংবাদ পাই তাহার সহিত বৃন্দাবন দাসের বিবরণের সাদৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করি। চিঠিপত্র কেবল পুত্রকন্যার বিবাহ ও চাকুরীর সংবাদে পরিপূর্ণ। অধ্যাপকগণ নানা বিলাতী শাস্ত্র পড়ান বটে কিন্তু 'গ্রন্থ অনুভব' করেন বলিয়া মনে হয় না। ফলে তাঁহাদের ও তাঁহাদের শ্রোতাদের একমাত্র পরিণাম হয় 'যমপাশে ডুবিয়া মরা'। পূজা-অর্চনাও প্রধানত তামাশা, তাহা না হইলে বড়জোর নিম্নস্তরের আচার। অক্সফোর্ডের বাঙালীও এখন অন্য প্রবাসী বাঙালীকে সত্যনারায়ণের সিন্নি পাঠায়।)

কিন্তু চৈতন্য আসিয়া বাঙালীর জীবনে প্রাণের স্রোত বহাইলেন। একটা কথা বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন। সেটা এই—চৈতন্যদেব সম্বন্ধে জনপ্রচলিত ধারণাটা একদিক হইতে ভুল। তিনি একমাত্র প্রেমের প্রচারক ছিলেন না; নাচুনে-কাঁদুনে তো ছিলেনই না। 'মেরেছিস কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দিব না,' ইহাতে যে ভাবের প্রকাশ উহা তাঁহার আচরণের একটা দিক মাত্র। আর একটা দিক বিপ্লববাদীর। তাহার কিছু পরিচয় দিব। পুরাতনপন্থীরা অর্থাৎ তখনকার দিনের অচলায়তনের পুরোহিতগণ চৈতন্যের নিন্দা করিত এই বলিয়া যে,

'পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত।
নাচে, কাঁদে, হাসে, গায় যৈছে মদমত্ত॥'

চৈতন্য-চরিতামৃতকার ইহাদের এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

'মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ড যত পড়ুয়া অধম।'

(আজিকার কলিকাতায় এই ধরনের 'পড়ুয়া'র অভাব নাই) চৈতন্যদেবের

যুগের পড়ুয়ারা গিয়া কাজীর কাছে নালিশ করিল। কাজী চৈতন্যদেবের শিষ্যদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। চৈতন্য ইহা অহিংসভাবে সহ্য না করিয়া ভক্তদের লইয়া কাজীর বাড়ী আক্রমণ করিলেন, ও উত্তেজনার বশে শান্তিপুরের ভাষা ভুলিয়া শ্রীহট্টের ভাষায় গর্জন করিলেন, 'তোরে মাইরা ফালাইমু'। তখন বাঙালী বিপ্লববাদীর জন্ম বাংলা দেশেই হইত। কাজের বেলায় যে-কোন দাসত্ব স্বীকার করিয়া বিপ্লববাদীর উপাসনা করিবার জন্য বাঙালী কিউবার দিকে চাহিয়া থাকিত না।

চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলিতে চাহিতেছি। যখনই বাঙালীর জীবনে কোন নূতন স্রোত বহিয়াছে তাহার সঙ্গে প্রেমেরও প্রবাহ দেখা গিয়াছে। চৈতন্যদেবের ভক্তির সহিত প্রেম কি ভাবে জুটিয়া গেল তাহার প্রমাণ 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে দিতেছি। চৈতন্যদেব পুরী হইতে বৃন্দাবন যাইবার সংকল্প করিয়া—

'প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥'

অর্থাৎ মেদিনীপুর পর্যন্ত আসিয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার পথ না ধরিয়া ভুবনেশ্বরের কাছ হইতে উত্তরমুখীন হইয়া আরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চল (অর্থাৎ ঢেঁকানাল ও কেয়োঁঝড় অঞ্চল) ধরিয়া চলিলেন। এখনও সে অঞ্চলে বাঘের উৎপাত আছে। তখন তো ছিলই। কিন্তু চৈতন্য যখন সংকীর্তন করিতে করিতে বনের ভিতর দিয়া চলিলেন, হস্তী ব্যাঘ্র তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। তবে এক জায়গায় বনপথে একটি বাঘ ঘুমাইয়াছিল, প্রভুর পা তাহার উপর পড়িল। সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য ভয়ে অস্থির, কিন্তু চৈতন্য শুধু বলিলেন—'কহ কৃষ্ণ', আর বাঘ খাড়া হইয়া উঠিয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিত লাগিল। তাহা শুনিয়া মৃগীরাও আসিয়া যোগ দিল। কবিরাজ গোস্বামী সেই দৃশ্যের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন,

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ" করি প্রভু যবে কৈল।
"কৃষ্ণ" কহি ব্যাঘ্রমৃগ নাচিতে লাগিল ॥
নাচে কাঁদে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখে অপূর্ব রঙ্গে ॥
ব্যাঘ্রমৃগ অন্যান্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যান্যে চুম্বন ॥'

এখন চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভক্তির প্রসার পাশ্চাত্ত্য জগতে হইয়াছে। আমি তাহার রূপ ইংলণ্ডে দেখিতেছি, আমেরিকায় দেখিয়াছি, ও ক্যানাডাতেও দেখিয়াছি। কিন্তু প্রেমের এমন উৎসার পাশ্চাত্ত্য জগতেও (যে জগৎ কামজ ব্যসনে প্লাবিত তাহাতেও) দেখি নাই। শ্বেতাঙ্গ নেড়ানেড়ীদের প্রেমের আবেগ অতি নিম্নস্তরের। চৈতন্যের যুগের সহিত তুলনীয় ব্যাপার আবার ইংরেজী শিক্ষার পর বাংলাদেশে দেখা ছিল। অবশ্য মনুষ্যজাতীয় বাঙালীর মধ্যে, শুধু বাংলার বাঘ ও বাংলার হরিণীর মধ্যে নয়।

কিন্তু প্রাগ্‌-ব্রিটিশযুগে চৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠিত ভক্তি এবং প্রেমও অনেক নীচে নামিয়া গেল। এ-বিষয়ে কাব্যের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ যে বর্ণনা পরেকার বাঙালীর লেখার মধ্যে পাওয়া যায়, প্রাগ্‌-ব্রিটিশ যুগের বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর প্রচলিত ব্যবহারে তাহার লেশমাত্রও ছিল না। তাহার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষে' বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের কীর্তনের এই বিবরণ পাই—

'কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় অর্কফলা নড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল, কথা কইতে যে…" বলিয়া কীর্তন করিতেছে।'

আজকালকার বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের হয়ত গানটার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিতে হইবে। রাধিকা কৃষ্ণের প্রণয়িনী হইলেও সম্পর্কে পরেকার বৈষ্ণব কাহিনীতে কৃষ্ণের মামী। সুতরাং জ্যেষ্ঠ বলরাম সঙ্গে থাকিতে তাঁহার সম্মুখে 'চুটিয়ে পীরিত' করা সম্ভব ছিল না। তাই দুঃখ রহিল। কীর্তনের যে রূপ দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছিলেন, (যাহাতে আমরা শুনিলাম 'দেবতা ভিখারী মানব-দুয়ারে দেখে যা রে তোরা দেখে যা' কিংবা 'আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধু হে ফিরে এসো।') তাহা ইংরেজী কাব্য আসিবার আগে শোনা সম্ভব ছিল না। তবে এই সূত্রে একটা কথাও বলিব। আমার বাল্যকাল ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ শহরে কাটে। তখন প্রতি বৎসর একদল বোষ্টম-বোষ্টমী শান্তিপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কীর্তন গাহিত, বেহালার সঙ্গে। একটা গানের প্রথম অংশটা এখনও মনে আছে—

'আহা মরি মরি, বাজিল বাঁশরী
শুনলো কিশোরী শ্রবণে।
"যাই গো যাই, ওগো রাই"
বাঁশী "রাধা রাধা" বলে সঘনে।'

অল্পবয়স্কা বোষ্টমীদের কমনীয় মূর্তি আমার এখনও চোখে ভাসে। কিশোরগঞ্জে একটা আখড়া ছিল, তাহার বোষ্টমীরা রবিবার রবিবার ভিক্ষা করিতে আসিত। তাহাদের চেহারা দেখিয়া কাহারও মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা মাত্রও ছিল না। কিন্তু আট-নয় বছরের বালক হইলেও কিশোরগঞ্জের বৈষ্ণবীদের সহিত শান্তিপুরের বৈষ্ণবীদের পার্থক্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতাম। প্রথাগত কৃষ্ণবিষয়ক গানেও যেন যুগধর্মে একটা নূতনত্ব আসিয়াছিল। গায়িকাতেও।*

সে যাহাই হউক, ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে বাঙালী জীবনে সর্বদিকেই যে একটা নূতনত্ব দেখা গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তখনকার দিনের উদার এবং বিচক্ষণ ইংরেজ শাসকও এ-বিষয়ে অবহিত

* শরৎচন্দ্রের কুসুমের মত বোষ্টমী ও বৃন্দাবনের মত বোষ্টম, কিংবা রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমী?

ছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্ স্যর হেনরী সাম্‌নার মেন্, তিনি লর্ড লরেন্সের শাসন পরিষদেরও আইন বিষয়ক সদস্য ছিলেন। তিনি ১৮৬৬ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশ্যনের সময়ে সমবেত বাঙালীদের এই কথা বলেন—

'There is not one in this room to whom the life of a hundred years since would not be acute suffering if it could be lived again. It is impossible even to imagine the condition of an educated native with some of the knowledge and many of the susceptibilities of the nineteenth century—indeed, perhaps, too many of them—if he could cross the immense gulf which separates him from the world of Hindu poetry, if indeed it ever existed.'

মেন্ কেন হিন্দুর পুরানো কাব্য জগতের কথা বলিয়াছিলেন তাহার কারণ পরে দিব। এখানে শুধু মানসিক পরিবর্তনের উল্লেখই প্রণিধান করিতে বলিব।

বিলাতে ফিরিয়া যাইবার পর মেন্ অক্সফোর্ডে অধ্যাপক হন। তখন সেখানে একটি বক্তৃতায় বাংলাদেশ ও বাঙালীর মধ্যে তিনি কি দেখিয়াছিলেন তাহার কথা বলেন। বক্তৃতার তারিখ ১৮৭১ সন। তিনি বলেন—

'I have had unusual opportunities of studying the mental condition of thc educated class in one Indian province, though it is so strangly Europeanized as to be no fair sample of native society taken as a whole, its peculiar stock of ideas is probably the chief source from which influences proceed and which are more or less at work everywhere. Here has been a complete revolution of thought, in literature, in taste, in morals and in law. I can only compare it to the passion for the literature of Greece and Rome which overtook the Western World at the Revival of Learning'.

স্যর হেন্‌রী মেন অবশ্য বাংলাদেশ ও বাঙালীর কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন,—

'The new generation of ,Bengalis saw in the intellectual life of Europe a force to extend their mental horizon.'

এই মানসিক বিবর্তনের ফলে বাঙালী তাহার অতীত চিন্তাধারা, অর্থাৎ

যাহা প্রধানত স্মার্ত, নৈয়ায়িক বা বৈদান্তিকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাহাকে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করিতে প্রস্তুত ছিল। এ-বিষয়ে মেন্ বলিলেন,—

> 'Finding that their own system of thought was embarassed in all its expressions by the weight of false physics, elaborately inaccurate, careless of all precisions in magnitude, number and time, the educated Bengalis were turning to western thought, especially in its scientific form'.

মেন্ বলেন, এই ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল বাঙালী মনের স্বাভাবিক মনীষার জন্য। তাঁহার উক্তি এই—

> 'To a very quick and subtle minded people which has hitherto been denied any mental food but this, mere accuracy of thought is by itself an intellectual luxury of the highest order'.

নবযুগের বাঙালীদের মানসিক ধর্ম সম্বন্ধে মেন্ আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন, তাহা যেখানে প্রাসঙ্গিক সেখানে উদ্ধৃত করিব। আমি বলিয়া থাকি মেনের মত ইংরেজ যদি ভারতবর্ষে আর একটিও আসিত, তাহা হইলে ইংরেজ-ভারতীয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ১৯০০ সনে যে তামসিক স্তরে পৌঁছিয়াছিল, তাহা ঘটিত না।

এই নূতন জীবনধারা সম্বন্ধে লিবারেল বাঙালী এবং কন্সারভেটিভ বাঙালীর মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দও পাশ্চাত্ত্য ধারা গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। আসল বিরোধ তখন দেখা যাইত ভাট-পাড়া নবদ্বীপ কাশীবাসী পণ্ডিত ও ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত বাঙালীর মধ্যে। ইংরেজীতে শিক্ষিত বাঙালী যে পণ্ডিতদের কথা বুঝিতেও পারিত না, এবং পণ্ডিতরা যে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মুখে বাংলা ভাষাও বুঝিত না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রও লিখিয়াছিলেন। তাহার উক্তি আমি 'বাঙালী জীবনে রমণী'-তে উদ্ধৃত করিয়াছি। তবু এ-প্রসঙ্গে আবার উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। কথাগুলি এই—

> 'গোলযোগের কথা এই যে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্ত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না।
>
> 'ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাপ্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা

প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ংগম হয় না।'

এই কথাগুলি বঙ্কিম 'গীতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের বেলাতেই যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে আধুনিক জীবনের আলোচনার বৈষম্যটা কতদূর দাঁড়াইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

স্যর্ হেনরী মেন্ এই মানসিক পরিবর্তনের কথা বলিতে গিয়া ইংরেজের পক্ষ হইতে কোনো অহঙ্কার এমন কি আত্মপ্রসাদেরও কারণ দেখেন নাই। তিনি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'আমরা ভারতবর্ষের লোককে যাহা দিতেছি, তাহার জন্য প্রশংসার দাবী করিতে পারি না কারণ আমরা নিজেরা যাহা পাইয়াছি, তাহারই বলে দান করিতেছি। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার চিন্তাধারা প্রাচীন গ্রীস হইতে আসিয়াছে, আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে উহা পাইয়া, ভারতবাসীদের দিতেছি।'

অর্থাৎ ভারতবাসীর নূতন চিন্তাধারার পিছনে যে প্রভাব সবচেয়ে বলবৎ তাহা প্রাচীন গ্রীসের দান। আশ্চর্যের কথা এই যে, মেন্ এই কথা বলিবার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে স্বামী বিবেকানন্দও তাহাই বলেন,—একটি ইংরেজী বক্তৃতায়। তিনি যে মেনের বক্তৃতাটি পড়িয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তিনি সম্ভবত নিজেও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার পিছনে রহিয়াছে প্রাচীন গ্রীস। ১৮৯৮ সনে কলিকাতায় একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন,—

> 'Let us remember that the civilization of the West has been drawn from the fountain of the Greeks ..'

তিনি এটাই অনুভব করিয়াছিলেন যে, সেই গ্রীক ধারাই ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাই তিনি আর একটি বক্তৃতায় বলেন—

> 'Two branches of the same human stock had settled in two widely separated lands, and worked out in different circumstances and environments the problems of life, each in its particular way. They were the ancient Greeks and the ancient Hindus'.

তারপর কি হইল ? বিবেকানন্দের উত্তর—

> 'But now they were meeting ; the ancient Hindu was meeting the ancient Greek on Indian soil as a result of the English conquest of India, because European civilization was Greek in everything.. slowly and silently the leaven has come, the broadening out, the life-giving, and the revivalist movement that we see all around us has been worked out by these forces

together. A broader and more generous conception of life is before us'.

বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে এই মানসিক বিবর্তন এভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল যে, উহার প্রকৃত রূপ বোঝা সহজ হয় নাই। গভর্নর-জেনারেল হিসাবে লর্ড কার্জন উহা দেখিয়া ১৮৯৯ সনের ২৬শে জুলাই অধ্যাপক ম্যাক্স্ মূলারকে একটি পত্র লেখেন। (আমি লর্ড কার্জনের নিজের হাতে লেখা চিঠিখানা ম্যাক্স্ মূলারের কাগজ-পত্রের মধ্যে দেখিয়াছি।) চিঠিখানার একটি অংশ এইরূপ—

'There is no doubt that a sort of quasi-religious, quasimetaphysical ferment is going on in India, strongly conservative and even reactionary in its general tendency. The ancient philosophies are being re-exploited, and their modern scribes and professors are increasing in numbers and fame.

'What is to come out of this strange amalgam of superstition, transcendentalism, mental exaltation, and intellectual obscurity--with European ideas thrown as an outside ingredient into the crucible—who can say ?'

লর্ড কার্জন মানসিক বিবর্তনের এই বিশেষ রূপ কেন দেখিয়াছিলেন, তাহার কথা পরে বলিব। সেই সঙ্গে তিনি যে-প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, তাহার উত্তরও পরে দিব। তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ 'who can say ?'

আজ তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভব। যে লক্ষ্যস্থল লর্ড কার্জন দেখিতে পান নাই, দেখা তখন সম্ভবও ছিল না, তাহা নিজের জীবনে আমি দেখিয়াছি। সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার ইতিহাসই এই বইটির বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নব জাগরণের পূর্বাবস্থা

যে মানসিক বিবর্তনের কথা আগের পরিচ্ছেদে বলিলাম, উহা যে ঘটিয়াছিল এবং ইংরেজী ভাষার প্রসার হইতেই ঘটিয়াছিল, কেহই তাহা অস্বীকার করে নাই। কিন্তু যে-জীবন ও যে-সমাজের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়িল, তাহার অবস্থা ও ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ও নির্ভুল ধারণা মোটেই দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে ইতিহাসের দিক হইতে অসত্য ও ভিত্তিহীন একটা ধারণাই উদ্ভূত ও প্রচলিত হইয়াছিল। সেটা এই—বাঙালী প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সেই সভ্যতা বাঙালী জীবনে অটুট ছিল, কেবল তাহার উপর পাশ্চাত্ত্য জীবন ও সভ্যতার আঘাত পড়িল, ফলে দুই-এর মিশ্রণে প্রাচীন সভ্যতা অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হইল—ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন বাঙালী-জীবন এই দুই ধারার সমন্বয়ের ফল।

তখন সকলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন ও সমন্বয়ের কথা বলিত। এই বিষয়ে ব্রাহ্মপন্থী 'লিবারেল' বাঙালী ও নব্য হিন্দু 'কনসারভেটিভ' বাঙালীর মধ্যে কোনও মতভেদ ছিল না। শুধু প্রথম দল পরিবর্তনের পথে যতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিল দ্বিতীয় দল ততদূর অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করিত না। এই তো গেল বাঙালীর নবজীবনের যৌবন পর্যন্ত বিবাদ। তারপর ১৯০০ সনের পর হইতে বাঙালীর নূতন জীবন যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তখন বাঙালী মনে করিত যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন ঘটানোই বাঙালীর কৃত্য। যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিলেন—'বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়'। ইউরোপীয় ব্যাঘ্র ও হিন্দু বৃষ দুইই বুদ্ধি-বিবেচনা ও মানসিক শক্তিতে সমান, এটা সকলেই ধরিয়া লইয়াছিল, কাহারও মনে এই সন্দেহ জাগে নাই যে, ইউরোপীয় ব্যাঘ্র ও বাঙালী বৃষভের মধ্যে সকল ব্যাপারেই গভীর তারতম্য থাকিতে পারে, অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ যাহাকে পূর্ণ বয়সের বৃষভ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন সে বাছুর মাত্র হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথও এই সমন্বয়ের বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করিতেন ইহাই ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মূল সূত্র; মানব জীবন ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যুগে যুগে যাহা ঘটিয়াছে তাহা সেই সূত্রেরই অনুযায়ী।

এই বিশ্বাসের বশেই তিনি লিখিয়াছিলেন,

> কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
> কত মানুষের ধারা
> দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে
> সমুদ্রে হল হারা।
> হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,

হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শকহূণদল পাঠান-মোগল
এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এই কবিতাটির তারিখ ১৮ আষাঢ় ১৩১৭ (ইংরেজী ১৯১০ সনের জুনের শেষ অথবা জুলাই-এর আরম্ভ)। আগেকার ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া শুধু ইংরেজ রাজত্বের যুগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই পাঠককে প্রণিধান করিতে বলিব। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন,

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।

*　　　*　　　*

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

বলাই বাহুল্য এই বাণী সকল বাঙালীই শ্রদ্ধা ও অবিচল বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। আমিও করিয়াছিলাম। ১৯২৩-২৪ সন পর্যন্ত আমি সমন্বয়েই আস্থাবান ছিলাম। কিন্তু ১৯২৫ হইতে আমার মনে সন্দেহ জাগিতে আরম্ভ করে। সেই বৎসরের শেষের দিকে আমি ইংরেজীতে একটা প্রবন্ধ লিখি। সেটা ১৯২৬-এর জানুয়ারী মাসে কলিকাতার ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্র স্টেট্‌স্‌ম্যানে প্রকাশিত হয়। উহাতে আমি অস্বীকার করিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘাত ঘটিতেছে। আমি বলিয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় ধারা প্রতিষ্ঠিত রাখিবার সংকল্প মৌখিক কথামাত্র, আমরা ক্রমশ পাশ্চাত্ত্যের দিকে চলিয়াছি একটা প্রবল অনুকরণের ঝোঁকে।

কিন্তু তখনও আমি এই ব্যাপারটা কেন ঘটিতেছে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। দুই তিন বৎসরের মধ্যে সেটা আবিষ্কার করিলাম। কি-ভাবে করিলাম প্রথমে তাহার কথা সংক্ষেপে বলি। তখন আমার মনে একটা সংকল্প জাগিয়াছিল যে, আমি ব্রিটিশ যুগে বাঙালী জীবনের একটা ইতিহাস

লিখিব, তাহাতে নবজাগরণের ফলে সাহিত্যে ধর্মে রাজনীতিতে ও অন্য নানাদিকে বাঙালীর সৃষ্টিকার্য এবং কীর্তির কথা থাকিবে। তখনই এটাও দেখিলাম যে, এই ইতিহাস লিখিতে হইলে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হইবার আগে সর্বদিকে বাঙালীর অবস্থা কি ছিল তাহার খোঁজ প্রথমেই লইতে হইবে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে অবস্থা ছিল তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রমাণ আছে তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। উহার ফলে আমাদের প্রথাগত জাতীয় জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল তাহার আমূল পরিবর্তন করিতে হইল। তখন যে-সব নূতন ধারণা জন্মিল তাহার মধ্যে মুখ্য যেগুলি তাহার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমেই আমি দেখিলাম যে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার সহিত, অর্থাৎ মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে হিন্দুর যে সভ্যতা ছিল তাহার সহিত, বাঙালীর লৌকিক জীবনের সাদৃশ্য নাই; দুইএর মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুর বৈদগ্ধ্যও লোপ পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের জীবন অনেক সহজ সরল গ্রাম্য রূপ ধারণ করিয়াছে। দুয়েকটা উপমা দিয়া পরিবর্তনের রূপটা স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। বৈষম্য অনেকটা চষা ক্ষেত ও পতিত জমির প্রভেদের মত, অট্টালিকা ও খড়ে ছাওয়া কুটিরের প্রভেদের মত, বিভূতিভূষণের প্রিয় ঘেঁটুফুলের গন্ধ ও কেশর-চম্পকের সৌরভের তফাতের মত।

ভাষাগত দৃষ্টান্তও দিতেছি। 'কৃষ্ণ' ও 'রাধিকা' নাম হিসাবে ও ব্যুৎপত্তিতে 'কানু' ও 'রাই'-এর সহিত এক। কিন্তু ব্যঞ্জনায় এগুলির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সংস্কৃত রচনায় ও বাংলা রচনায় তাঁহাদের আচরণেরও স্পষ্ট বিভিন্নতা দেখা দিল। যেমন, সংস্কৃত কবিতায় রাধার গোপিনীত্ব প্রচার করিতে হইলেও কবি শুধু এই পর্যন্ত নামিত—

রাধিকা দধিবিলোড়নস্থিতা
কৃষ্ণবেণু-নিনদৈরথোদ্ধতা
যামুনং তটনিকুঞ্জমঞ্জসা
সা জগাম সলিলাহৃতিচ্ছলাৎ।

কিন্তু প্রচলিত বাংলায় রাধিকার চলার বর্ণনা করা হইল এইভাবে—

রাই চলে যেতে ঢলে পড়ে
তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।

আমার ময়মনসিংহের ভাষায় গ্রাম্যতা আরও দুই পদায় চড়িত। আমার বোন বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী পেঁীছিলে গ্রাম্য মেয়েরা বধূবরণ করিবার সময় এই গানটি গাহিয়াছিল—

রাই-এর পইরন গরদ জোরা
চলতে করে লেরাবেরা
কাশ্মিরী পাগুরী রাইএর মাথে।

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আসিবার আগে প্রাচীন ভারতবর্ষে সখিদের আচরণ এবং আলাপ স্মরণ করিয়া কোন বাঙালীই লিখিত না, লিখিতে পারিত না—

কপোতটিরে লয়ে বুকে   সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত পদ্ম-কোরক বহি।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী   কথা কইত শৌরসেনী,
বলত সখীর গলা ধ'রে 'হলা পিয় সহি'।

ইহাতে বাঙালীর পুনর্লব্ধ 'তৎসম' মনের ভাষা শোনা গেল। কিন্তু ইংরেজ যুগের আগে বাঙালীর মন 'তদ্‌ভব' মাত্র ছিল। আরও পরিচয় দিবার আবশ্যক যদি থাকে তবে কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' মনে রাখিয়া প্রাগ্‌-ব্রিটিশ যুগে লেখা হরগৌরীর ঝগড়ার ভাষা পড়িতে বলিব। শিবের সামান্য একটু ভর্ৎসনা শুনিয়া পার্বতী বলিতেছেন—

'গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে।
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥'

কিন্তু ১২০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এই যে পরিবর্তন ঘটিল, উহার একটা বাঞ্ছনীয় দিকও ছিল। বহুবৎসর পতিত রাখিলে জমি যেমন উর্বরতা ফিরিয়া পায় বাঙালী সরল গ্রাম্য জীবনে নামিয়া তেমনি মানসিক উর্বরতা ফিরিয়া পাইয়াছিল। তাই ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের জীবন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাপারটা স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। বাণভট্টের কাদম্বরী পড়িয়া আমার বন্ধু বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' পড়িলে একদিকে যেমন বৈদগ্ধ্যের আকাশ-পাতাল প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম হইবে, তেমনি আর এক দিকে বাঙালীর সহজ স্বাভাবিক জীবনের রসও দেখা যাইবে। বিভূতিবাবু উপন্যাসটির কয়েকটি পাতা লিখিয়াই আমাকে দেখান, তখনই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বইটা শেষ করিতে আমি বলি। তখন যদি বাঙালীর প্রথাগত জীবনের গ্রাম্যতা সত্ত্বেও উহার মধ্যে নবজীবনের বীজ উপ্ত রহিয়াছে, এই আবিষ্কার আমি না করিতাম, তাহা হইলে 'পথের পাঁচালী'তে বাঙালী জীবনের যে-দৈন্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে অসহনীয় পীড়া অনুভব করিতাম, হয়ত বইখানা না লিখিতেই বলিতাম, উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক। আরও আশ্চর্যের কথা এই, অপুর চরিত্রে বিভূতিবাবু নিজেকে চিত্রিত করিলেও নিজের সম্বন্ধে তিনি একেবারে অন্য-রকমের ধারণাও করিতে পারিতেন। টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যান্ড পীস' তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় উপন্যাস ছিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে তিনি বলিলেন, 'জানো, নীরদ, আমি কিন্তু পিটার বেজুখভের মত।' বিভূতিবাবুকে আমি সর্বদাই অত্যন্ত 'তদ্‌ভব' বলিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতাম। তাঁহার মুখে এই উক্তি শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। যাঁহারা টলস্টয়ের উপন্যাসখানা পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিবেন। দরিদ্র কথক-ব্রাহ্মণের সন্তান নিজেকে রুশীয় অভিজাত কাউন্ট বেজুখভের সমকক্ষ মনে করিতে পারিয়াছিল। উহা ইংরেজী শিক্ষার ফল।

আমি বাঙালীর প্রাগ্-ব্রিটিশ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এরপর আরও দশ বৎসর ধরিয়া পড়াশোনা করি। তাহার ফলে এই জীবনের সারল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। ১৯৩৫-৩৬ সনে আমি বিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড জে টয়েন্‌বীর 'স্টাডি অফ্ হিস্টরী'-র প্রথম তিন খণ্ড পড়ি। তখন টয়েন্‌বী সম্বন্ধে আমার গভীর শ্রদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই, ও এ-বিষয়ে আমার মত তাঁহাকে পত্রযোগে জানাইতে আরম্ভ করি। আমার মূল বক্তব্য ছিল এই যে, প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগে আমাদের সভ্য অবস্থা পুরা 'সিভিলাইজেশ্যন্' নয়, 'ফোক্ সিভিলাইজেশ্যন'। আমার শেষ চিঠির উত্তরে অধ্যাপক টয়েন্‌বী আমাকে নিজের হাতে নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানা লেখেন,—

15. 9. 36

Ganthorpe House
Terrington, York

Dear Mr. Chaudhuri,

Thank you for your most interesting letter of the 27th August in continuation of your previous one and in advance of the note which you tell me that you are writing.

Your letter makes it clear what kind of society you are defining, and I think you have brought to light an important type which, as you say, is neither a civilization in the historian's full sense nor yet, perhaps, a primitive society in the meaning of Hobhouse and Ginsberg.

I look forward to seeing how your work on the modern Indian instance of this type gets on.

Yours truly
Arnold J. Toynbee

সেই বই আমার আর লেখা হয় নাই। কিন্তু আমার ধারণা সম্বন্ধে আশ্বাস পাইয়া উহা ১৯৩৭ সনের প্রথম দিকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিলাম। পাটনায় বাঙালী যুবকগণের একটা সাহিত্য সংঘ ছিল। উহার বাৎসরিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের পুত্র মণীন্দ্রের উদ্যোগে আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আমি ছাড়া সজনীকান্ত দাস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী ও 'বনফুল'-ও সঙ্গে ছিলেন। সেই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে ১৩৪৩ সনের ১০ই মাঘ (জানুয়ারী, ১৯৩৭) আমি রচনাটি পাঠ করি। আমার বক্তব্য বুঝাইবার জন্য উহা হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিব।

আমি বলিলাম—

'ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের দেশে যে সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ যে-সংস্কৃতি আমাদের পিতৃ-পিতামহের নিকট হইতে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণের মনেও স্পষ্ট কোন ধারণা নাই। এই যে সংস্কৃতি, যাহার টানার উপর ইউরোপীয় প্রভাব পোড়েনের মত আসিয়া পড়িতেছে, তাহার সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিয়াছি যে, উহা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতারই অনুবৃত্তি। উহা আমাদের গুরুতর ভ্রম, কারণ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যে অখণ্ডতাবোধ থাকিলে এক যুগের সংস্কৃতিকে পূর্ববর্তী আর একটি যুগের সংস্কৃতির অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে, ব্রিটিশ যুগের অব্যবহিত পূর্বেকার সংস্কৃতির সহিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সেই যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং শুধু তাহাই নহে, এক পরিণত সংস্কৃতি ভাঙিয়া আর একটি পরিণত সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিবার মধ্যে সমাজ মাত্রেরই যে একটা অপরিণত অবস্থা থাকে, তাহার লক্ষণও আমাদের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

'এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন, আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজেও দুইটি জিনিষ বর্তমান ছিল যাহার জন্য উহাকে আপাত-দৃষ্টিতে পরিণত বলিয়া মনে করিলে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অন্যায় হইত না। উহার একটি ইস্‌লামী সভ্যতা, অপরটি হিন্দু পণ্ডিতদের শাস্ত্রালোচনা। কিন্তু এ-দুইয়ের কোনটিকেই সে-যুগের ভারত-বাসীর সংস্কৃতিগত জীবনের প্রধান খাত বলা চলে না। ইসলামী সভ্যতা প্রধানত নগরে এবং শাসকদলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; উহা সাধারণ হিন্দু সমাজকে দূরে থাকুক, মুসলমান ধর্মাবলম্বী নিম্ন শ্রেণীর ভারতবাসীকেও সম্পূর্ণরূপে ইসলামী ভাবাপন্ন করিতে পারে নাই। পণ্ডিতদের শাস্ত্রালোচনাও তেমনিই একটা বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এ-দুই এর কোনটিই যে ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই তাহা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

'এই বৃহত্তর সমাজের যে চিত্র আমরা সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হইতে পাই, উহা একটা শিশুসুলভ, "প্রিমিটিভ" সমাজের চিত্র। প্রত্যেক পরিণত সমাজেই যে সমগ্রতাবোধ এবং অতীতের স্মৃতি থাকে, এই সমাজে তাহার আভাসমাত্রও নাই। এক রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী ভিন্ন এই সমাজে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহুমুখী কীর্তির কোনও স্মৃতি ছিল না। এই কারণে উহার সংস্কৃতিকে ইউরোপীয় সভ্যতার সমপর্যায়ের জিনিষ বলিয়া ধরিয়া লইলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। উহা একটি 'ফোক্ সিভিলাইজেশ্যন,' গ্রাম্য সংস্কৃতিমাত্র,

উহাকে পুরাতন হিন্দু সভ্যতার অপরিণত তদ্‌ভবরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু অনুবৃত্তি কিছুতেই বলা চলে না।

'প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এই রূপান্তর কবে আরম্ভ হয় তাহার কাল নিরূপণ আমি এখনও করিতে পারি নাই। কিন্তু এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রধান কারণ। যে-হিন্দুশাসক ও অভিজাত-সমাজ হিন্দু সভ্যতার অবলম্বন স্বরূপ ছিল, মুসলমানের আক্রমণে উহারা একেবারে বিনষ্ট না হইলেও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় তাহাদের পক্ষে আর হিন্দু সভ্যতার প্রাচীন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় নাই এবং এই নেতৃত্ব হারাইয়া ভারতবর্ষের সাধারণ জনসমষ্টি, সমস্ত মুসলমান যুগ ধরিয়া কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, কি ভাষায়, কি আর্টে, কি আচার-ব্যবহারে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটা অপভ্রংশ সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছু করিতে পারে নাই। অন্ততঃ এ-কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মুসলমান যুগই হিন্দুজনসমষ্টির মধ্যে অগণিত লৌকিক ধর্ম লৌকিক আচার, লৌকিক সাহিত্য, ও লৌকিক সঙ্গীত ইত্যাদির সৃষ্টিকাল। ইহার ফলে আমরা যে গ্রাম্য সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহাই ব্রিটিশ যুগের প্রাক্কালে আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল। ইহাই আমাদের প্রকৃত পৈতৃক সম্পত্তি, ইহারই সহিত ইউরোপীয় প্রভাব ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে।'

এই কথাগুলি আমি ১৯৩৭ সনের প্রথম দিকে লিখিয়াছিলাম। এই সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিবার কিংবা পরিবর্তিত করিবার কারণ পরজীবনের আরও অন্বেষণের ফলেও ঘটে নাই। আশা করি আমি বাঙালী জীবনের প্রাচীন ধারা সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাহিয়াছি তাহা স্পষ্ট করিতে পারিয়াছি। এর পর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কথা বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

প্রাগ্‌-ব্রিটিশ যুগের বাঙালী জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে আমি যে নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলাম, ও সে-সম্বন্ধে অধ্যাপক টয়েনবীর সহিত যে পত্র ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার কথা এই অধ্যায়ে বলিয়াছি। এই পরিশিষ্টে আমি তাঁহাকে ইংরেজীতে প্রথম যে 'নোট'টি পাঠাইয়াছিলাম, তাহা হইতে খানিকটা ইংরেজীতেই উদ্ধৃত করিতেছি। হয়ত ইংরেজীতে বিষয়টা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে। এই 'নোটটি' আমি ১৯৩৬ সনের ১৮ই জুলাই পাঠাইয়াছিলাম। আমি প্রথমে বলি,—

'Even educated Indians of today are curiously indifferent to their immediate past, the past that is to say which forms the warp to the weft of Western influences. This is certainly due to the discovery of the classical

Hindu civilization in the nineteenth century, which has fired their imagination and made them conscious of a heritage of their very own to pit against Western civilization. In their anxiety to feel at one with this heritage from motives of self-respect, they have forgotten the intervening phase of their existence and are now no more able to tear away their immediate past from the classical Hindu background than, looking at the sky at night, we are able to perceive any spatial separation between the solar system and the stellar world.

'I believe this short-circuiting has been made easier by the fact that the society of our immediate past was of a character altogether different from what went before and has come after, and that brings me to my real point. Contemporary sources give glimpses of a curiously naive and, in many respects, a primitive society in India in the eighteenth century, which is more properly called a folk-civilization than civilization. Of course, there were two things in it which gave it an outward appearance of maturity These were the Islamic civilization and the Hindu scholastic tradition. But the influence of the former was almost wholly urban and confined to the ruling aristocracy, while the Hindu survivals possessed values in this society which were quite different from their values in classical Hindu times. Neither the same sophistication nor the same self-consciousness was there, and there was a total lapse of historical memory. This last is perhaps the most important proof of the 'childishness' of the new sceiety. It seems to me that between 1000 A.D. (I use this date quite arbitrarily because I have not been able to explore the upper limits of the society which meets us in the immediately pre-British age) and the eighteenth century a re-barbarization (in no contemptuous sense) and simplification of Hindu life had been taking place. It was certainly the age of

the differentiation and fixation of the modern vernaculars of India, of the creation of vernacular literatures, of simple and unorthodox religious movements, of folk art, and songs, and of social customs very loosely affiliated to the orthodox Hindu systems. Altogether, the impression of winding down and a decided crudeness is impossible to resist. That is why I am disposed to look upon the supercilious and unenthusiastic estimates of Indians by early European writers and administrators, when stripped of the xenophobic excrescences, as a truer index of the quality of the society they met than the opinions of later scholars who had discovered ancient India by painstaking research.

Whether this 'childish' society would have grown to man's estate by its unaided efforts and in what way it would have grown up, are questions which we are no longer able to answer. For, before the evolution had gone very far, the revolutionary impact of European civilization was upon it. Close in its wake came the discovery of ancient India, whose sophistication had almost as great a disintegrating effect on the primitive society which turned eagerly to it as the reaction to European ideas. Faced with these challenges, Indian thinkers and reformers from Rammohun Roy to Rabindranath Tagore have evolved a pattern of response, which they look upon as a solution. They have popularized the idea of a synthesis between the East and the West. This formula has enabled us to civilize ourselves to a certain extent at the top, but by far the most important result of its adoption has been the sterility of our intellectual and moral life, dominated by imported phrases on the one hand and archaistic models on the other. If this is the case with the intelligentsia, the masses have not been touched at all by the excessively intellectual influences. They are reacting to the machine technique of the West, but not to the cultural currents, which are driving a

wage between them and the educated classes. All thoughtful Indians are conscious of these features of our life and have a profound sense of malaise. But they do not see that the root of the trouble lies in the fact in India that two civilizations are not meeting on equal terms. Mahatma Gandhi, I believe, has a subconscious perception of this, and that is why he is advocating a deliberate rejection of sophistication (both European and Indian) and a return to the folk level. But his also is an impossible position because the Indian people cannot cut themselves adrift from world currents—not so much of intellectual and moral ideas as of the new scientific technique of living. The problem for us today is, therefore, not how to bring about a reconciliation between two civilizations of the same species, but how to adjust the relations of a more or less primitive people to the triple contact with (1) European classical civilization; (2) Western scientific technique of living; and (3) ancient Indian culture, all of which are too advanced—though in varying degrees—to be assimilated easily by a people belonging to a different species of human society. In short, the relations of modern Indian society to the 'Western' may differ in degree, but do not do so in kind, from the relations of other modern primitive peoples like the Negroes, to Western society.'

এই ছিল আমার মূল বক্তব্য। ইহা উপস্থাপিত করিয়া আমি অধ্যাপক টয়েন্‌বীকে এ-কথাও বলি যে, প্রশ্নটা আমাদের পক্ষে যে শুধু ঐতিহাসিক সত্যেরই তাহা নয়, একটা কার্যকরী দিকও উহার আছে। তাই আমি লিখিলাম—

'As a modern Indian with hopes and fears for his country, I feel that the adoption of this theory takes me out of the deep shadows of an old civilization and releases me to work, to accept, and create as I please in untrammelled freedom from the self-imposed burden of a dead past. But there are other modern Indians who as decisively think otherwise.

উপসংহারে এই কথা বলিলাম যে, পুরাতন জীবন সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করা ও তাহার প্রতি আসক্তি দেখানো আমাদের জাতীয় গর্বের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পুরাপুরি পাশ্চাত্ত্য ধারা গ্রহণ করিবার পথে ইংরেজদের শাসনই বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি লিখিলাম—

> 'British rule in India makes it a point of honour with us to cling to ancient India as our newly found soul. As long as this rule lasts, it will prevent us from seeing our past as it really was and reacting normally to European influences.'

তৃতীয় অধ্যায়
ইংরেজী ভাষার প্রচার ও প্রসার

যে-জীবনের উপর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সংঘাত পড়িল তাহার কথা বলিলাম। ইহার পর এই সংঘাতের ফল কি হইল তাহা বলা উচিত। কিন্তু উহার পূর্বে ইংরেজী ভাষার ও ইংরেজীতে শিক্ষার প্রবর্তন সম্বন্ধেও কয়েকটা কথা বলা দরকার। এ-বিষয়ে শুধু বাঙালী নয়, সমস্ত ভারতবাসীর মুখেই একটা অযৌক্তিক কথা শোনা যায়। সেটা এই যে, ইংরেজ শাসক আমাদিগকে গোলাম বানাইবার জন্য ইংরেজীতে শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিল। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসন চালাইবার জন্য কেরানী ও হাকিম জাতীয় ভারতবাসীর প্রয়োজন ছিল, তাই আমাদের ইংরেজী শিখিতে বাধ্য করিয়াছিল। এই কথাটা আমি বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি। আমি তখন ক্লাস সিক্স্-এ (পুরাতন পঞ্চম শ্রেণীতে) পড়ি। কেদার বলিয়া একটি বালক আমার সঙ্গে পড়িত। সে ইংরেজীতে অত্যন্ত কাঁচা ছিল। দিনের পর দিন ক্লাসে অপদস্থ হইয়া একদিন সে আত্মগ্লানি হইতে মুক্ত হইবার জন্য এক কাণ্ড করিল। ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকটি ছিঁড়িয়া পদদলিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—'গোলাম হবার ভাষা আমি বর্জন করলাম!' সেটা ১৯০৮ সন, তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোর রহিয়াছে। তাই হাসি পাইলেও আমি দেশদ্রোহিতার ভয়ে কিছু বলিতে ভরসা পাইলাম না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই ধরণের কথা আমি পরজীবনে যে-সব ভারতীয়েরা স্ত্রীর কাছেও ইংরেজীতে পত্র লেখেন তাঁহাদের মুখেও শুনিয়াছি। এই কৃত্রিম ইংরেজী-বিদ্বেষ আজও রহিয়াছে। অথচ আজ বাঙালীর মধ্যেও সামাজিক অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরেজী ভাষা যাহারা ভাল করিয়া জানে ও যাহারা সেরূপ জানে না (না-জানার তো কথাই নাই), তাহাদের মধ্যে প্রভেদ জাতিভেদের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন প্রেমে পড়ার ফলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থে বিবাহ হয় বটে, কিন্তু ইংরেজী জানা ও ইংরেজীতে অজ্ঞের মধ্যে বিবাহ হয় না। অথচ ইংরেজীর বিরুদ্ধে গর্জন সর্বত্র শোনা যায়, ইহা কপটতা ও ভণ্ডামি, না 'স্কিজোফ্রেনিয়া' বলিতে পারি না।

তবে একটা কথা বলিতে মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করিব না—ইংরেজ নিজের স্বার্থে কেরানী বা অন্য কর্মচারী বানাইবার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিল উহা সর্বৈব মিথ্যা। ইহার মত নির্জলা ও নির্লজ্জ মিথ্যা কথা ইতিহাসে পাওয়া কঠিন।

প্রথমে একটা তথ্য দিয়াই আমার কথার সমর্থন করিব। ১৯১১ সনের 'সেন্সাসে' সমস্ত ভারতবর্ষে ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছিল ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৮৭ জন, এবং ইংরেজ সরকারের সমস্ত চাকুরের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছিল ২ লক্ষ ৭০ হাজার ২৭৮ জন। ইহার মধ্যে পুলিশ পিয়ন-

চাপরাশীও ছিল, সুতরাং সরকারী চাকুরের মধ্যে ইংরেজী জানা ব্যক্তি এক লক্ষ দেড় লক্ষের বেশী হইবার নয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—বাকী প্রায় পনর লক্ষ ভারতবাসী ইংরেজী কেন শিখিয়াছিল? ইহাও জিজ্ঞাস্য—আজিকার দিনে ইংরেজের গোলামী হইতে মুক্ত ভারতবাসীরও ইংরেজী ভাষা শিখিবার এত আগ্রহ কেন? উত্তরাপথের বানিয়াও ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে মেয়েকে ভর্তি করিবার জন্য কত টাকা ঘুষ দিয়া থাকে তাহা আমার জানা আছে। ইহা কি ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার, না শুধু 'স্কিজোফ্রেনিয়া' তাহা জানা কঠিন।

ইংরেজের আচরণ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিব যে ভারতবাসী ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করে ইহা কখনই ভারতপ্রবাসী ইংরেজের মনঃপূত বা অভিপ্রেত ছিল না। ইংরেজীতে শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পর হইতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান পর্যন্ত ভারতপ্রবাসী ইংরেজ যে-ভারতবাসী ইংরেজী জানে, লেখে বা বলে তাহার প্রতি অনির্বাণ বিদ্বেষ দেখাইয়াছে, তাহাকে কোনও অপমান করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। এই বিদ্বেষ বিশেষ করিয়া ইংরেজী জানা বাঙালীর প্রতি দেখানো হইত।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহার কথা ভাল করিয়াই জানিতেন। ধূর্ত বাঙালী কি করিয়া এই বিদ্বেষের বাধা অতিক্রম করিয়া ইংরেজের কাছ হইতে চাকুরী জোগাড় করিত তাহার বিবরণ বঙ্কিম 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিতে' দিয়াছিলেন। উহা ভাল করিয়া প্রণিধান করিবার মত।

মুচিরাম ইংরেজী-নবীশ নয়, তবু কালেক্টরিতে পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য প্রার্থী হইল। তাই ইংরেজীতে দরখাস্ত করিবার জন্য সে আদালতের সামনে বসিয়া যে-মুন্সী আর্জি লিখিয়া দেয় তাহার শরণাপন্ন হইল। তবে সে অতিশয় ধূর্ত, মুন্সীকে বলিয়াছিল, 'দেখিও ইংরেজী যেন ভাল না হয়, আর যাই হোক্ আর না হোক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটাকুড়ি 'মাই লার্ড' আর "ইওর লার্ডশিপ" থাকে। কালেক্টর সাহেবের নাম মিঃ হোম। তিনি প্রার্থীদের তলব করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, 'অনেক বড় বড় ইংরেজ-নবীশ আসিয়াছেন—সেকেলে কেঁদো কেঁদো স্কলারশিপ হোল্ডার।' সাহেব তাহাদিগকে বলিলেন, 'I daresay you are well up in Shakespeare and Milton and Bacon ana so forth. Unfortunately we don't want quotations from Shakespeare and Milton and Bacon in this office. It is not the most learned man who is best fitted for this kind of work. So you can go, Baboo.'

সকলের শেষে আসিল মুচিরাম। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পড়িলেন, হাসিয়া বলিলেন, "Why do you call me My Lord? I am not a Lord."

'মুচিরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল, "বান্দা কো মালুম থা কি হুজুর লার্ড ঘরানা"।'

'এখন হোম সাহেবের সঙ্গে একটা লর্ড হোমের দূর সম্বন্ধ ছিল। সেই জন্য তাঁহার বংশ-মর্যাদা সর্বদা জাগরূক ছিল। মুচিরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বলিলেন, "হো সাক্‌তা, লার্ড ঘরানা হো সাক্‌তা; লার্ড ঘরানা হোনে সি ভি লার্ড হোতা নেহি।"

'মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল, "বান্দা লোগকো ওয়াস্তে হুজুর লার্ড হ্যাঁয়"।'

মুচিরাম চাকুরী তো পাইলই, শেষ জীবনে রায় বাহাদুরও হইল।

পক্ষান্তরে ইংরেজী ভাষায় অজ্ঞ ও ইউরোপীয় ইতিহাসের সহিত সম্পর্ক-বর্জিত ভারতবাসীকেই ভারতপ্রবাসী ইংরেজ রাজপুরুষগণ সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। এই সব ভারতীয়দের মধ্যে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যিনি ইংরেজদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অন্য সকলের চেয়ে বেশী পাইয়াছিলেন তিনি রাঠোর রাজপুত ইদরের মহারাজা জেনারেল স্যার পরতাব (প্রতাপ) সিং। তিনি যে-ইংরেজী বলিতেন তাহার জন্য আরও বেশী স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। লেডী মিণ্টোও অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাঁহার ইংরেজী নিজের ডায়ারীতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অন্যেরাও করিয়াছিলেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একবার তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তখন সেই দেশ কিরূপ ভাল লাগিয়াছিল তাহা এইরূপ ইংরেজীতে একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলাকে বলিয়াছিলেন—

'Lekin, Lady, I every time happy this England. Horses gentlemen, ladies gentlemen; and grass is gentlemen.'

তবে স্যার পরতাবের স্বপক্ষে ইহা বলিবার আছে যে, তিনি দেশী লোকের বিলাতি আচার ব্যবহার ও ইংরেজের ভারতীয় আচার ব্যবহার দুইকেই হাস্যকর মনে করিতেন। এই মনোভাবও তিনি নিজস্ব ইংরেজীতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন —একটি দৃষ্টান্ত এই। তখন সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লীর দরবারে যাইবার সময়ে লর্ড কার্জন ও তাঁহার পত্নী হাতীতে চড়িয়াছিলেন। স্যার পরতাবের তাহা মোটেই ভাল লাগে নাই। তাই তিনি বলিলেন—

'You eating knife and fork I eating knife and fork. I not knowing this knife and fork. Great Mogul he knowing how mount this elephant. You not knowing. You sitting howdah in uniform with English lady. Great Mogul he mount properly, he dressed in white muslin and squat by himself on elephant's back. You sitting howdah, we laughing, you not knowing.

১৮৩৫ সনে যখন ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহন বলিয়া গ্রহণ করা হইল তখন ভারতপ্রবাসী সমস্ত উচ্চপদস্থ ইংরেজ উহার বিরোধী ছিলেন। কেবল ইংরেজী-জানা বাঙালীর পীড়াপীড়িতে ও মেকলের সমর্থনে লর্ড বেণ্টিঙ্ক উহার অনুমোদন করেন। যে-সব ইংরেজ ইংরেজীতে শিক্ষার বিদ্বেষী ছিলেন

তাঁহাদের প্রথম যুক্তি ছিল যে ভারতীয়েরা কখনই ইংরেজী ভাষা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিবে না। মেকলে বলিলেন, উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বাঙালীর ইংরেজী লেখার প্রশংসা করেন, অথচ আমরা তাঁহাকে বাঙালী চরিত্রের নিন্দক বলিয়াই জানি। আমি ছাত্রাবস্থায় মেকলের এই প্রশংসার কথা জানিতাম না। স্যর হেনরী সামনার মেনও বাঙালীর ইংরেজী লেখার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতাম না। আমাদের ইংরেজীর প্রশংসা ইংরেজের দ্বারা প্রথম আমি পড়ি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে। উহার চেয়ারম্যান ছিলেন মাইকেল স্যাডলার। আমি তাঁহার প্রতি ইহার জন্য অতিশয় শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলাম।

আমাদের মধ্যে ইংরেজী জ্ঞানের যতই প্রসার হইতে লাগিল ভারতবাসী ইংরেজদের উহার প্রতি বিদ্বেষও ততই বাড়িতে চলিল। রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যাপারে উহার দ্বারা ইংরেজ ও বাঙালী দুই-এরই অনিষ্ট হইয়াছিল। উহার কথা পরে লিখিব, ইংরেজী জানা বাঙালীর প্রতি বিদ্বেষেরও দৃষ্টান্ত দিব। এখানে শুধু একজন বাঙালী এই বিষয়ে একশত বৎসরেরও আগে কি লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিব। এই বাঙালী লিখিলেন,

> 'The partiality of Young Bengal for an English education has been much traduced. "Why on earth is he so wedded to English books ? Why does he not read the Vedas, Puranas, and Itihases ?"

এই বাঙালী উত্তর দিলেন,

> 'Those who condemn him on this account forget conveniently that whatever he has been able to achieve has been achieved by his English education only. The dry bones of Oriental Literature would not have raised either the morality or the life of the nation.'

এই মানসিক পরিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ দিবার আগে একটা অবিসম্বাদী ব্যাপারেরও উল্লেখ করিতে হইবে। সমস্ত ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যার তুলনায় ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল। তাহা ছাড়া আর একটা কথাও ছিল, সমাজের যে-স্তরে ইংরেজীর জ্ঞান ছিল সেখানেও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এ-বিষয়ে গুরুতর প্রভেদ ছিল। এই সমাজের এক হাজার পুরুষ ইংরেজী জানিলে দশজন স্ত্রীলোক ইংরেজী জানিত কিনা সন্দেহ ছিল। এই অবস্থা ১৯০০ পর্যন্ত তো ছিলই, এমন কি ১৯২০ সন পর্যন্তও বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। আমাদের সমাজের উচ্চস্তরে মেয়েদের মধ্যে ইংরেজী জ্ঞানের প্রসার ১৯২০ সনের পর হইতে বস্তুত দেখা যায়।

কিন্তু ইহার জন্য পারিবারিক জীবনে কোন বিরোধ দেখা যায় নাই, কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, কি মাতা-পুত্রের মধ্যে, কি ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে। আমার পিতা ইংরেজী জানিতেন, মাতা জানিতেন না; আমার শ্বশুর মহাশয় ইংরেজী

জানিতেন, আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী জানিতেন না ; আমার ভগিনীর ইংরেজী না জানার কথা নয়, তবু সে ইংরেজী শিখিবার জন্য কিছুমাত্র মনোযোগ দিত না, তাই শিখাইতে চেষ্টা করিয়া আমিও হার মানিয়াছিলাম। তবু আমার পিতা ও মাতার মধ্যে, আমার শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর মধ্যে, আমার বোন ও আমার মধ্যে মানসিক ধর্মের তারতম্য ছিল না। ইহার কারণ বাঙালী শিক্ষিত পুরুষের মনের মত বাঙালী শিক্ষিতা মহিলাদের মনও ইউরোপীয় হইয়া গিয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষ দিক হইতে বাংলা সাহিত্য ইংরেজীর ছাঁচে ঢালা হইয়াছিল। কয়েকটা ইংরেজী বই বাংলাতে অনূদিত হইয়াছিল। বাংলা মাসিক পত্রিকাতে ইউরোপীয় সাহিত্য, ইতিহাস, আর্টসম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও চিত্র থাকিত। আমি দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি ১৯০৫ সনের কাছাকাছি সময়ে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'মার্চেন্ট অফ ভেনিসে'র ছবি ও 'টোয়েলফ্‌থ্‌ নাইটে'র ছবি দেখি। এর বছর দুই পরে 'মুকুল' পত্রিকায় থিসিউসের গল্প পড়ি ও ছবি দেখি। ইহারও অল্পদিন পরে আর একটি পত্রিকায় ডিমিটার ও পার্সিফোনির ছবি দেখি। ইহারও আগে আমি 'প্রবাসী'তে রাফায়েল সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ দেখি। তখন আমি ভাল করিয়া বাংলাও পড়িতে পারি না, কিন্তু ছবিগুলি অতি মনোযোগ দিয়া দেখিয়াছিলাম। রাফায়েল বহু ম্যাডোনার ছবি আঁকিয়াছিলেন। উহার মধ্যে যেগুলি খুব বিখ্যাত তাহার প্রতিলিপি 'প্রবাসী'তে ছিল। সেগুলি এখনও আমার চোখে ভাসে। তাহা ছাড়া আমাদের বড় ঘরের দরজার উপরে হরিণের শিংএর উপর স্থাপিত একটি বড় রঙীন ছবি ছিল। সেটি রাফায়েলের ম্যাডোনা ডেল্লা সেডিয়া ! আমার মা আমাদের প্রায়ই রাফায়েলের ম্যাডোনার কথা বলিতেন, তাহাতে আমার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, রাফায়েল শুধু ম্যাডোনাই আঁকিতেন। কিন্তু ইহা ছাড়া রাফায়েলের 'নাইট্‌স ড্রীম' ও নিজের প্রতিকৃতিও দেখিয়াছিলাম।

আমার মাতা এইসব পত্রিকাই পড়িতেন। সুতরাং তাঁহার কাছে ইউরোপীয় সাহিত্যের গল্প শুনিতাম। আমার পিতা ১৯০৮ সনে দশ বৎসর বয়সে আমাকে ইংরেজীতে সেক্‌স্‌পীয়ার পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারও আগে আমার মাতা আমাকে 'কিং লিয়ার' ও 'মার্চেন্ট অফ ভেনিসে'র গল্প বলিয়াছিলেন, এমন কি তিনি আমাকে ইলিয়াডের গল্পও বলিয়াছিলেন। ইহার একটা আশ্চর্য ইতিহাস আছে। ময়মনসিংহ শহরবাসী আনন্দ রায় নামে এক ভদ্রলোক 'হেলেনা কাব্য' নাম দিয়া ইলিয়াড অবলম্বনে একটি কাব্য লেখেন। উহার প্রথম খণ্ড ময়মনসিংহ শহরে মুদ্রিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয় কলিকাতায়। উহার দুই খণ্ডই আমি অক্সফোর্ডের বড্‌লীয়ান লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। উহা হইতেই আমার মা আমাকে হেলেনা অপহরণের ও ট্রয় অবরোধের গল্প বলেন। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার বিবাহের পর আমার সহিত ইংলণ্ডের বর্তমান ইতিহাস সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, 'বাবা ! এ-সব বিষয় নিয়ে তো তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারছি , আমার

মেয়েদের সঙ্গে পারি না কেন ?' আমি উত্তর দিয়াছিলাম, 'আপনারা লেখাপড়া করতেন। আপনাদের মেয়েরা খালি আই-এ বি-এ পাশ করে।' মনে পড়ে আমার মাতা ইপিক্‌টেটাসের বাণী ও মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তাও বাংলায় পড়েন।

সুতরাং পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন হওয়ার জন্য আমাদের একমাত্র ইংরেজী ভাষার উপরই নির্ভর করিতে হইত না। ইংরেজী হইতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ও বাংলা হইতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে আমি সূর্যের আলো ও চন্দ্রের আলোর সহিত তুলনা করিতে পারি। সুতরাং একটির প্রভাব প্রখর ও আর একটির প্রভাব স্নিগ্ধ ছিল।

ইহা ছাড়া আমাদের জীবনে ইংরেজী ভাষার প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া আর একটা পার্থক্যের কথাও বলিতে হয়। সেটা আশ্চর্যের বিষয়। বাঙালী ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়া গ্রহণ করিত, কিন্তু আত্মপ্রকাশ করিত বাংলা ভাষায়। ইংরেজী ভাষা কাজের জন্য এবং রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্তু সেই সব লেখা কখনও শক্তিশালী হয় নাই। তাই সে যুগের বাঙালীর ইংরেজী লেখা টেঁকে নাই। উহার প্রভাবও জোরালো হয় নাই। পক্ষান্তরে মনোভাব প্রায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইত বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া। সেই মনোভাবের শক্তি এত ছিল যে, উহা নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত ভাষা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। আবার উপযুক্ত ভাষায় নিবন্ধ হইয়া বাঙালীর জীবন ও চরিত্রকেও পুনর্গঠন করিতে পারিয়াছিল। সেজন্য বাঙালী মনের নূতন রূপের সত্য পরিচয় কোনো ইংরেজী রচনা হইতে পাইবার উপায় নাই। উহার জন্য বাংলা সাহিত্যই একমাত্র অবলম্বন।

ইংরেজীতে পড়া ও বাংলাতে আত্মপ্রকাশের মধ্যে যে-বিভেদ এইভাবে দেখা গেল, তাহার আর একটা ফলও ভাবিয়া দেখিবার মত। সেটা এই—বাঙালীর আত্মপ্রকাশ পূর্ণভাবে ও সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে তাহাদের মধ্যেই হইয়াছিল যাহাদের ভাষা-ব্যবহার দুই ভাষার মধ্যে খণ্ডিত হওয়ার ফলে দুর্বল হইতে পারে নাই—অর্থাৎ উকিল, অধ্যাপক, রাজকর্মচারী ইত্যাদি নয়, বাঙালী সাহিত্যিক ও বাঙালী মেয়ে। যাহারা দুই ভাষায় লিখিত তাহাদের কোন লেখাই দোটানার মধ্যে পড়িয়া জোরালো হইত না।

পক্ষান্তরে বাঙালীর লেখক ও বাঙালী মেয়ে মিলিয়া, বাংলা পড়া ও বাংলায় লেখা এই দুই কাজকে মিলাইয়া, যে মানসিক জীবন সৃষ্টি করিয়াছিল উহাতেই বাঙালীর জীবনপ্রবাহ বহিত। এই ক্ষেত্রে 'ঘর ও বাইরে'র মধ্যে যে একটা নিবিড় যোগ হইয়াছিল, তাহা বাঙালী জীবনের অন্য ক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। লেখকেরা যাহা লিখিত তাহার অনুকরণে বাঙালী যুবক-যুবতী নিজেদের মানসিক জীবন ও আচরণের ধারা গঠন করিত। আবার এই জীবন ও আচরণ হইতেই বাঙালী লেখক তাহার বক্তব্য ও বর্ণনীয় বিষয় সংগ্রহ করিত। ফলে দুইটি ক্ষেত্র পরস্পরকে ওতপ্রোতভাবে প্রভাবান্বিত করিত। একটাকে আর একটা হইতে পৃথক করা যাইত না। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় বাস্তবতা যতটা ছিল

কল্পনাও ততটা ছিল। এই দুই-এর সমন্বয়ের জন্য একদিকে বাঙালী জীবন ঊষর হইয়া যায় নাই, অন্যদিকে লেখাও কৃত্রিম হয় নাই। সাহিত্য জীবনের দিকে যাইত, তেমনি জীবনও সাহিত্যের দিকে ফিরিত। সেজন্যই সে-যুগের বাঙালী লেখক কখনই ইউরোপে যাহাকে 'রিয়্যালিস্টিক' বা 'ন্যাচেরালিস্টিক' সাহিত্য বলা হইত তাহার দিকে যায় নাই, যাইবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। তাহাদের কল্পিত জীবনকে যেমন বাস্তব মনে করা যাইত, আবার বাস্তব জীবনকে তেমনি কল্পিত মনে করা যাইত। দুইটাই সমান স্বাভাবিক ছিল।

এই মানসিক জীবন বাঙালীর বৈষয়িক জীবনের উজানে চলিত। কারণ একটি নৌকার পালে বাতাস আসিত হৃদয় হইতে, আর একটির পালে বুদ্ধি হইতে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'হায় রে, হৃদয় লইয়াই যাহাদের কারবার, সেই মেয়েদের ব্যবহারকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া দোষ দিলে চলিবে কেন?' তিনি 'হায় রে!' না বলিলেও পারিতেন, শুধু 'মেয়েদের'ও উল্লেখ না করিলে পারিতেন। হৃদয় লইয়া কারবারকে দুঃখের বিষয় মনে করিবার কোনও কারণ ছিল না; তাছাড়া এই জীবনে শুধু মেয়েরাই বাস করে তাহাও বলিবার কারণ ছিল না। এজন্যই আমি বলিয়াছি যে এই ক্ষেত্রে 'ঘরে-বাইরে' এক হইয়া গিয়াছিল।

পাশ্চাত্ত্য ধারায় পুনর্গঠিত বাঙালী জীবনের মূর্তি পাওয়া যায় প্রকাশ্যে কবিতায়, গানে, ও গল্প-উপন্যাসে—প্রধানত পুরুষের রচনায়, তাহা ছাড়া অল্প হইলেও মেয়েদেরও লেখাতে—কিন্তু উহার গোপন অস্তিত্ব ছিল বধূদের প্রেমপত্রে। আমি ইউরোপের নানা দেশের ও নানা যুগের নারীদের প্রেমপত্র পড়িয়াছি—বিশেষ করিয়া মধ্যযুগের এলোয়িজের ও পরবর্তী যুগের জুলি দো লেস্‌পিনাসের। আবেগের তীব্রতায় ও লেখার আন্তরিকতা স্বচ্ছতা ও বৈদগ্ধ্যে ইহারাও বাঙালী বধূকে ছাড়াইয়া যান নাই। কিন্তু ইহার প্রমাণ আসল চিঠি হইতে দেওয়া অসম্ভব। কারণ, এই সব চিঠি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাখা হয় নাই, আর যেখানে আছে সেখানেও পুত্র বা পৌত্রেরা প্রকাশ করিতে সম্মত হন না। উহা সঙ্গত। জীবনে প্রেমের প্রকাশ যে-ভাবে হয় তাহার আবরণ সরাইয়া নিলে উহার অবমাননা করা হয়। সন্তানেরা জানে কি করিয়া তাহাদের দৈহিক উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু কেহই উহার চিন্তা করে না, উহার কথাও বলে না। তেমনই যে-প্রেম দৈহিক উৎপত্তির মূলে তাহার অনাবৃত মূর্তিও প্রকাশ করিতে চায় না। উহা জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা।

তাই বধূদের প্রেমপত্রের সূত্রটুকু মাত্র, আর কিছু নয়, একটি গান হইতে দিব—

'এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালবাসি······
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি
রাখি না যতই কেন কাছে
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে
কে যেন অভাবী রহিয়াছে।'

যাঁহারা এই গানটি শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গলায় শুনিয়াছেন তাঁহাদের সকলের কানেই আমাদের বধূদের প্রেমের সুরটি বাজিতে থাকিবে।

কিন্তু গোপন প্রকাশের এই উচ্ছলতার জন্য গ্রাম অঞ্চলে উহার অবমাননা হইত। গ্রামের অলস যুবকেরা পোষ্ট মাষ্টারের সহিত যোগাযোগ করিয়া বধূদের পত্র খুলিয়া পড়িত। প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শুধু একজন পোস্ট-মাস্টারের দ্বারা এই ধরনের পত্র পড়ার বর্ণনা দিয়াছেন।

সন্ধ্যাবেলায় মদ্ খাইয়া পোস্টমাস্টার বলিতেছে—

'এ চিঠি তো তুমি পাবে না মণি! খামখানাই যে ছিঁড়ে ফেলেছি।
তার আছ পথ চেয়ে, অবছেছে ক্লান্ত হয়ে বছে পড়বে—বছে বছে ক্রমে
ছুয়ে পড়বে···তুমি চল, আমার ছঙ্গে চল। চল ছখি'···ইত্যাদি

আমার বোনের যে-গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল তাহার পোস্ট-আপিসেও এই ব্যাপারটা ঘটিত। শুনিয়া আমি ভগিনীপতিকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা রিপোর্ট করে দাও না কেন?' সে উত্তর দিয়াছিল, 'তা হ'লে তো পোস্ট-আপিসই তুলে দেবে।' কিন্তু সে নিজে আমার বোনের চিঠিকে অন্য উপায়ে অবমাননা হইতে বাঁচাইত। সে কলিকাতায় আসিবার সময়ে অনেকগুলি খাম ইংরেজীতে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া আসিত। তাই পোস্টমাস্টার ভাবিত এগুলি তার পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চিঠি। কিন্তু গ্রামের সকল বধূদের আত্মরক্ষার এই উপায় ছিল না। তাই, আমার বোন আমাকে বলিয়াছিল যে, উহাদের একজন স্বামীর কাছে চিঠির খামের উপর লিখিয়া দিত—

'পিওন রে! করজোড়ে করি নিবেদন,
মালিক বিহনে চিঠি না দিও কখন!'

ইংরেজী শিক্ষার ফলে মানসিক ভাবাবেগের প্রকাশ বাংলায় যেরূপ হইয়াছিল তাহার কথা বলিলাম। সেজন্য এ-কথা মনে করা উচিত হইবে না যে, মানসিক আবেগ শুধু বাংলা দিয়াই সৃষ্ট হইত। পুরুষের মন প্রধানত ইংরেজী সাহিত্যের দ্বারাই গঠিত হইত। সুতরাং তাহার সান্নিধ্যও বাঙালী যুবতীর পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হইবার একটা কারণ হইত। ইংরেজী শিক্ষার ফল বাঙালীর মধ্যে দুই ভাবে দেখা দিয়াছিল—এক মনোজগতে, আর বৈষয়িক জগতে। ইংরেজী ভাষার বৈষয়িক প্রভাবও কিছুমাত্র কম ছিল না। প্রথমত, ইংরেজী জানিলে যে সামাজিক সম্মান পাওয়া যাইত শুধু বাংলা বা সংস্কৃত জানিলে কখনই তাহা সম্ভব ছিল না। একমাত্র ইংরেজী জানা ব্যক্তিকেই তখন 'এডুকেটেড্' বলা হইত, বাংলায় বা সংস্কৃতে বিদ্বান লোককে শুধু পণ্ডিত বলা হইত। তাহা ছাড়া ইংরেজী ভাল জানিলে ইংরেজী না-জানা মেয়েমহলেও সম্মান বাড়িত। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'পূর্বে যাহারা বিনয়কে বিশেষ কেহ বলিয়া খাতির করে নাই, তাহারা বিনয় এমন ভাল ইংরেজী পড়ে বলিয়া তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিল না। ললিতার তো ইহাতে আঘাতই লাগিল। বিনয়ের তুলনায় হীন হইবার ভয়ে সে বাঁকিয়া বসিল যে, সে অভিনয়ে যোগ দিবে না।'

ইংরেজী ভাল না জানিলে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইবার কোনো উপায় ছিল না। সামাজিক আচরণেও ইংরেজী ব্যবহার না করিলে সম্মানের লাঘব হইত। পত্র ব্যবহার ইংরেজী জানা বাঙালীর মধ্যে ইংরেজী ছাড়া বাংলায় হইত না—বিশেষ করিয়া পিতা-পুত্রের মধ্যে। আমি যে বাংলাতে ছাড়া বাঙালীর কাছে চিঠি লিখি না, আমিও আমার তিন পুত্রের কাছে চিঠি লেখায় সেই প্রথার নিগড় ভাঙ্গিতে পারি নাই, ইংরেজীতেই চিঠি লিখি।

এই ধারার জন্য ইংরেজীতে অজ্ঞ গ্রাম্য পিতাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইত। কলিকাতায় কলেজে পড়ে পুত্র পিতার বাংলা চিঠি পাইলে উহা দেখাইতে ভয় পাইত। তাই পিতা-পুত্রকে অসম্মান হইতে বাঁচাইবার জন্য বাৎসরিক পঞ্জিকাতে নানা অবস্থায় চিঠি লিখিবার ইংরেজী মুশাবিদা দেওয়া হইত, যাহা পিতারা অবস্থানুযায়ী নকল করিয়া দিতে পারিত। আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর কাছ হইতে আমি বাংলা ১৩১১ সনের একখানি পঞ্জিকা পাই। তাহাতে অন্য মুশাবিদার মধ্যে একটি পাইয়াছিলাম যাহাতে অতিরিক্ত টাকা চাহিবার জন্য পুত্রকে অতিশয় ভদ্রভাবে ভৎর্সনা করা হইয়াছে। মুশাবিদাটি এইরূপ—

Bishnupur
27th May, 1904

My dear Ashu.

Your last letter gave us pleasure not unmixed with pain; pleasure to learn that you were well and on friendly terms with those of your own standing, and pain from the request which it contained. Your mother, like myself, feels grieved that you have asked for an additional allowance. You should consider that you have brothers and sisters for whom I have also to make provision, and that if the allowance I now give you, which is already considered sufficient, be increased, it must deprive us all of some of our necessary comforts. Do reflect on this, dear boy, and then, I am well assured, you will not urge your request. I will, however, for this once only, understand me, remit you a further twenty rupees. Write to us as often as you can and with the united kindest love of your mother and myself.

Believe me,
Your affectionate father

বলা প্রয়োজন, এই চিঠিটি বাঙালী গ্রাম্য বাপের নয়, ইংরেজ জমিদার পিতার ইটন্ বা হ্যারোতে ভর্তি করা পুত্রের নিকট চিঠির নকল। কোনো বাঙালী বাপ ছেলের কাছে টাকা পয়সার কথা লিখিতে হইলে তাহার মায়ের

মতামতের উল্লেখ করিত না, অন্ততপক্ষে উল্লেখ করিলেও 'your mother and I' না লিখিয়া লিখিত 'I and your mother.'

ইহা ছাড়া ভদ্রসমাজে আলাপে কয়েকটি ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথা বাংলাতে উল্লেখ করা সে সময়ের যুবকেরা অশালীন মনে করিত। যেমন, 'আমার বাবা আসবেন' বলিতে সঙ্কোচ অনুভব করিত, বলিত 'আমার "ফাদার" আসবেন'। বিবাহিত যুবকেরা মার্জিত হইলে কখনও 'আমার স্ত্রী' পর্যন্ত বলিত না, বউ বলা দূরে থাকুক, বলিত 'আমার "ওয়াইফ"।' শালীনতার খাতিরে একটি ইংরেজী বাক্য প্রয়োগ হাস্যকরই হইত, সেটি বিবাহের পর একটি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 'সেকেণ্ড ম্যারেজ' বলা।

আশা করি ইংরেজি ভাষার প্রসারের কথা যথেষ্ট বলা হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

ইংরেজী শিক্ষার ফল

ইংরেজী ভাষার প্রসার কতদূর হইল তাহার কথা বলিলাম। এখন কি ফল হইল তাহার পরিচয় দিব। প্রথমেই একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ইংরেজী পড়িয়া পাশ্চাত্ত্য ধারা গ্রহণ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা নির্বিচারে হয় নাই। অবশ্য এটা ঠিক যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মাঝামাঝি পর্যন্ত যে পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল তাহার সবটাই প্রায় বাহ্যিক ও বিচারহীন। 'নববাবুবিলাসে' ইহাকেই ব্যঙ্গ করা হইয়াছিল। এমন কি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও অর্থাৎ ১৮১৭ সন হইতেও সেক্‌সপীয়ার পড়াকে যেমন, তেমনি মদ গোমাংস খাওয়াকেও পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হওয়ার অঙ্গ বলিয়া অনেকেই মনে করিত। মাইকেল 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে এই ধরনের পাশ্চাত্ত্য হওয়াকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহার পরেও দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'-তে পরেশবাবুকে দিয়া পর্যন্ত বলাইয়াছিলেন, 'তখনকার দিনে কলেজে আমরা দুজনেই এক জুড়ি ছিলুম—দুজনেই মস্ত কালাপাহাড়—কিছুই মানতুম না—হোটেলে খাওয়াটাই একটা কর্তব্যকর্ম বলে মনে করতুম। দুজনে কতদিন গোলদিঘীতে বসে মুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে তারপর কী রকম করে আমরা হিন্দুসমাজের সংস্কার করব রাত দুপুর পর্যন্ত তারই আলোচনা করতুম।' ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা ছাড়া যতটুকু আলোচনা বা তর্কবিতর্ক হইত তাহাও অত্যন্ত নিম্নস্তরের ছিল। উহাতে একদিকে মনুপরাশরের দোহাই ও অন্য দিকেও মনুপরাশর হইতেই যুক্তি বা কুযুক্তি দিয়া সাফাই ছাড়া আর বেশী কিছু থাকিত না। সুতরাং 'পাষণ্ড পীড়নে' রামমোহনের উপর যে আক্রমণ হইল, রামমোহনের প্রত্যুত্তরও তাহার বেশী উপরে উঠে নাই।

কিন্তু ১৮৫০ সনের পর হইতে পাশ্চাত্ত্য ধারা ও ভাব গ্রহণ করা উচিত কিনা, কতটুকু গ্রহণ করা উচিত, কতটুকু উচিত নয়, এ-সব প্রশ্নের শান্ত ও যুক্তিসম্মত আলোচনা আরম্ভ হইল। তবে প্রথম কুড়ি বৎসর পাশ্চাত্ত্য-পন্থীরাই প্রবল ছিলেন। ১৮৭০ সন অথবা কিছু আগে হইতে হিন্দু বা ভারতীয় ধারার সমর্থন আরম্ভ হইল। অনেকে তখন আচার-ব্যবহারে এমন কি চিন্তাধারাতেও পাশ্চাত্ত্য হওয়ার বিরোধী হইলেন। আশ্চর্যের কথা এই, যিনি বাঙালীর পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হওয়ার কটু নিন্দা করিলেন তিনি আর কেহ ন'ন, ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন নেতা রাজনারায়ণ বসু। তিনি প্রথমে ১৮৭৩ সনে এ-বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। পরে তাঁহার বক্তব্য বিখ্যাত 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে চিরস্থায়ী করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করিলেন। মনে রাখিতে হইবে বঙ্কিম নব্য

হিন্দুত্বের স্রষ্টা ও প্রচারক, আর রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম। তবু বঙ্কিমচন্দ্রই পাশ্চাত্ত্য ধারা গ্রহণের সমর্থন করিলেন।

বঙ্কিম বলিলেন, ভারত প্রবাসী ইংরেজেরা নব্য বঙ্গকে অর্থাৎ 'ইয়ং বেঙ্গল'-কে পশু বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করি।—

'কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহ পূর্বক এই অপূর্ব নব্য বাঙ্গালী চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণ-পটুতা, এবং গর্দভ হইতে গর্জন—এই সকল একত্র করিয়া, দিঙমণ্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, রাজনারায়ণবাবুও এই সকল ইংরেজেরই মতাবলম্বী, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনিই এই গ্রন্থ মধ্যে গোমাংস ভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালির মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন? গরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট?'

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সনে, পরে 'অনুকরণ' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে, সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে সাহিত্যে সংস্পর্শ ও ঘাতপ্রতিঘাতের, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে-ফল হয়, তাহার যে আলোচনা করিয়াছেন উহার অপেক্ষা সঙ্গত ও সত্য আলোচনা আমি অন্য কোনো লেখকের—তিনি ঐতিহাসিকই হউন আর সমাজতত্ত্ববিদই হউন—কাছ হইতে পড়ি নাই। বাঙালীর পাশ্চাত্ত্যধারা অনুকরণের সার্থকতা কি উহা তিনি বুঝাইয়াছিলেন, এবং কখন অনুকরণ সমর্থনীয়, কখন নয়, তাহাও বলিয়াছিলেন। আমি এই আলোচনা হইতে যাহা প্রাসঙ্গিক তাহার সবই উদ্ধৃত করিব। তিনি প্রথমেই বলিলেন—

> 'অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য সকল দেখিয়া কার্য করিতে শিখে, অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য ও শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ।……
>
> 'যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোম ও য়ুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও য়ুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ

জানেন যে, ইউরোপীয়েরা প্রথম অবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে য়ুনানীয়ের, বিশেষতঃ রোমকীয়ের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়াছেন। ...বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা।'......

ইহার পর সাহিত্যে ও সামাজিক জীবনে অনুকরণের ফলে অবশেষে কত দূর উঠিতে পারা যায় তাহার দৃষ্টান্ত বঙ্কিম প্রাচীন ভারতবর্ষ, রোম ও ইউরোপের ইতিহাস হইতে দেখাইলেন, তাহার পর বলিলেন—

'যখন উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায় উৎকৃষ্ট যেরূপ করে সেরূপ কর, সেইরূপ হইবে। বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্যে, সুখে সর্বাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা করে, সেইরূপ করিলে ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন ও সুখী হইবে। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, ঐ অবস্থাপন্ন হইলে ঐরূপ করিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অনুকরণ প্রবৃত্তি নহে।'

তবে তিনি যে, অনুকরণের অবাঞ্ছনীয় দিকটা দেখেন নাই তাহা মোটেই নয়। তিনি বলিলেন, 'অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর কিছুই নাই।' ইহার পর বাঙ্গালির অনুকরণস্পৃহার বিচার করিলেন, লিখিলেন,—

'ইহা অবশ্য আমরা স্বীকার করি যে বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য; এবং তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহাদুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পটু নহে, দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়।'

অবশেষে বঙ্কিম অনুকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি মূলতত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। সেগুলি এইরূপ,—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল সাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণ-প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির চরিত্র দোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণ-প্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণ-প্রবৃত্তি অব্যবহিত রূপে স্ফূর্তি পাইলে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে।

এই তো গেল ইংরেজদের বাঙালীকৃত অনুকরণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। এ বিষয়ে আরও উক্তি উদ্ধৃত করিব। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পড়া সম্বন্ধে যে বাঙালীর ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে পূর্ব অধ্যায়ে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, এটিও সেই প্রবন্ধ হইতে। তিনি লিখিলেন,

> 'Young Bengal was forming itself in imitation of Anglo Saxon models of character.'

তবে তিনি ইহাও জানিতেন যে, সর্বাংশে ইংরেজ হওয়া বাঙালীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই লিখিলেন,

> 'Absolute equality with Englishmen Young Bengal will never claim. His physical development can never be equal to his mental and intellectual development.'

তবে যতটুকু পারা যায় বাঙালী, অন্তত পক্ষে যাহাদের মন নূতন ইংরেজী শিক্ষার ফলে আবার জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা—নিজেদের স্বভাব-চরিত্র উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাছাড়া বাহ্যিকই হউক কিম্বা আভ্যন্তরীণই হউক, অর্থাৎ বস্তুগতই হউক বা মানসিকই হউক, সকলদিকেই জীবনযাত্রাকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথমে বাহ্যিক ব্যাপারের কথাই বলি।

গ্রাম অঞ্চলে বাঙালীর বাড়ীঘর বা আসবাবপত্র ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে সাধারণতঃ জাঁকালো হইত না, কিন্তু সৌন্দর্যবর্জিতও হইত না, কোথাও অপরিষ্কার, অগোছালো, বা দৈন্যসূচক হইত না। বাঙালীর উলুখড়ে ছাওয়া ঘরের সৌন্দর্য আমি বাল্যকালেও দেখিয়াছি। পূর্ববঙ্গে পাকাবাড়ী সম্পন্ন জমিদারদেরও অনেক সময়েই থাকিত না। সেই সব খড়ে ছাওয়া বা টিনের চালওয়ালা আটচালার বেড়া দরমার হইত। কিন্তু আমাদের পুরুষানুক্রমিক বাড়ীতে কতকগুলি ঘরের বেড়া হইত শ্রীহট্ট জেলায় তৈরী অতি সূক্ষ্ম শীতল পাটির। উহার উপর বাঁশের অতি সরু বেত আসল

বেত দিয়া নানা ছন্দে কারুকার্য করিয়া বাঁধা হইত, মাঝে মাঝে অভ্রও থাকিত। একটা ছোট বেড়া বাঁধিতেই প্রায় তিন চারি মাস লাগিয়া যাইত। এইরূপ বেড়া বাঁধিবার জন্যই রামপ্রসাদকে পিছনের দিক হইতে বেত আগাইয়া সাহায্য করিতে কন্যারূপে স্বয়ং কালী আসিয়াছিলেন।

আমি বাল্যকালে মামার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের একটি ঝি'র বাড়ীতে যাইতাম। সেই ঘরটির মত পরিষ্কার সুশৃঙ্খল ঘর আমি ধনী বাঙালীর বাড়ীতেও বেশী দেখি নাই।

কিন্তু ইংরেজের রাজত্ব হইবার পর এই ধারা দুদিকে বদল হইল। একদিকে ইউরোপীয় ধরণের অট্টালিকা ও ভিতরে বিলাতী আসবাব দেখা গেল, কিন্তু অন্য দিকে পুরানো পরিচ্ছন্নতা সুশৃঙ্খলা উঠিয়া দৈন্যের আবির্ভাব হইল। বন্ধু বিভূতিভূষণ যে বাড়ীঘরের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে, ও আমি বাল্যকালে যে ধরণের বাড়ীতে বড় হইয়াছি তাহাতে, এই প্রভেদটা ছিল। আমাদের পৈতৃক ও শহরের বাড়ীতে বিলাত হইতে আনা ঝাড় লণ্ঠন, বিলাতী টেবিল ল্যাম্প, আয়না-আরসী, ছবি ইত্যাদি থাকিত। শোয়া-বসার জন্য খাট-পালঙ্ক ও পিঁড়ি ইত্যাদি থাকিলেও তাহারই পাশে চেয়ার, ইজিচেয়ার, টেবিল ইত্যাদিও থাকিত।

কলিকাতার বড়লোকের বাড়ীর বর্ণনা বিশপ হীবার ও তাঁহার পত্নী দিয়াছেন, উহার তারিখ ১৮২৩-২৪ সন। দুইটি বাঙালী বাড়ীর ছবিও হীবার নিজে আঁকিয়াছিলেন. ও তাঁহার 'জার্নালে' এগুলির প্রতিলিপি ছাপা হইয়াছিল। ১৮২৩ সনেও গঙ্গার ধারে যে একটি বাড়ী ছিল তাহার ঘাটের উপরে প্রিন্সেপস্ ঘাটে যেমন থাম্‌ওয়ালা বসিবার হল্ ছিল সেখানেও ছিল। তাহাতে আমি অনেকদিন বসিয়াছি, কারণ তখন ঐ বাড়ীতে আমার এক বন্ধু বাস করিতেন।

এই সব বাড়ীর বাহির যেমন, ভিতরও তেমনিই পাশ্চাত্ত্য ধরণে সাজানো হইত। অবশ্য কলিকাতার বড়লোকের বাড়ীতে আমি পুরানো ধারায় ফরাসপাতা আরাম করিবার ঘর যেমন দেখিয়াছি তেমনি পুরা বিলাতী কায়দায় সাজানো বসিবার, এমন কি শোবার ঘরও দেখিয়াছি। ইহার বর্ণনা উপন্যাসে গল্পে অনেক আছে। একটি প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি— বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল হইতে ঃ—

> 'একজন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুষ্পে, প্রস্তর-পুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল।……কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র কিন্তু কতকগালি সুরুচি-বিগর্হিত…'

ইহার অর্থ অবশ্য চিত্রগুলি নগ্ন রমণীমূর্তির। বঙ্কিমচন্দ্র নগ্নতা সম্বন্ধে সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু নগ্নই হউক কিম্বা বস্ত্র-পরিহিতাই হউক সুন্দরী স্ত্রীলোকের ছবি দিয়া ঘর সাজানো হইত। তখনকার দিনের বাঙালীর ইউরোপীয় সুন্দরীদের সম্বন্ধে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রই একদিন একটি বাড়ীতে গিয়া একটি মুক্তার হার পরা সুন্দরীর দিকে অপলকদৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাকাইয়া ছিলেন। আমাদের টিনের ঘরেও একটি যুবতী মূর্তি ছিল, সে বুকের উপর একটি কপোত ধরিয়া উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালার ঘর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

> 'শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ বিশিষ্ট বিলাতী নারীমূর্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙানো ; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে, তাহা দেওয়ালের কোন ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে ন্যূন নহে।'

কিন্তু চিত্র সবই পাশ্চাত্ত্য। বাঙালী তখনও প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকে মুগ্ধনেত্রে দেখিতে শিখে নাই, তাহা অজন্তার হইলেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারকর্তা হইলেও প্রাচীন হিন্দু চিত্রকলাকে উদ্ধার করিতে চাহেন নাই। তিনি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে' প্রাচীন হিন্দু চিত্র সম্বন্ধে লিখিলেন,

> 'মেয়ে মদ্দে কৌপীনপরা। বুদ্ধদেবের বাপ কপনী পরে বসেছেন সিংহাসনে, তদ্বৎ মা-ও বসেছেন—বাড়ার ভাগ এক-পা মল ও এক-হাত বালা ; কিন্তু পাগড়ী আছে। সম্রাট ধর্মাশোক ধুতী পরে চাদর গলায় ফেলে, আদুড় গায়ে, একটা ডমরু আকার আসনে বসে নাচ দেখছেন। নর্তকীরা দিব্য উলঙ্গ ; কোমর থেকে কতকগুলো ন্যাকড়ার ফালি ঝুলছে। মোদ্দা পাগড়ী আছে—নেবুটেবু সব ঐ পাগড়ীতে।'

বাঙালীর ঘর পুত্তল অর্থাৎ ভাস্কর্য দিয়া সাজাইবার কথাও বলিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন,—

> 'রাধারাণী তখন অল্প একটু হাসিয়া, একবার আপনার পা'র দিকে চাহিয়া, আপনার হাতের বালা খুঁটিয়া, সেই ঘরে বসানো একটা প্রস্তর নির্মিত Niobe প্রতিকৃতি পানে চাহিয়া রুক্মিণীকুমারের পানে না চাহিয়া, বলিল .....'

আমি গ্রীক শোকাভিভূতা মাতা নিয়োবীর মূর্তির ছবি ক্লাস-সেভেনে পড়িবার সময় প্রথম দেখি, সেটা ১৯১০ সন। আজিকার কোনো বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লিখিত মূর্তিটি কি আমাকে বলিতে পারেন নাই। যদি আমি না জানিতাম যে, শিক্ষিত ও সম্পন্ন বাঙালীর ঘরে এই ধরনের মূর্তি রাখা হইত তাহা হইলে বলিতাম কথাটা বঙ্কিমের কল্পিত। আমি একথা বঙ্কিম না বলিলেও অনুমান করিতে পারি, রাধারানীর ঘরের অন্য কোণে অ্যারিয়াড্‌নির মূর্তি বসানো ছিল। মার্বেল পাথরে গড়া প্রাচীন ইউরোপীয় ভাস্কর্যের নকল মূর্তি হ্যামিল্টনের দোকানে বিক্রয় হইত। তখন অনেক বাঙালী হ্যামিল্টনের দোকান হইতে সোনার গহনাও তৈরী করাইতেন।

বাড়ীর মত বাড়ীর অধিবাসীরও রূপ বদলাইয়া গেল—পুরুষ নারী দুই-এবই। বাঙালী পুরুষ ইংরেজ রাজত্বের আগে একমাত্র মুসলমান নবাবদের কর্মচারী হইলে মুসলমানী পোষাক পরিত উহা অন্দরে লইয়া যাওয়া হইত না। বাহিরে বৈঠকখানার পাশে একটা ঘরে থাকিত। সেখানে চোগাচাপকান ইজার ছাড়িয়া পুরুষেরা ধুতি পরিয়া ভিতরের বাড়ীতে প্রবেশ করিত। তাহার প্রবেশ দ্বারে গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা থাকিত। স্লেচ্ছ পোষাক পরিবার অশুচিতা হইতে শুদ্ধ হইবার জন্য পুরুষেরা গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া মাথায় একটা দুইটা তুলসী পাতা দিত। আমি কলিকাতায় বড়লোকের বাড়ীতে সাহেবী পোষাক রাখিবারও এই ব্যবস্থা দেখিয়াছি।

কিন্তু ধনী বা মুসলমানের কর্মচারী ছাড়া অন্য বাঙালী হিন্দুরা শুধু ধুতি ও গায়ে একটা চাদর বা শাল রাখিত। খুব বেশী হইলে মেরজাই পরিত। যেমন গোরা যেদিন প্রথম পরেশবাবুর বাড়ীতে গেল তখন তাহার পরণে ছিল, ধুতি ও মোটা চাদর ছাড়া, ফিতাবাঁধা মেরজাই। ১৯৩০-৪০ সন পর্যন্তও বাঙালী সামাজিক জীবনে বাঙালী পোষাক ভিন্ন সাহেবী পোষাক পরিত না—এক তখনকার দিনে সমাজচ্যুত বিলাতফেরৎ বাঙালী ছাড়া। আমি নিজে 'বি-এন-জি-এস্' (বিলেত না গিয়ে সাহেব) বলিয়া গণ্য হইলেও ১৯৪২ সনে দিল্লী যাওয়া পর্যন্ত সাহেবী পোষাক পরি নাই। এমন কি কলিকাতার গভর্নমেণ্ট হাউসে লর্ড ওয়েভেলের সম্মুখেও উপস্থিত হইবার জন্য ধুতি-পাঞ্জাবীই পরিয়া গিয়াছিলাম। তবে ১৯২০ পর্যন্ত বাঙালীরা সাধারণত ধুতির উপরে শুধু শার্ট অথবা শার্ট এবং কোট পরিত। তবে শার্ট-কোট-পাঞ্জাবীর উপরেও উড়ানী বা শাল পরা সভ্য আচার বলিয়া গণ্য হইত। উড়ানী ছাড়া বাহির হইলে অভদ্র ব্যবহার বলিয়া মনে করা হইত। বিনয় বন্ধু গোরার বাড়ীতে মাত্র যাইতেছে—তবু রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, 'বিনয় কাঁধে একখানা চাদর লইয়া দ্রুতপদে গোরার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।'

কিন্তু বাঙালী মেয়ের পোষাক ও আচার ব্যবহারের আরও আমূল পরিবর্তন হইল। ইহাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী হইবার কারণ ছিল। ইংরেজ শাসনের যুগে পুরুষ বাঙালী মুসলমানী বৈদগ্ধ্য হইতে ইউরোপীয় বৈদগ্ধ্যে অগ্রসর হইয়াছিল। মুসলমান যুগে সম্পন্ন বাঙালী সামাজিক মর্যাদার খাতিরে মুসলমানী পোষাক পরিত ও ফার্সি বলিত। ইহার পর তাহারা ইউরোপীয় ধরণের পোষাক পরিয়া ইংরেজীতে কথা বলিতে লাগিল। মেয়েদের কিন্তু মুসলমান ধাপ ডিঙাইয়া পুরাতন গ্রাম্যধারা হইতে পাশ্চাত্ত্য ধারায় পদার্পণ করিতে হইল। বাঙালী মেয়ের বেলাতে মুসলমানী প্রভাব, না বাহ্যিক ব্যাপারে না মানসিক ধর্মে, কোনও দিকেই দেখা যায় নাই। তখন বাঙালী মেয়ে চিরপ্রচলিত একটি মাত্র শাড়ী ছাড়া অবাঙালী পোষাক পরিলে, বড় জোর উত্তরাপথের হিন্দু ঘাগরা ও কাঁচুলী পরিত, তাহাও বাসর-ঘরে বরের সহিত গোপিনী সাজিয়া তামাশা করিবার জন্য। কিন্তু ইংরেজ শাসনের সময়ে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বামীর যোগ্য পত্নী হইবার জন্য বাঙালী

মেয়েকে যেমন ইংরেজী না শিখিয়াও মানসিক ধর্মে পাশ্চাত্ত্য হইতে হইল, তেমনি পাশ্চাত্ত্য ধরনের কাপড়-চোপড় পরিয়া আচরণেও পাশ্চাত্ত্য হইতে হইল। পাশ্চাত্ত্য মানসিক ধর্মের, পাশ্চাত্ত্য ভব্যতার, ও পাশ্চাত্ত্য বাহ্যিক সৌষ্ঠবের বঙ্গীয় অন্তঃপুরে প্রবেশই বাঙালী জীবনে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে সবচেয়ে বড় মানসিক বিপ্লব। এই মানসিক বিপ্লব যে কত দূরগামী হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায় কয়েকটিতে দিব। এখানে উহার আনুষঙ্গিক বাহ্যিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। উহা ঠেকাইবার কোনও উপায়ই ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই উহা কতদূর প্রকট হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ১৮৭১ সনে প্রথম প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রাচীনা এবং নবীনা' প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায়। উহাতে রহস্যের খাতিরে কিছু অত্যুক্তি ছিল বটে, কিন্তু মূলতঃ উহা যে বাহ্যিক পরিবর্তনের যথাযথ বর্ণনা তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা এইরূপ—

'পূর্ব-কালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা শাড়ী সিন্দূরকৌটা মনে পড়িবে ; বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে ; হাতে পৈছা, কঙ্কণ এবং শঙ্খ (যাহার জুটিল, তাহার বাউটি নামে সোনার শঙ্খ)—মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর সম্মার্জনী বা রন্ধনের বেড়ি ; কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দূরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ ; দাঁতে অমাবস্যার মত মিশি ; এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরী শিখর। আমরা স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে, খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাঁড়াইত, তখন অনেক পুরুষের হৃৎকম্প হইত। যাঁহারা এবম্বিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস করিতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন। ইঁহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠত্বগের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মার্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না। কেন না তাঁহারা "পোড়ারমুখো" "ডেকরা" ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং "আবাগী" "শতেক খয়ারী" প্রভৃতি শব্দ আধুনিক "সখী" "ভগিনী" স্থলে প্রয়োগ করিতেন।

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন, তাঁহারা ভিন্ন প্রকৃতি। সে শাঁখা শাড়ী সিন্দূর মিশি মল মাদুলী, কিছুই নাই ; অনভিধানিক প্রিয় সম্বোধনসকল সকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে, যেখানে আগে মোটা মনসা-পেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুরে ডুরে, রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ-বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতা বেড়ী ঝাঁটা কলসীর পরিবর্তে,

সূচ সুতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে ; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে ; কবরী মূর্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে ; এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া অলংকারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকর্দমরঙ্গিনীগণ সাবান সুগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন ; কলকণ্ঠধ্বনি পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেক্‌রা সর্বনেশে নহে, তত্তৎস্থানে সম্বোধনপদসকল দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূলে কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে।'

এই সকল নূতন-বেশধারিণীদের দেখিয়া নব্য বাঙালী স্বদেশবাসিনীকে বিদেশিনী মনে করিয়া মুগ্ধ হইত। বাঙালীর একটি পুরাতন গান ছিল—'তোমায় বিদেশিনী কে সাজিয়ে দিলে'—উহা জীবনে সার্থক হইতে চলিল। গোরা নব্যহিন্দুত্বের ঝোঁকে জীবন হইতে নারীকে নির্বাসিত করিতে বদ্ধপরিকর ছিল, সেও সুচরিতার রূপ ও সৌকুমার্য ছাড়া শুধু বেশ দেখিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

উহার বিবরণ এইরূপ,—

'নবীনা রমণীর বেশভূষার প্রতি গোরা পূর্বে কোনোদিন ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে নাই এবং না দেখিয়াই সে-সমস্তের প্রতি তাহার একটা ধিক্কারভাব ছিল—আজ সুচরিতার দেহে তাহার নূতন ধরনের শাড়ী পরার ভঙ্গী তাহার একটু বিশেষভাবে ভালো লাগিল ; সুচরিতার একটি হাত টেবিলের উপরে ছিল—তাহার জামার আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মত বোধ হইল। দীপালোকিত শান্ত সন্ধ্যায় সুচরিতাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত ঘরটি তাহার আলো, তাহার দেয়ালের ছবি, তাহার গৃহসজ্জা, তাহার পারিপাট্য, লইয়া একটি যেন বিশেষ অখণ্ড রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিল……

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখিলেন—

'এরূপ অপূর্ব উপলব্ধি তাহার জীবনে কোনোদিন ঘটে নাই। দেখিতে দেখিতে ক্রমশই সুচরিতার কপালের ভ্রষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছে শাড়ীর পাড়টুকু পর্যন্ত অত্যন্ত সত্য ও অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল। একই কালে সমগ্রভাবে সুচরিতা ও সুচরিতার প্রত্যেক অংশ/ স্বতন্ত্রভাবে গোরার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।'

রবীন্দ্রনাথ নবীনা বাঙালী মেয়ের যে বর্ণনা দিলেন তাহা ১৮৮০ সনের কাছাকাছি। এই নবীনা মূর্তি যিনি চক্ষুগোচর করিতে চান, তাঁহাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী তরুণী কাদম্বরী দেবীর ছবি দেখিতে বলিব। এই মূর্তি ১৮৯৫-১৯০০ পর্যন্ত প্রকট ছিল। তাহার পর ১৯০০ সনের কাছাকাছি বাঙালী বধূরা বিলাতে মেমেরা যে-ধরনের জ্যাকেট পরিত উহা

শাড়ীর নীচে পরিতে আরম্ভ করিল। উহা শীতকালের জন্য ভিনিশিয়ান সার্জের হইত ও আস্তিন কাঁধের কাছে খুবই ফোলা হইত—যাহাকে বিলাতে 'মাটন-চপ-স্লীভ' বলা হইত। ইহা ছিল পুরা হাতের মাপের, এবং নীচের দিকটা কালো মখমলের হইত। আমার মাকে উহা পরিতে দেখিয়াছি। আমার শাশুড়ী ঠাকুরানীরও তাহা ছিল। ১৯০৫ সনের কাছাকাছি জ্যাকেটের রূপ বদলাইয়া গেল, তখন কনুয়ের নীচে লেসের ফোলানো 'ফ্রীল্' থাকিত। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ সাহা বা মল্লিক কোম্পানীর জবড়জঙ জ্যাকেট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর ১৯১৪-১৫ সন হইতে হাতকাটা আঁটা ব্লাউস আসল।

গলা হইতে পা পর্যন্ত, এইরূপ পোষাকে শিক্ষিত আধুনিক হিন্দু পরিবার এবং ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু পায়ের বেলাতে উহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ১৯২০ পর্যন্ত হিন্দু পরিবার আধুনিক হইলেও উহার বিবাহিতা মেয়েরা কখনই জুতা পরিত না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্ম পরিবারে শুধু জুতা নয় মোজা পর্যন্ত পরা হইত, তাহা প্রায় ব্রাহ্ম ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করা হইত। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'মেয়েদের পায়ে মোজা দেওয়াকে বরদাসুন্দরী এমন ভাবে দেখেন যেন তাহাও ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের একটা অঙ্গ।'

হিন্দুরাও মেয়েদের পায়ে জুতা মোজা দেখিলে উহাদের ব্রাহ্ম বলিয়াই ধরিয়া লইত। এমন কি গোঁড়া হিন্দুর আপত্তি যত না ছিল ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে, তাহার চেয়ে বেশী ছিল মেয়েদের জুতা মোজা পরা সম্বন্ধে। প্রভাতকুমারের একটি গল্পে যুবকপুত্র ব্রাহ্মধর্মের দিকে ঘেঁষিয়াছে ও তরুণী পত্নীকে কলিকাতায় নিয়া একসঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইবে সংকল্প করিয়াছে। তাহার পিতা বধূকে লইয়া যাইতে দিবেন না, বলিলেন, 'নিজে যে-চুলোয় ইচ্ছে হয় সেই চুলোয় যাক। বাড়ীর বউটাকে যে জুতো মোজা পরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে, সে আমি বেঁচে থাকতে দেখতে পারব না।' শরৎচন্দ্রও বিজয়া সম্বন্ধে লিখিলেন, 'বাঙালীর মেয়ে—আঠারো-উনিশ-কুড়ি পার হইয়া গেছে, তথাপি বিবাহ হয় নাই—সে প্রকাশ্যে জুতা মোজা পরে—খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না—ইত্যাদি কুৎসা গ্রামের লোকেরা সঙ্গোপনে করিতে লাগিল।'

জুতা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পশ্চিমবঙ্গে বেশী প্রবল ছিল। তাই আমরা যখন ১৯১০ সনে ময়মনসিংহ জেলা হইতে কলিকাতায় বাস করিতে আসিলাম, তখন একটু মুশকিল হইল। আমার মা অল্প বয়স হইতেই বাড়ীতে চটিজুতা ও বাহির হইতে হইলে পাম্প-জুতা পায়ে দিতেন। আমরা বালীগঞ্জে থাকিতাম। মা কখনও কখনও রেলে কলিকাতা যাইতেন। তখন মেয়েদের গাড়ীতে অন্যেরা তাঁহার পায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'আপনারা ?' মাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইত, 'আমরা ব্রাহ্ম।' নহিলে বেশ্যা বলিয়া মনে করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই দুর্নাম এড়াইবার জন্য মাকে

মিথ্যা কথা বলিতে হইত।

পোশাকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আচার-ব্যবহার ও কাজকর্মেরও পরিবর্তন হইল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, যে, 'হাতে হাতা, বেড়ী, ঝাঁটা, কলসীর পরিবর্তে সূচসূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে।' উহা সর্বাংশে সত্য নয়। আমি নবীনা বাঙালী মেয়ের শাড়ী পরিবার বর্ণনা 'গোরা' উপন্যাসে সুচরিতার বেশ হইতেই দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সুচরিতাকেও রান্না করাইয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, 'তখন ফুটন্ত তেলের মধ্যে অনেকখানি শাক তরকারী ছ্যাঁক ছ্যাঁক করিতেছিল এবং খোন্তা দিয়া সুচরিতা তাহাকে বিধিমত নাড়া দিতেছিল।' তবে সম্পন্ন ঘরে বধূরা সেই যুগে এবং পরবর্তী আমাদের যুগেও নিয়মিত রান্না করিত না, তাহারা সেলাই, বোনা, এবং কার্পেটের কাজ লইয়া সময় যাপন করিত, অবশ্য কর্তব্য হিসাবে—মনের খুশিতে উপন্যাস পড়িত। বঙ্কিম মেয়েদের হাতে কেতাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তবে বড়াই করা হয় এই আশঙ্কায় বলেন নাই যে, 'কেতাব' তাঁহারই উপন্যাস।

তখনও বিবাহের জন্য কুমারীদের গানবাজনা শিখিবার রেওয়াজ হয় নাই, কিন্তু সেলাই বোনা ও কার্পেটের কাজ করা অবশ্যই কর্তব্য ছিল। শহরে তো ছিলই, গ্রামেও ছিল। 'গোরা'তে রবীন্দ্রনাথ ইহারও বিবরণ দিয়াছেন। পরেশবাবুর পত্নী বরদাসুন্দরী বড় মেয়ে লাবণ্যকে বলিলেন,

> 'যে সেলাইটার জন্যে তুমি প্রাইজ পেয়েছিলে সেইটে নিয়ে এসো তো, মা।'
>
> একটা পশমের সেলাই করা টিয়াপাখীর মূর্তি এই বাড়ির আত্মীয় বন্ধুদের নিকটে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মেমের সহযোগিতায় এই জিনিষটা লাবণ্য অনেকদিন হইল রচনা করিয়াছিল, এই রচনায় নিজের কৃতিত্ব যে বেশি ছিল তাহাও নহে—কিন্তু নূতন-আলাপী মাত্রকেই এটা দেখাইতে হইবে সেটা ধরা কথা।

বিনয় উহা দেখিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিল।

আমাদের বাল্যকালে কিন্তু এটা ধরা ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল। মেমসাহেবদের সাহায্য দূরে থাকুক, উহাদের কাছে শিক্ষাও পর্যন্ত হইত না। কার্পেটের উপর পশমের ছবি রচনা করা গ্রাম অঞ্চলেও ধরা ব্যাপার, অর্থাৎ বিবাহযোগ্যা কুমারীর একটা বিশেষ যোগ্যতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই আমি অতি অজ পাড়াগাঁয়েও গিয়া, যেখানে হাতী-ঘোড়া, পাল্কী নৌকা ভিন্ন যাওয়া সম্ভব ছিল না সেখানেও গিয়া, দরমা বা চাটাই-এর বেড়ার উপর ফ্রেম করা পশমের কাজ টাঙানো দেখিয়াছি—তাহাতে বিলাতী ফুল বিকশিত হইত, বিলাতী কুকুর দাঁড়াইয়া থাকিত, এমন কি এ-বি-সি-ডি ইত্যাদি সমস্ত ইংরেজী বর্ণমালাও দেখা যাইত।

কিছুদিন আগে বিলাতে আমাদের জীবনযাত্রার উপর ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হই। উহাতে এই সব শিল্পের

কথা উল্লেখ করিয়া খসড়াটা পত্নীকে দেখাই। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'মা'রও বিলেত থেকে আনা কার্পেটের কাজের প্যাটার্ন বই ছিল। কয়েকটা পাতা আমার কাছে রয়েছে',—বলিয়া ১৯০০ সনের কাছাকাছি বিলাতে ছাপা ছবির পাতা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন। বিনয়ের মত আমারও তো চক্ষু বিস্ফারিত হইল। দেখিলাম বিলাতী ফুলপাতার ছবি, প্রকান্ড বিলাতী কুকুরের ছবি, এ-বি-সি-ডি-র ছবি, এমন কি একটি চটি জুতার প্যাটার্ন—বন্দুক ও কুকুরের মাথা সমেত। বাঙালী ভদ্রলোক গ্রামে পশমের কাজের কুকুর ও বন্দুক যুক্ত মখমলের চটি পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কল্পনা করিয়া দেখুন।

ইহার পরবর্তী যুগেও সেলাই করা, বোনা ও কার্পেটের কাজ করা বাঙালী মেয়েরা ছাড়িয়া দেয় নাই, বরঞ্চ স্কুল-কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন 'অ্যাকমপ্লিশমেণ্ট'গুলি রাখিবার চেষ্টা করিত। এখানে বলা প্রয়োজন, আমার বাল্যকাল পর্যন্ত যে বাঙালী মেয়ে এই সব হাতের কাজ করিত তাহাদের 'অ্যাকমপ্লিশড্' বলিয়া প্রশংসা করা হইত। সুতরাং ১৯০৯ সনে জন্মিয়া আমার পত্নীও এই সব কাজে শিক্ষা পাইয়া দক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় আমারই কলেজ স্কটিশচার্চ-এ 'কোয়েডুকেশনে'র যুগে পড়াশুনা করিয়াছিলেন, এমন কি উদ্ভিদতত্ত্বের ছাত্রী হইয়া মাইক্রোস্কোপ লইয়া যথেষ্ট ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছিলেন। তিনিও তখন, অর্থাৎ বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে, কার্পেটের উপর বিলাতী প্যাটার্ন হইতে বড় বড় ফুলের তোড়া পশম দিয়া রচনা করিয়াছিলেন। তাহা এখনও ভাল অবস্থাতেই আছে, এবং বর্তমানে অক্সফোর্ডে মেমসাহেবরাও উহা দেখিয়া চমৎকৃত হন।

অনেক সময়ে বিবাহের উদ্দেশ্য ছাড়া ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্ম ধরণের পরিবারের কুমারীরা লাস্য হিসাবেও বোনার কাজ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'লাবণ্য একটা চৌকিতে বসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দুই লোহার কাঠি লইয়া বুনানির কার্যে লাগিল—তাহাকে কবে একজন বলিয়াছিল বুনানির সময় তাহার কোমল আঙুলগুলির খেলা ভারি সুন্দর দেখায়, সেই অবধি লোকের সাক্ষাতে বিনা প্রয়োজনে বুনানি তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।'

কিন্তু এই সূত্রে এটাও বলা প্রয়োজন যে সেকালে ইংরেজ সমাজে স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া গল্প-গুজব করিবার বা সাহিত্য পড়ার সময়ে মেয়েরা হাতে বোনা লইয়া বসিতেন। আমাদের মেয়েরাও গল্প করিবার বা শুনিবার সময় হাতে বোনা লইয়া বসিতেন।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙালী গৃহস্থালিতে যে বাহ্যিক পরিবর্তন দেখা দিল তাহার মধ্যে সম্পন্ন বাঙালী বাড়ীতেও আড়ম্বর বা ঐশ্বর্য বেশী ছিল না; কিন্তু একটা নূতন সৌন্দর্য ও মাধুর্য দেখা দিল। উহার পরিচয়ও রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতেই দিব। তিনি পরেশবাবুর গৃহস্থালি দেখিয়া বিনয়ের মনের ভাব সম্বন্ধে লিখিলেন—

'মেয়েরা যে তাহাদের হাসির শব্দে ঘর মধুর করিয়া রাখিয়াছে, চা তৈরী করিয়া পরিবেশন করিতেছে, নিজেদের হাতের শিল্পে ঘরের

দেয়াল সাজাইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে ইংরেজী কবিতা পড়িয়া উপভোগ করিতেছে, ইহা যত সামান্যই হউক বিনয় ইহাতেই মুগ্ধ হইয়াছে। বিনয় এমন রস তাহার মানবসঙ্গ-বিরল জীবনে আর কখনও পায় নাই। এই মেয়েদের বেশভূষা হাসি কথা কাজকর্ম লইয়া কত মধুর ছবিই যে সে মনে মনে আঁকিতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। শুধু বই পড়িয়া ও মত লইয়া তর্ক করিতে করিতে যে ছেলে কখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে জানিতেও পারে নাই, তাহার কাছে পরেশের এই সামান্য বাসাটির অভ্যন্তরে এক নূতন এবং আশ্চর্য জগৎ প্রকাশ পাইল।'

ইহা নবযুগের সকল বাঙালী যুবক সম্বন্ধেই বলা যাইত।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবাহ, দাম্পত্য জীবন ও প্রেম

ইংরেজী শিক্ষার বাহ্যিক প্রকাশের কথা বলিলাম, এবার মানসিক জীবনে উহার কি ফল হইয়াছিল তাহার পরিচয় দিব। মানুষের মনের যত কিছু দিক বা ক্রিয়া আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই শিক্ষার ফলে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। তাহার আভাস আগেও দিয়াছি, এখন বিশিষ্ট ব্যাপারের কথা বলিব। প্রথমেই পুরুষ-নারীর সম্পর্কে যে নূতনত্ব দেখা দিল তাহার পরিচয় দিব, কারণ ব্যক্তিগত জীবনে ইহার চেয়ে অন্য কোনো ব্যাপার তীব্রতম অনুভূতির অবলম্বন নয়। এই সম্পর্কের মধ্যেও যতটুকু বিবাহিত জীবনের মধ্যে আবদ্ধ তাহার কথাই প্রথম বলিব।

বিবাহের আনুষ্ঠানিক রূপ

মূলত এই রূপটা প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগে যাহা ছিল আজও তাহাই রহিয়াছে। তবে সেকালের গ্রাম্য ভাব ইংরেজী শিক্ষার পর আর থাকে নাই। এ-জিনিষটার পরিচয় সাহিত্য হইতে দিব, কেন-না অন্য কোনও তথ্য প্রমাণ নাই। তাহাও দিব ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' হইতে, 'বিদ্যাসুন্দর' হইতে নয়। 'বিদ্যাসুন্দর' 'অন্নদামঙ্গলে'র অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহাতে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের বর্ণনা সংস্কৃত কাব্যের ধারা অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে। তাই উহাতে বিবাহের অনুষ্ঠান গান্ধর্ব। উহার বর্ণনা বাঙালীর লৌকিক নর-নারীর সম্বন্ধের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, গ্রহণ করা সঙ্গতও হইবে না। বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের লৌকিক ধারা কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় পাইবার জন্য 'অন্নদামঙ্গলে' ও 'মানসিংহে' যাইতে হইবে। প্রথমে অনুষ্ঠানের রূপ কি দেখাইব।

যাঁহাদের বিবাহের অনুষ্ঠান হইতে বাঙালী সমাজের গ্রাম্যতা দেখা যাইবে উহা হর-গৌরীর বিবাহের অনুষ্ঠান। ঠাকুর-দেবতা বলিয়া উহাদের বিবাহকে স্বর্গ-লোকের ব্যাপার করা হয় নাই, বাঙালী গৃহস্থ ঘরের অনুষ্ঠান বলিয়াই দেখান হইয়াছিল।

সম্বন্ধ লইয়া আসিলেন নারদমুনি। তিনি গিরিরাজের বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন বালিকা উমা সখীদের লইয়া খেলা করিতেছেন। নারদ তখনই গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ইহাতে অকল্যাণের আশঙ্কা করিয়া উমা তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,

'শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়
আমারে প্রণাম করা উপযুক্ত নয়।।
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
দেখিয়া এমন কার্য করিলা কেমনে।।'

তারপর দৌড়িয়া গিয়া মায়ের কাছে নালিশ করিলেন,

'কোথা হৈতে বুড়া এক ডেকরা বামন
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ ॥
নিষেধ করিনু কত প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে ॥
দুটা লাউ বাঁধা কান্ধে কাঠ একখান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান।
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া ॥'

মেনকা অবশ্য তখনই বুঝিলেন কে আসিয়াছেন, ও বাহির বাড়ীতে আসিয়া সসম্ভ্রমে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শুনিয়া হিমালয়ও দ্রুতপদে আসিলেন। বিবাহ ঠিক হইয়া গেল।

শিব উপযুক্ত ধুমধাম করিয়া বিবাহ করিতে আসিলেন। সঙ্গে বরযাত্রী কেবল যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু আদি দেবতাগণ তাহাই নয়, ভূতপ্রেতও বটে। শিব নিজে বাঘছাল পরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সাপেরা শরীরে কুণ্ডলী পাকাইয়া উহা আটকাইয়া রাখিয়াছে। মাথায় জটা, গায়ে ভস্ম, গলায় হাড়ের মালা। কন্যা-যাত্রীরা দেখিয়া বলে, এ কেমন সুপাত্র! গিরিরাজও বর দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। কিন্তু পাছে ভূতেরা দ্বিতীয় দক্ষযজ্ঞ করিয়া বসে এই ভয়ে আপত্তি না করিয়া সম্প্রদান করিলেন। তাহার পর স্ত্রী-আচার করিবার জন্য মেনকা আসিলেন। এয়োগণ প্রদীপ ধরিয়া রহিল, মেনকা বরণ করিতে গেলেন। এমন সময় বিষ্ণুর মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগিল। তিনি গরুড়কে লেলাইয়া দিলেন।

'গরুড় হুঙ্কার দিয়া উতরিল গিয়া।
মাথা গুঁজে সব সাপ গেল পলাইয়া ॥
বাঘছাল খসি গেল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে, মাগো এ কেমন বর ॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা ॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥'

মেনকা লজ্জায় দাঁতে জিব কাটিয়া নিজের ঘরে গিয়া নারদকে গালি পাড়িতে লাগিলেন,—

'ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে।
কেমনে এমন বর আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদের কথায় করিল হেন কাজ ॥'

কিন্তু উলঙ্গ শিবকে দেখিয়া এয়োগণের মধ্যে অন্য ধরণের কোঁদল বাধিয়া গেল।

'এ বলে উহারে, সই, ওটা বড় ঠেটা।
আর জন বলে, সই, এই বটে সেটা॥
যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা।
আই মাগো চেয়ে রইল ফেলিয়া ঘোমটা॥
সে বলে নাফানী আ লো না জান আপনা।
গোবিন্দ সুন্দরে দেখি চেয়ে রইল কেটা॥'

ব্রহ্মাকে লইয়াও ঝগড়া বাধিয়া গেল। একজন বলিল,

'চারিমুখো রাঙ্গাটা বরের ভাই হেন।
তার দিকে তোর দিদি চেয়ে রইল কেন॥
সে বলে নাকানী আ। লো না জান আপনা।
চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা॥'

একদিকে এয়োদের মধ্যে যখন এইভাবে মাথা কুটাকুটি, ঝুটাঝুটি ও গালাগালি হইতে লাগিল, তখন অন্যদিকে মেনকা বিলাপ করিতে লাগিলেন,—

'আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে।
কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে॥
আলো নিবায়িল সবে দারুণ লজ্জায়।
কপালে আগুন তার আলো করে তায়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥
বরযাত্র প্রেতগণ দাঁড়াইয়া মুতে।
ভাগ্যবলে এয়োগণে না পাইল ভূতে॥'

ভারতচন্দ্র যে কবি হিসাবে গ্রাম্য বা অবিদগ্ধ নহেন তাহার পরিচয় 'বিদ্যাসুন্দরে' সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু যিনি রাজপুত্র ও রাজকন্যার বেলাতে প্রাচীন ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের অভাব দেখান নাই, তিনি হর-পার্বতীর বেলাতে এই স্তরে নামিলেন কেন? উহার কারণ সম্ভবত এই যে, 'বিদ্যাসুন্দর' রাজা-রাজড়াদের জন্য লেখা, কিন্তু 'অন্নদামঙ্গল' সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের জন্য লেখা।

তাহাদের কাছে হর-পার্বতীর বিবাহ তাহাদের রসবোধ ও আচরণের সহিত সমঞ্জস করিবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই আচরণের সহিত হিন্দু অতীত ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ আচরণের ও আচার ব্যবহারের কোন সামঞ্জস্য নাই।

ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিব।

প্রাচীন হিন্দু বৈদগ্ধ্যে পৃথিবীর যে কোনো যুগের যে-কোনো দেশের সভ্য মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের ছিল না। শুধু বিবাহের বেলাতেই কোন্ স্তরের ছিল দেখাইব। কালিদাসের 'রঘুবংশে'র ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরের বর্ণনা আছে। মনে রাখিতে হইবে ইহাতে যে মানসিক অনুভূতির পরিচয় রহিয়াছে,

উহা কালিদাসের সময়ের, অর্থাৎ হিন্দু সভ্যতার উচ্চতম প্রকাশ যে-যুগে হইয়াছিল তাহার। ইন্দুমতীর পাণিপ্রার্থী রাজারা সারি দিয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া আছেন, ও কালিদাস যাহাকে 'শৃঙ্গার চেষ্টা' বলিয়াছেন তাহা বিভিন্নরূপে দেখাইয়া ইন্দুমতীর মন পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যেমন একজন বাম হাত সিংহাসনের উপর রাখিয়া সেদিকে হেলিয়া বন্ধুর সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার গলার হার বুকের দিক হইতে বিস্রস্ত হইয়া পিঠের দিকে সরিয়া গেল। আর একজন মুকুট ঠিক রাখিবার জন্য হাত তুলিলেন. তাহাতে তাঁহার আংটির হীরার জ্যোতি আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া দেখা যাইতে লাগিল।

প্রতিহারিণী সুনন্দা (পুরুষতুল্য প্রগল্‌ভা) ইন্দুমতীকে পর পর রাজাদের সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহাদের গুণবর্ণনা করিতে লাগিল ও কাহাকে বরণ করিলে ইন্দুমতীর কোন্ কোন্ বিষয়ে সুখ হইবে তাহা বলিল। যেমন, মগধের রাজা পরন্তপের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিল,—'ইনি গম্ভীর স্বভাব প্রজারঞ্জক শরণার্থিদের শরণ্য রাজা পরন্তপ। ইনি যথার্থনামা। (অর্থাৎ তিনি সত্যই সমস্ত শত্রুকে নিপাত করিয়াছেন)। সহস্র সহস্র রাজা থাকিতেও পৃথিবী ইঁহাকেই রাজা বলিয়া মানিয়াছে, যেমন অগণিত তারকা থাকা সত্ত্বেও একমাত্র চন্দ্রই আকাশে প্রতিভাত হন। তুমি যদি ইচ্ছা কর যে, ইনিই তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন তাহা হইলে তুমি যখন পুষ্পপুরে প্রবেশ করিবে তখন প্রাসাদশ্রেণীর বাতায়নে বাতায়নে দণ্ডায়মানা পুরসুন্দরীদের নয়নের উৎসবের মত হইবে।'

ইহা প্রতিহারিণীর (অর্থাৎ ঝি-জাতীয় স্ত্রীলোকের) ভাষা ও ভাব। সুনন্দা যে কেবল রাজাদের গুণ বর্ণনাই করিল তাহাই নয়—তাহার উপর রাজাদের রাজধানীর পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথাও বলিল। যেমন,

১। তুমি যদি অবন্তীরাজকে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাঁহার প্রাসাদের বাতায়ন হইতে শিপ্রানদীর তরঙ্গ হইতে উত্থিত অনিলের দ্বারা উদ্যানের তরুশ্রেণীকে আন্দোলিত হইতে দেখিবে।

২। তুমি যদি মথুরা-রাজকে গ্রহণ কর, তাহা হইলে যমুনা নদীর জলকণার দ্বারা সিক্ত শিলাতলে বসিয়া ময়ূরের নৃত্য দেখিবে।

৩। তুমি যদি কলিঙ্গরাজকে গ্রহণ কর তাহা হইলে তাঁহার প্রাসাদের বাতায়ন হইতে বীচিমালা মন্দ্রিত অম্বুরাশি দেখিবে, তালীবনের মর্মরধ্বনি শুনিবে, ও সিন্ধুর পরপার হইতে আনীত লবঙ্গ ফুলের সৌরভ আঘ্রাণ করিবে।

আজিকার কোন স্বয়ম্বরা বধূও (অর্থাৎ লাভ-ম্যারেজ-কারিণীও) ভাবী স্বামীর বাসস্থলের সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, অবশ্য হইতে পারেনও না, কারণ তাঁহাদের কোনো স্থায়ী বাসস্থানই নাই।

ইহার পর ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পর বিবাহ সম্বন্ধে বাঙালীর ভাব-পরিবর্তন কোন্ স্তরের পদ্যে প্রকাশ পাইল তাহা একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। কথাগুলি এই—

'মনে পড়ে আজি আমাদের সেই বিবাহ-রাতি,
স্পন্দিত বুকে হইনু দুজনে জীবনে সাথী ;
চারিদিকে দোলে আলো আর ফুল,
পল্লী সখীরা প্রমোদে আকুল,
দীপ্তিভূষণ রঙ্গমহল, রূপের ভাতি,
মধু-পরিহাস রস-উচ্ছল বাসর-রাতি।

'মনে পড়ে সেই ধূসর অলকে, দাঁড়ালে এসে—
পা-দুটি ডুবায়ে দুধে-আলতায় বধূর বেশে,
পথধূলি-ম্লান সুকুমার শ্রীটি,
লজ্জাবতীর সম নত দিঠি
অয়ি মঙ্গলা, আলয়-কমলা ভুলালে মোরে,
পুর-লক্ষ্মীরা লইল তোমারে বরণ করে।'

ইহাও অতি সাধারণ বাঙালী বাড়ীর বিবাহের কথা। কবিতাটি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের, উহার নাম 'শেষ-বাসরে'। বিবাহের দিন ক'টিকে স্মরণ করিয়া তিনি লিখিলেন,

'এস সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-শেষ বাসরে'।

কবিতাটি ১৯১১ সনের জুন মাসে প্রকাশিত 'ঝরাফুল' কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। বইটি কিভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিব, কারণ এই ব্যাপারেও বাঙালী মনের সজীব অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বইটি প্রকাশিত হইবার পর উহা পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এতই মুগ্ধ হ'ন যে তিনি করুণানিধান বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। করুণাবাবু তখন অজ্ঞাতনামা, সামান্য বেতনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিসে কাজ করেন। তবু আগ্রহ-বশে দ্বিজেন্দ্রলাল করুণাবাবু ডাফ্ স্ট্রীটে থাকেন এইটুকু মাত্র জানিয়া, তাঁহার নন্দকুমার চৌধুরীর লেনে 'সুরধাম' বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সেই রাস্তার এক-প্রান্ত হইতে প্রতিটি বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'করুণাবাবু, করুণাবাবু' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলেন, ও তাঁহাকে বাহির করেন। আজ কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক নূতন লেখক সম্বন্ধে এই আগ্রহ দেখাইবেন, উহা অকল্পনীয়। পরবর্তী কালে করুণাবিধান বাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনার কবিতা অপূর্ব। আর লেখেন না কেন?' তিনি ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'ভাই, আর আসে না!' তখন বাঙালী জীবনে সন্ধ্যা নামিয়াছে।

দাম্পত্য জীবন ও পত্নীর প্রতি স্নেহ

প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগে বাঙালীর দাম্পত্যজীবন কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় দিবার জন্যও কাব্যেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। ইহাতে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হইবে না, কারণ সে-যুগের কাব্য লৌকিক কাব্য, সাধারণ লোকের জন্য

রচিত হইত। সুতরাং জীবনের যে-কোনও ব্যাপার কাব্যে বর্ণনা করিতে হইলে, বিষয়-বস্তু যাহাই হউক কাব্যেও তাহার বর্ণনা প্রচলিত বাঙালী আচার-ব্যবহার ও ধারার অনুযারী করিতে হইত। হরগৌরীর বিবাহের বর্ণনাতেও তাহাই দেখা গেল। দাম্পত্য জীবনের বেলাতেও তাহা দেখা যাইবে। আমি সেকালের দাম্পত্য-জীবনের পরিচয় ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের রচনা হইতে দিব। তবে এই ক্ষেত্রে দুই কবির বর্ণনাতেই দুই রকমের দাম্পত্যজীবনের বর্ণনা দেখা যায়—উহার একটি দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের, অপরটি সম্পন্ন ভূস্বামী অথবা বণিকের ঘরের। দুই-এর মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যাইবে। দরিদ্র বাঙালীর ঘরে দাম্পত্য জীবন প্রধানত অর্থাভাবের জন্য ঝগড়া, ধনবান বাঙালীর ঘরে দাম্পত্য জীবন সতীনদের মধ্যে স্বামীর রতি পাইবার জন্য আড়াআড়ি।

প্রথমে দরিদ্রঘরের দাম্পত্য জীবনের পরিচয় দিব। এক্ষেত্রেও দরিদ্র দম্পতি হরগৌরী।

পার্বতী স্বামীর ঘর করিতে আসিয়া যাহা পাইলেন ও করিলেন তাহা 'কুমার-সম্ভবে' অষ্টম সর্গের বিবরণের অনুযায়ী নয়। নিজের বিবাহিত জীবন স্মরণ করিয়া পার্বতী বলিলেন,—

'করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া ॥'

কিন্তু শিবও পত্নীর এই অবস্থা দেখিয়া কুণ্ঠিত হইলেন না। উল্টা তিনি পার্বতীর বিরুদ্ধে নালিশ আরম্ভ করিলেন।

'নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাধ করে একদিন পেটভরে খাই ॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরমে ভরম গেল উদরের লেগে ॥'

তারপর দুঃখ করিলেন,—।

'আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কতমতে স্বামীর সেবন করে তারা ॥'

কিন্তু তাঁহার বেলাতে,—

'সর্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥'

এই উল্টা গঞ্জনায় পার্বতীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল, তারপর যখন আরও শুনিলেন, দারিদ্র্যের জন্য শিব তাঁহাকেই দায়ী করিতেছেন, তখন আর তাঁহার মুখে বাঁধ রহিল না। শিব বলিয়াছিলেন,—

'পরস্পর পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রী-ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥'

অর্থাৎ শিবের কপালের জোরে গণেশ-কার্তিক জন্মিয়াছেন, কিন্তু পার্বতীর

কপালের জন্য অভাব। পার্বতী এই উক্তির সমুচিত উত্তর দিলেন,—

'উহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥
বড় পুত্র গজানন চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি ক্ষুদ কুড়া যা পান ঠাকুর।
তাঁহার ইঁদুরে করে কুটুর-কাটুর॥
ছোটপুত্র কার্তিকেয় ষড়াননে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায়॥'

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন, শিব যদি তাঁহার জন্যই দরিদ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিবাহের পূর্বে কত ধন ছিল?

'গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কতধন লয়ে॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু
তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরা অলক্ষণা কন কি কারণ॥'

ভারতচন্দ্র যে পার্বতীর মুখে এই কটূক্তি দিলেন, তাহার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, নিশ্চয়ই জানিতেন দারিদ্র্যের জন্য পতিকে গঞ্জনা দেওয়া ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী শুধু যে মহাপাপ তাহাই নয়, হিন্দু 'ক্রিমিন্যাল কোড' অনুযায়ী 'ক্রিমিন্যাল অফেন্স'-ও বটে। মনু বিধান দিয়াছেন,—

ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতি-গুণদর্পিতা
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে।

অর্থাৎ যে স্ত্রী জ্ঞাতি-গুণদর্পিতা হইয়া, অর্থাৎ বাপের টাকার গুমোরে, স্বামীর অপমান করে তাহাকে রাজা বহুলোকের সমক্ষে কুকুর দিয়া খাওয়াইবেন। ভারতচন্দ্র কামশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মনুসংহিতা পড়েন নাই তাহা মনে করা যায় না, তবু পার্বতীকে দিয়া শিবের অপমান করাইলেন। এমন কি পরবর্তী যুগের বাঙালী গল্প-লেখক স্ত্রীকে 'জ্ঞাতি-গুণদর্পিতা' বলিয়া দেখাইলেও পরে যে অনুতপ্তা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র তাহাও দেখান নাই। যেমন শরৎচন্দ্রের 'দর্পচূর্ণ' গল্পে ইন্দু দরিদ্র স্বামীকে শুধু যে দিনের পর দিন অসহ্য অপমান করিল তাহাই নহে, তাহাকে পীড়িত ও মৃত্যুমুখীন দেখিয়া এ-কথাও বলিল, 'নিজের প্রাণটা নষ্ট করে আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, বাবা আমাকে দশহাজার টাকা উইল করে দিয়েছেন।' কিন্তু শেষে সে-ও গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ননদকে বলিল, 'যা এত দিন আমাকে আলাদা করে রেখেছিল, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে আমি নিজের স্থান নিতে চললুম।'

প্রাগ্‌-ব্রিটিশ যুগের লেখক ভারতচন্দ্র স্ত্রীর এরূপ অনুতাপ কল্পনাও করিতে পারিলেন না, তাই তাঁহার কাব্যে ক্রুদ্ধা বাঙালী পত্নীর যা স্বাভাবিক কাজ তাহাই পার্বতী করিলেন, অর্থাৎ বাপের বাড়ী চলিলেন। ইহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে হইল অন্যকে—

'কহে সখী জয়া শুন লো অভয়া
এ কি কর ঠাকুরালি,
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ-ঘর
খেয়াতি হবে কাঙালী।
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া,
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।'

এই কথায় পার্বতী বাপের বাড়ী যাওয়া হইতে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভৎর্সনায় শিব গৃহ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন,—

'হোথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া ॥'

কিন্তু ইহাতে পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়া দূরে থাকুক, শিব গ্রাম্য বালক-গণের হাসির অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইলেন,—

'দূর হইতে শুনা যায় মহেশের শিঙা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা ॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥'

এই সব বর্ণনায় শিবের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধার অণুমাত্র নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, ভারতচন্দ্র শিবকে এইভাবে দেখাইলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ। ভারতচন্দ্রের যুগে শিব সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা এইরূপ ছিল, সুতরাং হর-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়া ভারতচন্দ্র দরিদ্র বাঙালী গৃহস্থ ঘরে দাম্পত্য জীবনের যে-রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাই হর-পার্বতীর উপরেও আরোপ করিয়াছিলেন।

পুরাতন দাম্পত্যজীবনের রূপ বাহিরে কি ছিল তাহা দেখানো হইল। এইবার দাম্পত্যজীবনের অন্তরঙ্গ ব্যাপারের সন্ধান লইতে হইবে। ইহার বিবরণ ভারতচন্দ্র কালিদাসের মত হর-পার্বতীর মধ্যে দেখান নাই, দেখাইলেন বাঙালী জমিদার বাড়ীতে। ভবানন্দ মজুমদার দিল্লী হইতে রাজা হইয়া আসিবার পর তাঁহার দুই পত্নী চন্দ্রমুখী (বড়) ও পদ্মমুখী (ছোট) যেমন নিজেরা ঝগড়া আরম্ভ করিলেন, তেমনই স্বামীর জন্যও এক সমস্যার সৃষ্টি করিলেন। জমিদার বা রাজা-রাজড়ার ঘরে যেমন হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও ঝগড়ার জোগানদার দাসীরা। দুই দাসীই নিজ নিজ ঠাকুরানীকে মন্ত্রণা দিতেছে। বড় ঠাকুরানী অপেক্ষাকৃত বয়স্কা, তিন পুত্রের মাতা; ছোটজন সন্তানহীনা যুবতী।

সুতরাং বড়র দাসী সাধী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল।

'সাধীর বচনগুলি চন্দ্রমুখী মনে গুণি
বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মন করে ধড়ফড় বেশ কৈলা দড়বড়
পতি ভুলাইতে মন দিলা॥
খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণশাড়ী
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা॥
পড়া তৈল মুখে মাখি, পড়া ফুল চুলে রাখি
নানা মন্ত্রে সিন্দুর পরিলা॥'

কিন্তু একটা সমস্যার সমাধান করিতে মুস্কিল বাধিল।—

'গলিত হয়েছে কুচ কেমনে সে হবে উচ
ভাবিয়া উপায় নাহি পান।'

যাহা হউক, রাত্রি করিয়া ভবানন্দ যখন অন্তঃপুরে, প্রবেশ করিতে গেলেন, তখন বড়জন দেউড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে প্রণাম করিয়া সমস্ত সংবাদ দিয়া বলিলেন,—

'এই ঘরে আসি বসি খাউন পান জল।'

ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া ছোট জনের দাসী মাধী দৌড়িয়া গিয়া তাহার ঠাকুরানীকে বলিল,—

'কি কর চল তাড়াতাড়ি। গো ছোট মা।
তোমার নাম কয়ে ঠাকুরে আনু লয়ে
বড় মা করে কাড়াকাড়ি॥
সে যদি আগে লৈল সেই ত রানী হইল
তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।'

পদ্মমুখীও তখন দেউড়ীতে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভবানন্দ চোখ ঠারিয়া ইসারা করিলেন। তিনিও ইসারার মর্ম বুঝিয়া মুখে উদারতা দেখাইলেন, বলিলেন—

'বড়দিদি দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান।
উচিত যে উঁহারি মন্দিরে আগে যান॥'

ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া—

'চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড়॥
তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে।
আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে॥
দড়বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি॥'—ইত্যাদি।

মজুন্দার কৌশলে বড়কে আগরাত ও ছোটকে শেষরাত ভাগ করিয়া দিলেন। কিন্তু বড়র ঘরেও ভয় করিতে লাগিলেন।—

'রাত্রিশেষে গেলে তথা ক্রোধে না কহিবে কথা
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
খেদাইবে কটু কয়ে কলহান্তরিতা হয়ে
কান্দিবেক হয়ে বড় দুখী॥'

শেষকালে ছোটর ঘরে যখন গেলেন তখন—'কথায় না সহে ভর, দুহে কামে জর জর'—ইহার পর আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী পূর্ববর্তী যুগের, সুতরাং তাঁহার বিবরণ ভারতচন্দ্রের কাহিনী অপেক্ষা গ্রাম্য। তিনি দুই সতীন, লহনা ও খুল্লনার আচরণ এইভাবে বর্ণনা করিলেন।

'মল্ল যেন কোন্দলে যুঝে দু-সতীন।
বিদেশে সদাগর পাইয়া শূন্যঘর,
লাজ ভয় হৈল হীন॥
বড় বহুড়ী প্রবলা, ছোটজন একলা
কলহ হৈল সেই দিন।
চক্ষে চক্ষে চাহিয়া, রোষযুতা হইয়া,
খুল্লনা হৈল বলাধীন॥
... ...
চট চট চাপড় ছিণ্ডিলেক কাপড়
বেগে মারিল কঙ্কণ।
দোঁহেতে করিল ধুম, কিলের গুম গুম
মেঘ যেন শিলা বরিষণ॥'

শেষে লহনারই জয় হইল, খুল্লনাকে ছাগল চরাইতে নিযুক্ত করা হইল।

কিন্তু ধনপতি ফিরিয়া আসিলে দুই সতীনের আড়াআড়ি চাতুরীর যুদ্ধে উন্নীত হইল। খুল্লনা তরুণী, লহনা প্রায় বিগতযৌবনা (তখনকার ধারণাতে), সুতরাং তিনি কনিষ্ঠাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন,

'তুমি অতি ক্ষীণবালা, নাহি জান রতিকলা,
না যাইহ সাধুর নিকটে।
রাহুর ভুকের বেলা, যেন নব শশিকলা,
পড়িবি লো বিষম সঙ্কটে॥
রতিরঙ্গে সদাগর, চিরদিনে আইলা ঘর।
জর জর মনমথ শরে।'
... ...
'আকুল দেখিয়া জায়া, সাধু নাহি করে দয়া,
বিনয় বচন নাহি শুনে।
সাধুর গজের লীলা, নলিনী যেমন বালা,
মূরছিত তুহু কামবাণে॥'

কিন্তু লহনা যতই বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, খুল্লনা ততই হাসিতে

লাগিলেন। অবশেষে তিনি উত্তর দিলেন।

আজকাল বাঙালী মেয়েরা যুক্তি, উক্তি ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেন আমেরিকান ফিল্‌ম্‌ হইতে, খুল্লনা সে-যুগের মেয়ের মত সংগ্রহ করিলেন রামায়ণ-মহাভারত হইতে, ও সহাস্যে বলিলেন,—

'শুন গো প্রাণের দিদি লহনা বহিনী।
রমণে রমণী মরে কোথাও না শুনি॥
স্বর্গে দেখ দেবরাজ মহাবলবান্‌।
কেমনে কামিনী শচী করে রতিদান॥
আরো দেখ রঘুনাথ মহাশক্তি ধরে।
কেমনে কামিনী সীতা তার ঘর করে॥
দশমুণ্ড বিশ বাহু লঙ্কা-অধিকারী।
কেমনে শৃঙ্গার তার সহে মন্দোদরী॥
ভীম সম বলবান্‌ নাহি ত্রিভুবনে।
কেন না দ্রৌপদী মরে তাহার রমণে॥'

এইরূপ আরও পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাইতে উদ্যত হইলে লহনা খুল্লনার কি দশা হইবে তাহাও বলিলেন,

'যেন ধরে মর্কট মক্ষিকা।
বিড়ালেতে যেমন মূষিকা॥
চিলে যেন ছুএ্যা লয় মীন।
আমি তোর সুহৃদ সতীন॥
... ...
লাজ ভয় নাহি তোর ঠোঁট।
আমি কেন বলি খায়্যা মাটি॥
ছিঃ ছিঃ! ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ তোরে।
মম আগে যাস তুই ঘরে॥'

কিন্তু কোনও ফল হইল না। কেহ যদি বলেন যে, ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম এইসব বর্ণনায় তাঁহাদের সমকালীন বাঙালী জীবনের চিত্র আঁকেন নাই, তবে তাঁহার বিদ্যা বা বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিব না।

কিন্তু ইংরেজ শাসনের যুগে নূতন শিক্ষার ফলে বাঙালীর দাম্পত্যজীবন যে একেবারে বদলাইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যে-বাঙালীর ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি,* তিনি লিখিলেন,—

'The domestic virtues are now better cultivated in India than they used to be before. Young Bengal is a more constant husband than the old Hindu was.'

বর্তমানকালে যদি কেউ বলেন যে, পত্নীর প্রতি অবিশ্বাসী না হওয়া

---

* ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য

বাঙালীকে কোনও ইংরেজের কাছ হইতে শিখিতে হইবে, তিনি সত্যই হাস্যাস্পদ হইবেন। বরঞ্চ এ-কথাটাই সত্য যে, পত্নীর প্রতি অবিশ্বাসী হওয়ার প্রবৃত্তিই পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টান্তে প্রায় রেওয়াজ হইবার দিকে চলিয়াছে। কিন্তু যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন পত্নীপ্রেম ইংরেজ সমাজে প্রায় অটুট ছিল। ইংরেজী পড়িয়া বাঙালীও নিজের বিবাহিত জীবনকে সেই আদর্শে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিল।

ইহার জন্য পত্নী সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে চিরপ্রচলিত আচরণ ও ধারণা যাহা ছিল, তাহার প্রায় সবই নব্য বাঙালীকে ছাড়িতে হইয়াছিল। ধারণার উদাহরণ হিসাবে একটি প্রবাদের উল্লেখ করিব। সেটি এই 'ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে।' ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। আচরণটি—এই মৃতা পত্নীকে চিতানলে দগ্ধ হইতে দেখিবার সময়েই স্বামীকে একজন আত্মীয় বা বন্ধুর বলিতে হয় 'শীঘ্রই আবার বিবাহ কর।' ইহার অতি আধুনিক দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি।

পত্নী সম্বন্ধে নূতন মনোভাব ও পুরাতন মনোভাবের সংঘাতের কথা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে দিতেছি। রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে বৃন্দাবন পিতার কৃপণতার জন্য স্ত্রীর প্রায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হইলে পিতাকে স্ত্রী হত্যাকারী বলিয়া গালি দিল। পিতা বলিল, 'কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা বাদশারা মরে কোন্ দুঃখে? যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশী ধুম করিয়া মরিবে?'

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিলেন, 'বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত তাহা হইলে এ-কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাহার মা, দিদিমা কেহই মরিবার সময়ে ঔষধ খান নাই। এ বাড়ীর এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এদেশে ইংরেজের নূতন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়ে তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক তামাক টানিত।'

ইহার পর বৃন্দাবন যখন রাগে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন গ্রামশুদ্ধ লোক পিতা যজ্ঞনাথের পক্ষ লইল। বলিল, 'সামান্য একটা বউ এর জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব।' আরও বলিল, 'একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না।'

এই গল্পটির তারিখ পৌষ ১২৯৮ সন (ইংরেজী ডিসেম্বর ১৮৯১ অথবা জানুয়ারী ১৮৯২)। ইহার পর ১৮৯৫ সনে রবীন্দ্রনাথ আর একটি গল্প লিখিলেন, সেও পত্নীর চিকিৎসা উপলক্ষ্যে। 'আপদ' গল্পে কিরণের কঠিন পীড়া হওয়াতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গঙ্গার ধারে চন্দননগরে লইয়া

যাওয়া হইল। (তখনও মধুপুর-দেওঘর অকল্পনীয় ছিল।) কিরণের শাশুড়ী বধূকে ভালবাসিতেন, তিনি কোনও আপত্তি করিলেন না। কিন্তু গ্রামবাসী সকলে নিন্দা করিল। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

'যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বায়ু পরিবর্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থূল করিয়া তোলা নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, "ইতিপূর্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন, সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোন দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টলিপি সফল হয় নাই"— তথাপি শরৎ এবং তাহার মা, সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না।'

ইহারও পরে আবার ১৮৯৮ সনে রবীন্দ্রনাথ 'মণিহারা' গল্পে স্কুল-মাষ্টারের মুখে এই উক্তি দিলেন—

'কিন্তু তাঁহাকে [ফণিভূষণকে] একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেব সওদাগরের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরেজী বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত। আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কলেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন কি ব্যামো হইলে অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জনকে ডাকা হইত।'

স্কুল-মাষ্টার এও মন্তব্য করিলেন যে, 'নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া, আধুনিক দাম্পত্য সম্পর্কটাকে এমনই শিথিল করিয়া তুলিয়াছে।'

স্কুল-মাষ্টার এ-স্থলে পুরাতনের মুখপাত্র হইলেও উহা যতটা না আন্তরিক তাহার অপেক্ষা 'সিনিক্যাল' বেশী। নূতন দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে পুরাতন পন্থীদের মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রও জানিতেন। তাই 'বিষবৃক্ষে' তিনি স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার পর শ্রীশচন্দ্রের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিলেন, 'ইহার জন্য আপিসের কাজে এমনই অমনোযোগী হইলেন যে সেবার সাহেবেরা তিসির কাজে বড় লাভ করেন নাই। হৌসের কর্মচারীরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে, সে শ্রীশবাবুরই দোষ। তিনি ঐ সময়টা কাজকর্মে বড় মন দেন নাই, কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন। এ-কথা শ্রীশচন্দ্র একদিন শুনিয়া বলিলেন, "হবেই ত। আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া ছিলাম।" শ্রোতারা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছি! বড় স্ত্রৈণ।"'

এই ধরণের আরও বহু উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কিন্তু যতটুকু করিলাম তাহাই যথেষ্ট মনে করি। এই সব কথা যে সে-যুগের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে যথার্থ সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। সমকালীন

জীবন লইয়া গল্প উপন্যাস লিখিলে তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহারের সত্য বিবরণ না দিলে কেহই সে-সব কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য মনে করিত না।

তবে সত্যকার জীবন হইতে এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। যাঁহারা বাঙালীর নবযুগ ও নবজীবনের প্রবর্তনকর্তা তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে পুরাপুরি সংবাদ নাই। রামমোহনের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী জানা আছে বটে, তবে সেটা প্রকৃত দাম্পত্য জীবন না থাকারই প্রমাণ। তাঁহার বিবাহের তারিখ ও সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ আছে। তবে এখন যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত তাহার উল্লেখ করিতেছি। ইংরেজী ১৮১১ সনে সতেরো বৎসর বয়সে নয় বৎসর বয়স্কা দিগম্বরী দেবীর সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হয়। দিগম্বরী এরূপ সুন্দরী ছিলেন যে তাঁহাকে সকলে মর্ত্যে অবতীর্ণা লক্ষ্মী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু তিনি এমনই ধর্মনিষ্ঠা ছিলেন যে, একমাত্র সন্তানজন্মের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহাকে স্বামী সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলার মতই উদাসীনা বলা যাইত। তিনি অল্প বয়স হইতেই সারাদিন জপতপ পূজা লইয়াই থাকিতেন, এবং রাত্রিতে ম্লেচ্ছাচারী স্বামীর শয্যাভাগিনী হইয়া নিজেকে অশুচি মনে করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুরোহিত ডাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। একটি কন্যা হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু হইবার পর ১৮১৭ সনে তাঁহার প্রথম পুত্র দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তখন তাঁহার বয়স পনেরো বৎসর। ইহার পর তাঁহার আরও চারিটি পুত্র হয়। উহাদের মধ্যে দুইটি শিশুকালেই মারা যায়। ১৮২৯ সনে শেষপুত্র হইবার পর দিগম্বরী সাতাশ বৎসর বয়স হইতে আর স্বামীসহবাস করেন নাই। ১৮৩৯ সনে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথও অন্তঃপুর হইতে নির্বাসিত হইবার পর আর পুরাতন বাড়ীতে বাস করেন নাই। এখন যেটি ৫নং জোড়াসাঁকো (যাহাতে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ বাস করিতেন) সেই বাড়ী তৈরী করাইয়া নিজের রুচি অনুয়ায়ী থাকিতেন। সেই বাড়ী তিনি দ্বিতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথকে দিয়া যান।

আশ্চর্যের কথা এই—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দাম্পত্য-জীবনও একেবারেই অজ্ঞাত। এইটুকু মাত্র জানা যে, ১৮৩৪ সনে সতেরো বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং ১৮৪১ সনে প্রথম পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মের পর তাঁহার আরও চোদ্দটি (সর্বশুদ্ধ ১৫টি) সন্তান হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চতুর্দশ সন্তান। ১৮৭৫ সনে দেবেন্দ্রনাথের পত্নী সারদাদেবীর মৃত্যু হয়। ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ আর বিবাহ করেন নাই।

নবযুগের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে ইতিহাস সম্মত ধারণা করা যায় প্রথমত বঙ্কিমচন্দ্র হইতে। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না।'

কিন্তু এই পত্নী, রাজলক্ষ্মী দেবী, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ বাল্য বয়সে হইয়াছিল। সেই বালিকা পত্নী ১৮৫৯ সনে বঙ্কিমের যখন একুশ বৎসর বয়স তখন মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বিবাহ দুই যুগের—প্রথম বিবাহ সেকালের, দ্বিতীয় বিবাহ একালের। বলিতে পারা যায় বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙালী জীবনে নূতন বিবাহ ও নূতন দাম্পত্যের স্রষ্টা। এ-কথা বলা হয় যে, সূর্যমুখীর চরিত্র রাজলক্ষ্মী দেবীর অনুকরণে চিত্রিত। বঙ্কিমের পর কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙ্গালীর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা আছে। তবে তাহাও পুরাপুরি বর্ণনা দিবার মত নয়। উহার জন্য সাহিত্যের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

এই পর্যন্ত বাঙালী ভদ্রঘরের বিবাহে স্নেহের কথাই বলিলাম. প্রেমের কথা নয়। স্নেহ যে সেকালের দাম্পত্য জীবনে ছিল না তাহা নয়। কিন্তু পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার পর নাতি-নাতনী জন্মিলে পত্নীর স্নেহ স্বামীকে বর্জন করিয়া তাহাদের উপর যাইত। ১৯৫০-৫৫ কাল হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিই। এক অতি উচ্চপদস্থ বাঙালী রাজকার্য হইতে অবসর লইয়া একা দিল্লীতে বাস করিতেছিলেন। আমার দাদার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে দাদা জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার সকলেই কলকাতায় আছেন, তবে আপনি কেন এই ভাবে হোটেলে আছেন?' উচ্চ-পদস্থ বাঙালী ইংরেজী ভাষায় উত্তর দিলেন, 'Does she care for me ? She has her grandchildren.'

ইহা ছাড়া প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইলে সমৃদ্ধ বাঙালী ঘরেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঘোর বিদ্বেষ দেখিয়াছি। তাহার কারণ অনেক সময়ে থাকিত, কিন্তু কখনও কখনও কাল্পনিক হইত। ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত আমার অভিজ্ঞতা হইতে দিতে পারি। সুতরাং পত্নীস্নেহ বাঙালী সমাজে প্রবর্তিত হইলেও একেবারে অবিচল ছিল, তাহা বলিতে পারি না। এখন নূতন প্রেমের কথা বলিব।

প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে প্রেমের স্থান

এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধেই আপত্তি উঠিতে পারে যে, এ-সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা সন্দেশে ছানা ও চিনি আছে কিনা, সেই প্রশ্ন তোলারই মত। তবু প্রশ্ন কেন উঠিতে পারে তাহার কারণ দেখাইতেছি। যেমন ইতিপূর্বে সেকালের বাঙালীর একটা প্রশ্নের কথা বলিয়াছি যে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিত—'বায়ু পরিবর্তনের জন্য যেখানে স্ত্রীকে লইয়া যাওয়া হইতেছে সেখানে কি মানুষ অমর?' তেমনই এই প্রসঙ্গেও আমাকে হয়ত অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ইংরেজী সাহিত্য পড়িবার আগে কি বাঙালীর দাম্পত্যজীবনে প্রেম ছিল না?' অবশ্য ছিল, তবে প্রেমের রূপ যে কেবলমাত্র বিভিন্ন হইতে পারে তাহাই নয়, বিচিত্রও হইতে পারে। সেজন্যই প্রাচীন হিন্দুরা বলিত, 'কামস্য বামা গতি।' প্রাচীন ভারতবর্ষে হিন্দুর জীবনে প্রেমের রূপ কি ধরণের ছিল, তাহার পরিচয় সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য ও বিশেষ করিয়া 'শকুন্তলা' নাটক ও 'কাদম্বরী' উপন্যাস হইতে

পাওয়া যায়। ইহার পর যখন প্রেমের মাহাত্ম্য কৃষ্ণ ও রাধার বেনামীতে প্রচার করিতে হইল, তখন প্রেম কি রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার বর্ণনা সংস্কৃতে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দে, এবং বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব কাব্য ও বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস বা পরবর্তী অপর চণ্ডীদাস হইতে পাওয়া যাইবে, মৈথিলী ভাষায় বিদ্যাপতি হইতেও পাওয়া যাইবে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে প্রেমের বর্ণনায় স্পষ্টতা আছে, কিন্তু কাব্য নাই; গীতগোবিন্দে স্পষ্টতা ও কাব্য দুইই আছে। তেমনই এক চণ্ডীদাসে গ্রাম্যতা আছে, কাব্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যেমন ফল্গু নদী হইতে জল বাহির করিত সেই ভাবে। পরের চণ্ডীদাসে উহা প্রকট, নদীর স্রোতের জলের মত।

কিন্তু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বর্ণিত প্রেমের গন্ধ ও প্রাগ্‌ ব্রিটিশ যুগের বাঙালীর মধ্যে প্রচলিত বিবাহিত জীবনে ছিল না। বাংলা কাব্য হইতে উহার কিছু পরিচয় দিয়াছি। এখন লৌকিক আচার হইতে দিব। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লী জীবনের বর্ণনা বাস্তব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার একটি গল্প হইতে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করিয়া সেকেলে বাঙালী বধূদের মধ্যেও প্রেমের কি ধারণা ছিল তাহার পরিচয় দিব। একটি বাঙালী বধূ আধুনিকা অবিবাহিতা ননদের প্রেম সম্বন্ধে বাচালতা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'পাকামি শুনলে গা জ্বালা করে। আমি তিন ছেলের মা—উনি আজ আমাকে প্রেম শেখাতে এলেন।'

তখন তিন ছেলের মা হওয়াকেই প্রেমের হদ্দমদ্দ মনে করা হইত। তিন ছেলের মা হইয়া প্রেমের অভিজ্ঞতা কিরূপ হইত তাহার পরিচয় আমার বাল্যকালের একটি সত্য ঘটনা হইতে দিব। ময়মনসিংহ জেলায় আমার পৈতৃক গ্রামের কাছেই আর একটি গ্রামে একজন যুবা বয়সী গৃহস্বামী বাস করিতেন। পিতামাতা না থাকায় তিনি ও তাঁহার বছর বাইশের স্ত্রীই সংসারের কর্তা ও কর্ত্রী। একদিন ভিতর বাড়ীর উঠানে নিম্নজাতীয় মজুরেরা জ্বালানি কাঠের ভারা নামাইয়া বলিল, 'ঠাকরুণ, আঁটিগুলো রান্নাঘরে তুলে দিতে কাউকে বলুন।' ঠাকরুণ দেখিলেন একটি লোক খালি গা কিন্তু খড়ম পায়ে অন্তঃপুরে ঢুকিতেছে। তিনি আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, 'ঐ লোকটাকে তুলে দিতে বল।' মজুরেরা জিব কাটিয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল, 'কি বলেন, ঠাকরুণ, কর্তা যে।' তখন গৃহিনীর তিন ছেলে, কিন্তু স্বামীর মুখ চেনার সুযোগ হয় নাই। তিন ছেলের মা হইবার জন্য যতটুকু প্রেমের প্রয়োজন হয় তাহা অবশ্য পাইয়াছিলেন।

এইরূপ একটা ঘটনা ঘটা কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা বলি। প্রথমত, তখনও গোঁড়া পরিবারে স্বামীস্ত্রীর সাক্ষাৎ দিনের বেলায় হইত না। স্ত্রী ঘরের কাজ শেষ করিয়া রাত্রি নয়টা দশটা নাগাদ গিয়া শুইয়া থাকিতেন। মশার জন্য মশারী থাকিত, তাহা ভারী হইত—'নেটে'র হইত না। বাহিরে পিলসুজের উপর প্রদীপ টিমটিম করিয়া জ্বলিত। কাছে একটা লম্বা কঞ্চে থাকিত। স্বামী দশটার পর বাহির বাটি হইতে আসিতেন ও শয়নঘরে ঢুকিয়া



লিলিফুল পৃষ্ঠা ৮২ দ্রষ্টব্য



অক্সফোর্ডে সস্ত্রীক লেখক ঘরোয়া পরিবেশে

বিছানার কাছে গিয়া সেই কণ্ঠে দিয়া দীপ নিবাইয়া স্বস্থান অধিকার করিতেন। সুতরাং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান যেটি, অর্থাৎ চক্ষু, সেটা দিয়া স্ত্রীকে উপলব্ধি করার সুযোগ হইত না, অন্য চারটি অর্থাৎ কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্ মাত্র দিয়া হইত। স্ত্রীরও তদ্রূপ। এক মাত্র ত্বাচ প্রত্যক্ষ ও সম্ভব ছিল।

এই অসুবিধা ছাড়া একটা বিশেষ ধরণের স্ত্রী-আচারের জন্যও আমাদের অঞ্চলে ঘরে আলো রাখা হইত না। তখন সেখানে সম্পন্ন গৃহস্থেরও পাকা বাড়ী ছিল না। আটচালাগুলির বেড়া হইত দরমার, তাহাতে ফাঁক বা ছিদ্র থাকিত। রাত্রিতে কৌতূহলী জায়েরা ও ননদেরা ঐ সব জায়গায় চক্ষু রাখিয়া দাম্পত্য প্রেম কিরূপ তাহা দেখিতে চাহিত। সুতরাং বুদ্ধিমান স্বামীরা শয্যায় প্রবেশ করিবার আগেই প্রদীপ নিবাইত, পত্নীকে লজ্জা নিবারণের জন্য মুষ্টিচূর্ণ ছুঁড়িয়া নিবাইতে হইত না।

এই তো গেল সেকালের দাম্পত্য জীবনে প্রেমের কথা। এখন নূতন দাম্পত্য প্রেমের কথা বলি। উহা যে কেবলমাত্র বিবাহের পূর্বে কল্পিত পূর্বরাগের মধ্যেই দেখা দিল তাহাই নয়, বিবাহের পরেও ছেলে হইবার বয়স হইলেও ছেলে হওয়া স্থগিত রাখিয়া* প্রেমকে বিবাহিত জীবনে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছাতেও দেখা দিল। এই ব্যাপারটার আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করিব। আপাততঃ নূতন প্রেমের পথে নূতন একটা বাধার কথা বলিব।

বাঙালী জীবনে ইউরোপ হইতে আনা 'রোমান্টিক' প্রেম সেই যুগেই বাংলাদেশে বিলাত হইতে আনা নূতন গোলাপের মত ফুটিতে লাগিল। কিন্তু তাহা বিনা বাধায় নয়। বাধাটাও একটা বিদেশীয় প্রভাব হইতেই সৃষ্ট হইল। উহা ব্যাখ্যা করিবার আগে বাধাটার রূপ কি ছিল তাহার পরিচয় দিব। উহা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস হইতে।

পরেশবাবুর বাড়ীতে যাইবার জন্য বিনয়কে অত্যন্ত উৎসুক দেখিয়া গোরা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,

> "মনে হচ্ছে না যে, শ্রীহস্তে যদি পরিবেশন করে তবে ম্লেচ্ছের অন্নই দেবতার ভোগ?"

রবীন্দ্রনাথ লিখিতে লাগিলেন,

> বিনয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কহিল, "গোরা, বস্, এইবার থামো।"
>
> গোরা। "কেন, এর মধ্যে তো আবরুর কোনো কথা নেই। শ্রীহস্ত তো অসূর্যম্পশ্য নয়। পুরুষমানুষের সঙ্গে যার শেক্‌হ্যান্ড চলে সেই পবিত্র কর-পল্লবের উল্লেখটি পর্যন্ত যখন তোমার সহ্য হলো না, তদা নাশংসে মরণায় সঞ্জয়!"
>
> বিনয়। "দেখো, গোরা, আমি স্ত্রীজাতিকে ভক্তি করে থাকি—আমাদের শাস্ত্রেও……"

---

* মনে রাখিতে হইবে তখনকার দিনে ছেলে হওয়া স্থগিত রাখার কোনও কৃত্রিম উপায় ছিল না।

গোরা। "স্ত্রীজাতিকে যে ভাবে ভক্তি করছ তার জন্যে শাস্ত্রের দোহাই পেড়ো না। ওকে ভক্তি বলে না, যা বলে তা যদি মুখে আনি তো মারতে আসবে।"

বিনয়। "এ তুমি গায়ের জোরে বলছ।"

গোরা। "শাস্ত্রে মেয়েদের বলেন—পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। তাঁরা পূজার্হা, কেননা গৃহকে দীপ্তি দেন। পুরুষমানুষের হৃদয়কে দীপ্ত করে তোলেন বলে বিলিতি বিধানে তাঁদের যে মান দেওয়া হয় তাকে পূজা না বললেই ভালো হয়।"

বিনয়। "কোনো কোনো স্থলে বিকৃতি দেখা যায় বলে কি একটা বড়ো ভাবের উপর ওরকম কটাক্ষ করা উচিত!"

গোরা অধীর হইয়া কহিল, "বিনু, এখন যখন তোমার বিচার করবার বুদ্ধি গেছে তখন আমার কথাটা মেনেই নাও। আমি বলছি বিলিতি শাস্ত্রে স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধে যে-সমস্ত অত্যুক্তি আছে তার ভিতরকার কথাটা হচ্ছে বাসনা। স্ত্রীজাতিকে পুজো করবার জায়গা হল মা'র ঘর, সতীলক্ষ্মী গৃহিণীর আসন সেখান থেকে সরিয়ে এনে তাঁদের যে স্তব করা হয়, তার মধ্যে অপমান লুকিয়ে আছে। পতঙ্গের মতো তোমার মনটা যে কারণে পরেশবাবুর বাড়ির চারিদিকে ঘুরছে, ইংরাজিতে তাকে বলে থাকে 'লাভ'—কিন্তু ইংরেজের নকল ঐ 'লাভ' ব্যাপারটাকেই সংসারের মধ্যে একটা চরম পুরুষার্থ বলে উপাসনা করতে হবে, এমন বাঁদরামি যেন তোমাকে না পেয়ে বসে!"

'গোরা' উপন্যাসে যে-যুগের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তখন ইংরেজী শিক্ষিত নব্যহিন্দুপন্থী বাঙালী ও তেমনি ইংরেজী-শিক্ষিত ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মপন্থী উদার বাঙালীর মধ্যে নারী সম্বন্ধে এই ধরণের তর্ক চলিত। তাহারা মনে করিত এই তর্ক ভারতীয় ধারা ও পাশ্চাত্ত্য ধারার মধ্যে পার্থক্য লইয়া। এখনও অনেকে মনে করিতে পারেন যে, গোরা যাহা বলিল তাহা হিন্দু 'থীসিস', ও বিনয় যাহার পক্ষে তাহা আমাদের জীবনে ইউরোপীয় 'অ্যান্টিথীসিস'—হয়ত বা দুইটির সমন্বয়, অর্থাৎ মিলিবার পর 'সিনথেসিস'-এ পৌঁছানো যাইত। কিন্তু উহা মোটেই নয়। প্রথমত, বিনয়ের মতই 'থীসিস', গোরার মত 'অ্যান্টিথীসিস'। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে নূতন ধারণা ইংরেজী শিক্ষার ফলে আসিবার পর নব্য বাঙালী জাতীয়তাবোধ হইতে তাহার বিরুদ্ধে একটা কল্পিত হিন্দু ধারণা খাড়া করিল। গোরা এই বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যে 'থিওরী' খাড়া করিল, তাহা প্রাচীন কোন হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করা যায় না। 'পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ' বচনটা মনুসংহিতা হইতে, উহার অর্থ অন্যরূপ। তাহা ছাড়া মনুসংহিতাতেই স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে যে-কথা আছে, তাহা উদ্ধৃত করিলে আজকালকার সাহেব-মারা বাঙালীরা কানে হাত দিবেন, ও মেম-মারা বাঙালিনীরা ক্ষেপিয়া যাইবেন। আমার মাতাই আমার কাছ হইতে মনুসংহিতার প্রকৃত ব্যাখ্যা শুনিলে রাগ করিতেন। আমি তখন বি-এ পড়ি, কুড়ির নীচে

বয়স। ঐ বয়সে স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখানোর একটা ঢং হয়। আমি উহার বশে স্ত্রী-চরিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইলে মা মনুসংহিতা হইতে 'যত্র নার্য্যঃ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' এই বচন আওড়াইয়া আমার মুখ বন্ধ করিতে চাহিতেন। আমি তাঁহাকে ইহা বুঝাইতাম—'মা! জান-না তো মনু কেন এই কথা বলেছিলেন। তাঁর মত—বাড়ীর মেয়েদের পিতা, স্বামী, এমন কি ভ্রাতা পর্যন্ত সর্বদাই বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে খুশী রাখবে। এটাই হলো পূজো। এই পূজো না করলে, তারা এমনই খিটমিটি করবে যে, গৃহদেবতা বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবেন।' তখন মা আমাকে হাতের কাছে যাহা পাইতেন, সে পাখাই হউক কিংবা হাতাই হউক, লইয়া তাড়া করিতেন।

গোরার কথা যদি সত্য হইত তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্রেরও বহু বিধান চাপা দিতে হইত, সমস্ত সংস্কৃত কাব্য ও কাম-শাস্ত্রের অস্তিত্বও ভুলিয়া যাইতে হইত। সংস্কৃত কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল কামশাস্ত্রের কথাই বলিব। উহাতে যে কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমের কথাই আছে তাহা নয়, গার্হস্থ্যাশ্রমে পত্নীর আচরণ সম্বন্ধেও বহু বিধান আছে। এই বইটির 'ভার্যাধিকরণ' অংশে উহার পরিচয় আছে। আমি শুধু দুইটি উপদেশের উল্লেখ করিতেছি। একটিতে উপদেশ আছে—পত্নী কখনও স্বামীর সম্মুখে গাত্র মার্জনা করিবে না, কারণ ঐ অবস্থা দেখিলে স্বামীর 'বৈরাগ্য' হইতে পারে। আরেকটি কথা এই যে, স্বামীর কাছে যাইতে হইলে—এ-স্থলে স্বামীকে 'নায়ক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—পত্নী 'বহুভূষণ' গ্রহণ করিয়া 'বিবিধকুসুমানুলেপন' ও বিবিধ অঙ্গরাগ করিয়া সমুজ্জ্বল বাস পরিবে, এমন কি 'প্রতনু-শ্লক্ষ্ণ-অল্প-দুকূলা' হইয়া (অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও মসৃণ রেশমী বস্ত্র পরিয়া) যাইবে। আমি সমাস ভাঙ্গিয়া উদ্ধৃত করিলাম। সুতরাং বুঝিতে হইবে হিন্দুগৃহে নারীর স্থান সম্বন্ধে নূতন ধারণা ইংরেজ শাসনের যুগে বাঙালীর ইউরোপ-লব্ধ জাতীয়তা বোধ হইতে আসিয়াছে। উহা নব্য বাঙালীর একেবারে স্বকপোল কল্পিত ধারণা।

গোরা এই ধারণার বশেই প্রেমকে নিজের জীবন হইতে চিরতরে বিসর্জন দিতে গেল। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দিনে তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল—"অন্যায় রহিয়া গেল।" 'এ অন্যায় নিয়মের ত্রুটি নহে, মন্ত্রের ভ্রম নহে, শাস্ত্রের বিরুদ্ধতা নহে, এ অন্যায় প্রকৃতির ভিতর ঘটিয়াছে।' গোরা এই অন্যায়ের কাছে নিজেকে বলি দিত। কিন্তু একটা অভাবনীয় ঘটনাচক্রে বাঁচিয়া গেল।

আশ্চর্যের কথা এই যে, এ-ধরণের বিরোধ, অর্থাৎ ধর্মবোধ ও প্রেমের মধ্যে বিরোধ যেন ব্রাহ্মদের মধ্যেও দেখা দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এটা ললিতার বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের আপত্তির ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন। হারাণবাবু ললিতাকে বলিলেন—

> 'আসক্তির ছিদ্র দিয়ে দুর্বলতা যে মানুষকে কি-রকম দুর্নিবার ভাবে আক্রমণ করে তা অনেক দেখেছি এবং মানুষের দুর্বলতাকে কি-রকম করে ক্ষমা করতে হয় তাও আমি জানি, কিন্তু যে দুর্বলতা কেবল নিজের জীবনকে নয়, শত সহস্র লোকের জীবনের আশ্রয়কে একেবারে

ভিত্তিতে গিয়ে আঘাত করে, তুমিই বলো, ললিতা তাকে কি এক মুহূর্তের জন্য ক্ষমা করা যায়? তাকে ক্ষমা করবার অধিকার কি ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন?'

'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯১০ সনে, শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' প্রকাশিত হয় ১৯১৮। শরৎবাবু নিশ্চয়ই 'গোরা'তে এই জায়গাটা স্মরণ করিয়া বিলাসের মুখে বিজয়ার প্রতি এই উক্তি দিয়াছিলেন—

'আমি জানি আমাকে তুমি ভালবাস না। কিন্তু সাধারণ লোকের মত আমিও যদি সেই ভালবাসাকে ঊর্ধ্বে স্থান দিতাম, তাহলে আজ মুক্তকণ্ঠে বলে যেতাম—বিজয়া, তুমি যাকে ভালবেসেচ, তাকেই বরণ কর! আমার মধ্যে সে শক্তি, সে উদারতা, সে ত্যাগ আছে!'……

'কিন্তু, একটা সকাম রূপ-তৃষ্ণা, যাকে ভালবাসা বলে মানুষ ভুল করে সেই কি ব্রাহ্ম-কুমার-কুমারীর চরম লক্ষ্য? না, তা কিছুতেই নয়, কিছুতেই হতে পারে না। এই বিরাট উদ্দেশ্য সত্য! মুক্তি! পর-ব্রহ্মপদে যুগ্ম আত্মার একান্ত আত্মসমর্পণ। আমি বলচি তোমাকে, একদিন আমার কাছে এ সত্য তুমি বুঝবেই বুঝবে।'

বিজয়া অন্য কারণে আত্মবলিদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার প্রতিবাদ করিল না। তবে সেও গোরার মত বাহ্যিক অবস্থাচক্রে বাঁচিয়া গেল।

বাঙালী জীবনে ইউরোপীয় রোমান্টিক প্রেমের পথে বাধা যে কেবল সেই ইউরোপ হইতেই আমদানী করা দেশপ্রেম ও ধর্মবোধ হইতেই আসিল তাহা নয়, ইংরেজ সমাজ হইতে আমদানী করা একটা নৈতিক ধারা হইতেও আসিল। উহা ইংরেজের 'পিউরিট্যানিজ্‌ম্‌', উহার প্রভাব বাঙালীর উপর পড়িবার পর বাঙালীর মধ্যে একটা নৈতিক বায়ু দেখা দিল। সেই শুচিবাই-এর বশে বাঙালী নূতন প্রেমকে নিন্দা করিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া বাঙালী 'পিউরিট্যান'রা নূতন প্রেমের প্রচারক ঔপন্যাসিকদের উপর ঝাল ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। উহার একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কিন্তু দৃষ্টান্তটি দিবার আগে উহার পূর্ব-ইতিহাসও দিবার প্রয়োজন আছে, কারণ উহা একটি প্রচলিত ধারা হইতেই উদ্ভূত। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জীবনে নূতন 'রোমান্টিক' প্রেমের প্রবর্তক, উহার বিরোধিতাও তাঁহার সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। এমন কি তাঁহার মুখের উপরও তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে বাঙালী লেখক পর্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিত না। নবীনচন্দ্র সেন ১৮৯৩ সনে বঙ্কিমকে বলেন যে, প্রেমের অবাধ প্রচার করিয়া তিনি বাঙালী সমাজের অহিত করিয়াছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই ধরনের বিরোধিতার কথা এমন করিয়াই জানিতেন যে, তাঁহার একটি গল্পে এই ব্যাপার লইয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহাতে এক রায়বাহাদুরকে বঙ্কিমের বাল্যবন্ধু বানাইয়া তাঁহার মুখে এই উক্তি দিয়াছিলেন—

'বঙ্কিমকে বললাম, ওহে তোমার যে রকম নাম হয়েছে, তুমি এখন ঐ সব লভ আর লড়াই ছেড়ে, খানকতক উপন্যাস লেখ যাতে

দেশের উপকার হয়। আমার কথা ত কেউ শোনে না, তোমার কথা শুনবে। এই যে বরপণ প্রথাটি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, ক্রমে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বরপণ প্রথায় দোষ দেখিয়ে চুটিয়ে একখানা নভেল লেখ দেখি। আর একখানা লেখ, যা পড়ে বাঙালীর বিলাসিতা—বিশেষ চা খাওয়াটা—একটু কমে। একখানা লেখ যৌথ কারবার সম্বন্ধে……'

রায়বাহাদুর বলিলেন, 'তা নয় খালি লভ আর লড়াই।' বঙ্কিমবাবু এই বক্তৃতা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, তাহাতে রায়বাহাদুর রাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস সম্বন্ধে গোঁড়া হিন্দুদের আপত্তির কথা রবীন্দ্রনাথও জানিতেন, তাই তিনি লিখিয়াছিলেন, 'যেদিন হৈমবতীর বালিশের নিচে হইতে "কৃষ্ণকান্তের উইল" বাহির হয়, সেদিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হয়।' ব্রাহ্মসমাজেও এই শুচিবাই কম প্রবল ছিল না। প্রভাতকুমারের গল্পের এক নায়ক প্রচণ্ড গোঁড়া ব্রাহ্ম সন্তোষকে ক্ষেপাইবার জন্য বলিল, 'গিলবার্ট পার্কারের প্রায় সমস্ত উপন্যাসই আমি পড়েছি। ওখানা কোন্ উপন্যাস?' সন্তোষবাবু অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া বলিলেন, "উপন্যাস! 'উপন্যাস হবে কেন? এ থিওডোর পার্কারের 'টেন সার্মন্স'—ধর্মগ্রন্থ।'

এমন কি শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাস-বিরোধী উক্তি তাঁহার "পথ নির্দেশ" গল্পে হেমনলিনীর মাতা সুলোচনার মুখে দিয়াছিলেন। হেম তাহার সুবাদে ভাই গুণেন্দ্রকে ভালবাসিয়া সম্বন্ধের বিবাহ করিতে প্রবল আপত্তি করিতেছিল। ইহা শুনিয়া সুলোচনা রাগিয়া গুণীকে বলিলেন, 'এইসব দিনরাত বই পড়ার ফল। চব্বিশ ঘণ্টা নভেল, নাটক নিয়ে থাকলেই এইসব দুর্মতি হয়।'

এখন ভূমিকার পর দৃষ্টান্তটি দিই। উহা বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রভাতকুমারের গল্পসমষ্টি 'ষোড়শী' গ্রন্থের সমালোচনা। উহা ১৯০৭ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অক্ষয়চন্দ্র 'ঋষি বঙ্কিমে'র প্রতিভূ—যেমন ওমর ছিলেন হজরত রসুলের খলিফা। প্রভাতকুমারের 'ষোড়শী' সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের আপত্তি গুরুতর—'সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই ষোড়শী রূপসী লইয়া ঘটনা-গ্রন্থন। ষোলটি গল্পের আটটিতে ষোড়শীই "জান্"। বাকী-গুলিতেও অক্ষয়চন্দ্রের আপত্তি যে, নায়িকারা ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, বা সপ্তদশ বর্ষীয়া। এইবার সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিব, কারণ এই লেখাটির মত গোঁড়ামির বশে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমগ্র বাংলা লেখাতেও আর একটি দেখা যায় না। সবটুকু উদ্ধৃত করিতেছি,—

'এখন জিজ্ঞাসা করি, কেন তোমরা কুমারী, সধবা, বিধবা, বহুধবা* ("সচ্চরিত্র" গল্পে গ্রন্থকার তাহাদেরও ছাড়েন নাই) ষোড়শী

* যাহার বহু স্বামী অর্থাৎ বেশ্যা। অক্ষয়বাবু এইস্থলে 'বিধবা' শব্দটার প্রচলিত ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা স্কুলে পড়িবার সময়ে শিখিয়াছিলাম 'বিধবা' কথাটার

লইয়া কারবার করিবে? এখন বুড়ো বয়সের দোষে এইরূপ বিষয় উত্থাপন করিতেছি, তাহা নহে। ভোর "যুবত্ব" সময়ে বঙ্কিমবাবুকে বলিয়াছিলাম, ভিক্টর হুগো যেমন নাইণ্টীথ্রিতে একটি মাতৃচ্ছবি দিয়াছেন, আপনি কেন সেইরূপ কিছু দেন না। সতীশবাবুর মা এক টুকরা কমলমণিকে লইয়া আমাদের ত আশা মিটে না। বঙ্কিমবাবু কার্যত কোন উত্তর দেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরে, তোমরা অনেকেই দেখিতেছি গল্প লিখিতে অগ্রসর: 'যোড়শী'র গ্রন্থকার প্রভাতবাবু (বড় দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাকে চিনি না) বেশ ভাবুক, সামাজিক, অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ, লিখনপটু, তাঁহার লেখার সুন্দর ভঙ্গি আছে; ফল্গুস্রোতের মত বিদ্রুপের গতি আছে। তাঁহার যখন এত গুণ, তখন তিনি কেন কেবল যোড়শী আর যোড়শী করিবেন, কেন বর্ষীয়সী বাঙালী মার চিত্র অঙ্কন করিবেন না? ভালবাসা ত আর দাম্পত্য প্রণয়ে বা যৌবযোজনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। বরং এমনও অনেকে বলেন যে মার ভালবাসাই ভালবাসা। অনেক সময় মাতা প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেন না। ব্যভিচারিণী 'কাশী-বাসিনী'র গল্পে সেই কথাই গ্রন্থকার একরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ষোলটি গল্পের মধ্যে একটি কুলটা মার কাহিনীই কি যথেষ্ট? কখনও না।

'বাঙ্গালি বহুকাল হইতেই মাকে চিনিয়াছিল। ইংরাজি সাহিত্য সেবনে বিকৃত-মস্তিষ্ক হইবার পূর্বে 'মা মা' করিয়া বাঙ্গালি পাগল হইত আর ছড়ায়, গানে, যাত্রায়, পাঁচালিতে—কি মাতৃগাথাই না গাহিয়া রাখিয়াছে। মহাশক্তি মা, কিন্তু মার উপর একডিগ্রী মা বাঙ্গালি চড়াইয়াছে। গিরিরাণী মেনকা বাঙ্গালির অপূর্ব সৃষ্টি। সংস্কৃত সাহিত্যের যশোদা বাঙ্গালির হস্তে কত মোলায়েম, কত ভাবময়ী—তাহাও কি আবার লিখিয়া বলিতে হইবে, যশোদাকে না দেখিলে ভূতভাবন ভগবানকে কি কেহ নীলমণি গোপাল বলিয়া কোলে টানিতে সাহস করিত, রামপ্রসাদ মার নামে যে জীবনী-শক্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রসাদে বাঙ্গালি এখনও নড়িতেছে। আর সেই

ব্যুৎপত্তি এই—'বিগত ধবা যস্যা সা' অর্থাৎ যাহার স্বামী বিগত। আসলে উহা সর্বৈব ভুল। সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় বিগত-স্বামী স্ত্রীকে এই শব্দ দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইংরেজী widow শব্দ যদি জার্মান নিয়মে উচ্চারণ করা যায় তাহা হইলেও বুঝা যাইবে যে শব্দটা 'বিদভ' পুরাতন ইংরেজীতে উহার রূপ widuwe—জার্মান ধরনে উচ্চারিত হইবে 'ভিডুভে'। উহা ল্যাটিন ভাষায় 'vidua', ইটালিয়ান ভাষায় vedova, স্লাভোনিক ভাষাগুলিতেও তাই। পুরাতন স্লাভোনিক ভাষায় বিধবা vidova, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ইন্দো-ইউরোপীয় ধাতু weidh হইতে আসিয়াছে। এই ধাতুর অর্থ 'বিচ্ছিন্ন করা'। সুতরাং বিধবা অর্থ—'যে নারী মৃত্যুর দ্বারা স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে' = 'বিচ্ছিন্না'।

মাকে তোমরা তোমাদের সাধের সাহিত্য হইতে বিতাড়িত করিয়া রাখিবে? তুমি পথেঘাটে বলিবে বন্দেমাতরম্ আর সাহিত্যে কেবল লিখিবে, বন্দে ষোড়শীং রূপসীং প্রেয়সীম্। ছি! তুমি আপনাকে আপনি চিন না। ইংরাজি সাহিত্যের কুহকের মোহে তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঐ মোহ কাটাইতে যত্ন কর। সাহিত্যে মাকে ভুলিও না। যে রাম বসু কিশোর-কিশোরীর বিরহগীতি গাহিয়াছেন, তিনিও ত আগমনী গানে, মেনকার উক্তিতে নানাবিধ মাতৃছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। তুমিও যত্ন করিলে, সেইরূপই করিতে পারিবে, তবে কিনা একবার চোখে, মুখে জল দিয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিতে হইবে, দারুণ মোহ ভাঙ্গিতে হইবে।'

অক্ষয়চন্দ্র নানা মাতৃভক্তের সঙ্গে রামপ্রসাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি ভগবানের মাতৃরূপের উপাসক ছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া কালী কন্যারূপিণী হইয়া তাঁহার বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ কি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীও লেখেন নাই? সেটি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তুলনায় কত গ্রাম্য তাহা না পড়িলে বলা সম্ভব নয়। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, এই ধরণের সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যে নায়িকার যে একটা বিশেষ কাজের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে, যাহা অন্য বই ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এবং গীতগোবিন্দেও অতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে, এবং যাহা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরে'ও আছে—তাহাতে কি সুন্দর বিদ্যাকে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা বিশেষ অবস্থায় কৃষ্ণকে গালি দিলেন, 'আমি তোর মাউলানী, আর তুই এরকম কাজ কচ্ছিস?' তিনি কৃষ্ণকে বাবা বলিয়া ডাকেন নাই। আমি একটা পুরানো গানে রাধার কৈফিয়ৎ শুনিয়াছি। গানটি এই—

'কদম্ব-তরুতলে যে বাঁশী বাজিয়েছিল,
সে তো মোর বাবা নয়কো
আর জনমে ভাতার ছিল।'

অক্ষয়চন্দ্রের কথার মত কথা বলা মূঢ়তা কি ভণ্ডামি তাহা বলা শক্ত হইত, যদি না আমি জানিতাম যে, এক অন্ধ জাতীয়তাবোধের গোঁড়ামি হইতেই আমাদের দেশের সকলেরই, বিশেষ করিয়া বাঙালীর বুদ্ধি লোপ হয়।

যে গল্পটিকে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রেমের গল্প বলিয়া ধরা যায় উহা গ্রীক ভাষায় লেখা। উহার গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন,

'আমার গ্রন্থটি 'এরস'কে (প্রেমের দেবতাকে), 'নিম্ফ'দের (বনদেবী, জলদেবী ইত্যাদিকে) ও 'প্যান'কে (বনদেবতাকে) উৎসগীকৃত। কিন্তু এই গল্পটি নানা ধরণের লোকের কাছেও মূল্যবান হইবে: ইহা রোগীর ব্যাধি দূর করিবে, যে-ব্যক্তি নিরাশার কবলে পড়িয়াছে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, যে ভালবাসিয়াছে তাহার স্মৃতি আবার জাগাইবে, যে ভালবাসে নাই সে ইহাতে দীক্ষা লাভ করিবে।

কারণ কোনো ব্যক্তি সে যাহাই হউক না কেন, ভালবাসার কাছ হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না—যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে রূপ থাকিবে ও রূপ দেখিবার মত চক্ষু থাকিবে। আমার নিজের কথা এই বলিব যে, দেবতাদের কাছে আমার এই প্রার্থনা—তাঁহাদের কৃপায় আমি যেন স্থিতপ্রজ্ঞ রহিয়া অন্যের প্রেমের কাহিনী লিখিতে পারি।'*

বাঙালীর মধ্যে মাতৃভক্তি লইয়া শুধু বাড়াবাড়ি নয়, ভণ্ডামি আছে। উহার সবচেয়ে ঘৃণ্য রূপ দেখা যাইত একটি প্রচলিত উক্তিতে—সেটি বিবাহ করিতে যাইবার আগে মাকে বলা—'মা, তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি'। বিবাহের ও নরনারীর প্রেমের ইহার অপেক্ষা গুরুতর অবমাননা কল্পনা করা যায় না। ইহার মধ্যে ভণ্ডামি কোথায় ছিল বলিতেছি। পুত্র রাত্রির জন্য বেশ্যা চান, তাই মাকে দাসী আনিয়া দিবার ভান করেন; মাতা চান দাসী, তাই পুত্রকে বেশ্যা যোগাড় করিয়া দেন।

প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে শাশুড়ীর সেবাই পুত্রবধূর সর্বোচ্চ কর্তব্য বলিয়া মনে করা দূরে থাকুক, কোনও কর্তব্য বলিয়াই ধরা হইত না। রাম বনবাসে যাইতেছেন, সীতা শোকাভিভূতা শাশুড়ীর সেবা করিবার জন্য অযোধ্যায় রহিলেন না, রামের সঙ্গে বনে চলিলেন। তারপর যখন শুনিলেন, শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও বিধবা শাশুড়ীর সেবা করিবার জন্য দেবর ভরতের সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন না। পক্ষান্তরে রামের সঙ্গে বনবাসে যাইতে সীতার কি সুখ! উহার কথা ভবভূতি বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ যখন চিত্রদর্শন করাইবার সময়ে যমুনার তীরে শ্যাম-নামে বটবৃক্ষ দেখাইলেন, তখন সীতা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর্যপুত্র, এ-সব জায়গার কথা মনে আছে কি?' রাম উত্তর করিলেন, 'দেবি কেমন করিয়া ভুলিব! এই গাছের নীচে তুমি পথ-শ্রান্ত হইয়া আমার বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিলে।'

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা মুখফোড় কথা প্রচলিত আছে। দীনবন্ধু বারুইপুর গিয়া ছাদে বঙ্কিমের পত্নীকে দেখিতে পান। তাই বলেন, 'ছাতে দিনের বেলায় যা জ্যোৎস্না দেখলুম!' তখন বঙ্কিম উত্তর দিলেন, 'দিনের

---

3 καὶ ἀναζητησάμενος ἐξηγητὴν τῆς εἰκόνος τέτταρας βίβλους ἐξεπονησάμην, ἀνάθημα μὲν Ἔρωτι καὶ Νύμφαις καὶ Πανί, κτῆμα δὲ τερπνὸν πᾶσιν ἀνθρώποις, ὃ καὶ νοσοῦντα ἰάσεται, καὶ λυπούμενον παραμυθήσεται, τὸν ἐρασθέντα ἀναμνήσει, τὸν οὐκ ἐρασθέντα προπαιδεύσει. 4 Πάντως γὰρ οὐδεὶς Ἔρωτα ἔφυγεν ἢ φεύξεται, μέχρις ἂν κάλλος ᾖ καὶ ὀφθαλμοὶ βλέπωσιν. Ἡμῖν δ' ὁ θεος παράσχοι σωφρονοῦσι τὰ τῶν ἄλλων γράφειν.

(দীনের) মুখে হেগে দিয়েছে।' সীতা দেবীও বাঙালী মাতৃভক্তদের মুখে হাগিলেন কিনা বিচার্য।

কিন্তু এই নূতন হিন্দু 'পিউরিট্যান'দের নূতন প্রেমের বিরুদ্ধতা করিবার পিছনে একটা জিনিস নিশ্চয়ই ছিল যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা কখনই সজ্ঞান হন নাই, তবু একটা অজানা ভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। সেটা বাঙালী জীবনে নূতন রোমান্টিক ইউরোপীয় প্রেমের সহিত জড়িত পুনরুদ্বেলিত দেহাবলম্বী হিন্দু প্রেমের মাদকতা, যাহাকে প্রাচীন হিন্দু কাম বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিত না। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে 'সাবধানী পথিক' বলিয়া গঞ্জনা দিয়া 'রোমান্টিক' প্রেমের 'অকূল সিন্ধুতীরে' যাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিলেও বলেন নাই যে, সেই নীল সিন্ধুর তলদেশে প্রাচীন হিন্দুকামের প্রায়-ভস্মীভূত বাড়বানল আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোনো বাঙালীর পক্ষেই এ-ব্যাপারটা সম্ভব ছিল না যে, সে কেবল পাশ্চাত্ত্য সমুদ্রেই অবগাহন করিয়া উঠিবে, পুনরুদ্দীপিত হিন্দু বাড়বানলে পুড়িবে না। আমার বক্তব্যটা যেন বাংলা ভাষায় ঠিক বুঝাইতে পারিব না। তাই এ বিষয়ে বিলাতের একটা সাহিত্য-উৎসবে ইংরেজীতে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা উদ্ধৃত করিব। আমি বলিলাম,—

> 'Transformed by European romanticism, the subterrenean fire of the old Hindu erotic frenzy erupted this time as romantic love, corporeal and incorporeal at the same time, and, equally burning and ennobling in both aspects.

প্রেমের বিরুদ্ধতা ইহা হইতেই আরও তীব্র রূপ ধরিল। একে তো 'রোমান্টিক' ভাবের উচ্ছলতাই ভীতিজনক হইয়াছিল, তাহার উপরে যখন পিছনে হিন্দু কামের অগ্নিশিখাও দেখা দিল, তখন বিরাগ চতুর্গুণ হইবারই কথা। উহা লেখকগণের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না।

নীতি-প্রচারকদের বিরুদ্ধতা শুধু কথায় প্রকাশিত হইত। পুত্রের মাতার, অর্থাৎ পুত্রবধূর শাশুড়ীর বিরাগ আত্মপ্রকাশ করিত আচরণে। প্রাচীনা মাতা বাল্যবয়স হইতে স্বামীর কামের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া নিজের কামকেও অসাড় করিয়া ফেলিয়াছিল, তাই যখন তরুণী বধূর মুখে প্রেমের দীপ্তি ও সম্ভোগের জীবন্ত প্রকাশ দেখিত, তখন ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিত। কলিকাতার প্রাচীনা বলিত, 'মা, কালীঘাটের কালী, আমার বাছাকে এই ডাইনীর হাত থেকে রক্ষে কর। মা, আমি তোমায় জোড়া পাঁটা দেব।' পুত্র রোগাক্রান্ত হইলে এই বিদ্বেষ আরও নিষ্ঠুর হইত। তখন বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া বলিত, 'নইলে এই রাক্ষসী আমার ছেলেকে খাবে।' ইহার ইঙ্গিত যে কি কুৎসিত তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আচরণে ও কথায় ব্যাপারটা যত স্থূল মনে হইবে, আসলে তাহা মোটেই নয়, সমস্ত বিরুদ্ধতার পিছনে একটা ধারালো সূক্ষ্ম অনুভূতিও

ছিল, যাহার প্রকৃত রূপ, না নীতিপ্রচারকেরা না শাশুড়ীরা, কেহই বুঝিতে পারে নাই। এই রূপটা বুঝাইবার জন্য একটা নৈসর্গিক উপমা দিব। আমার বাগানে বহু 'লিলি' ফুল হয়। বর্তমানে লিলি নানা রংএর হইলেও, উহার আদি রং শাদা। উহার শুভ্রতা চোখকে ঝল্‌সাইয়া দেয়, এবং দূর হইতে উহার সুগন্ধ যখন ভাসিয়া আসে তখন মনে হয় উহার সৌরভও শুভ্রতারই সমধর্মী। কিন্তু কাছে আসিলেই উহার গর্ভদেশ হইতে এমন একটা তীব্র গন্ধ পাওয়া যায় যে, উহা সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যখন 'লিলি'র টব ঘরে রাখিয়াছি, তখন এক এক সময়ে উহার মাদক গন্ধ অসহনীয় মনে হইয়াছে। নব-যুগের তরুণীদের মুখে প্রেমের যে প্রকাশ দেখা যাইত, তাহাও এই বিলাতি লিলির শুভ্রতার সহিত তাহার উগ্র সৌরভের মিশ্রণেরই মত।

বাঙালীর নূতন প্রেমে একটা দিবা ও আর একটা নিশা ছিল। এই দ্বিত্বের প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতেই দিব। বাঙালীর নূতন প্রেমের রূপ কাব্যে ও গল্পে সকল বড় বাঙালী লেখকই দেখাইয়াছেন। কিন্তু কেহই রবীন্দ্রনাথের উপরে উঠেন নাই। সেজন্য তাঁহাকেই আমার পক্ষে সাক্ষী মানিব। আমি বুঝিতে পারি না কেন ইতিপূর্বে কোনও বাঙালী সমালোচক বা ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির এই দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই।

যিনি সংস্কৃত কাব্য পড়েন নাই তাঁহার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্য তো বটেই, এমন কি রবীন্দ্রনাথের মনকেও পুরাপুরি বোঝা অসম্ভব। তাঁহার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে হিন্দুর বর্তমানের সহিত হিন্দুর অতীতের মনোবৃত্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুইটিকে আলাদা করা যায় না। সেইজন্যই তাঁহার বহু প্রেমের গান ও কবিতা রাত্রির সহিত আশ্লিষ্ট। কয়েকটামাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। আরও অনেক দিতে পারিতাম। তবে আমার সমর্থক হিসাবে এই কয়টাই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি।

১। 'আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে কুসুমচয়ন রে।
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল, বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন প্রভাতে যাইবে ছলিয়া।'

২। 'তুমি যেয়ো না এখনি।
এখনো আছে রজনী॥
পথ বিজন তিমির সঘন,
কানন কণ্টকতরুগহন—আঁধার-ধরণী॥'

৩। 'আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী।
অতি ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী॥'

৪। 'ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে শেষের রাতে।
শুকনো ফুলের মালা এখন দাও তুলে মোর হাতে॥'

৫। 'মিলন রাতি পোহালো, বাতি নেভার বেলা এল—'

৬। 'নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
তোমার অনল দিয়া ॥'

৭। 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে।'

৮। 'ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, "না, না, না"।
যত বলি "নাই রাতি—মলিন হয়েছে বাতি"
মুখ পানে চেয়ে বলে, 'না, না, না।'

৯। 'না, না গো না,
কোরো না ভাবনা—
যদি বা নিশি যায় যাব না যাব না ॥'

১০। 'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।'

এই যদি যথেষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের গল্প ও কবিতা হইতে আরও দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। 'ত্যাগ' গল্পে কুসুম যখন বলিল, 'আজ মনে হইতেছে তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও না কেন আমি বহন করিতে পারিব, তখন "শাস্তি" সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শ্লোক, আওড়াইয়া হেমন্ত একটা রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। শ্লোকটা কি তাহা যিনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পড়িয়াছেন তিনিই স্মরণ করিতে পারিবেন। আমার মুখস্থ থাকিলেও উহা উদ্ধৃত করিব না। তারপর শয়নগৃহের একটা দৃশ্যের বর্ণনা—'জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মত বাতায়নবর্তী পালঙ্কের একপ্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে।'—এই উপমার অর্থ বুঝিতেও কাহারও কষ্ট হইবার কথা নয়। এখন কবিতার শরণ লই। একটি এই—

'যদি গাহন করিতে চাও এসো নেমে এসো হেথা
গহন তলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ,
তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ
সুনীল জলে।'

এই সব কবিতার অর্থ বুঝিতে নৈতিক শুচিবায়ুগ্রস্ত গুরুদের শিষ্য, কলেজের ছাত্রেরও অসুবিধা হইত না। আমি ১৯১৪ সনে রিপন কলেজে পড়ি, তখন রবিবাবু-বিরোধী একজন সমপাঠী আমাকে বলিল—'রবি ঠাকুর ন্যাংটো মেয়ে মানুষ দেখাবার জন্যে কবিতাটা লিখেছে।' এমন কি তখন, 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' হইতে এই ক'টি কথা আবৃত্তি করিয়া—

'অরণ্য আড়ালে রহি কোনমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।'

বলিল, 'এটাও আর কিছু নয়, ন্যাংটো মেয়েমানুষের কথা বলবার জন্যে।'

সুতরাং নৈতিক শুচিবাই-গ্রস্ত বাঙালীরা 'ঝুলন' কবিতায়—

'আয় রে ঝঞ্ঝা, পরানবধূর
আবরণ রাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-বসন খোল্ ॥
দে দোল্ দোল্ ॥'

ইত্যাদি পড়িয়া মুখে যাহাই বলুক না কেন, ছুটিয়া শয়নগৃহে অসুখ-সুপ্তা স্ত্রীর নিকট নিশ্চয়ই যাইত।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রেমের অনুভূতি অর্ধাংশে কোথা হইতে আসিয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। উহা প্রাচীন হিন্দুর অনুভূতি। সে নারীকে রাত্রিচারিণী অভিসারিণী বলিয়াই জানিত। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষে এই অভিসারিণীদের সম্মান রক্ষাকেই লোকে রাজার সর্বোচ্চ কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। এই কারণেই কালিদাস দিলীপের শাসন সম্বন্ধে সুনন্দার মুখে এই উক্তি দিলেন,—

'যস্মিন্মহীং শাসতি বাণিনীনাম্
নিদ্রাং বিহারার্ধপথে গতানাম্।
বাতোঽপি না স্রংসয়দংশুকানি,
কো লম্বয়েদাহরণায় হস্তম্ ॥

(রঘুবংশ, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৭৫ শ্লোক)

'তিনি যখন পৃথিবী শাসন করিতেন তখন যদি মদমত্তা যুবতীরা বিহার মন্দিরের অর্ধপথে গিয়া ঘুমে পথে ঢলিয়া পড়িত, সেই অবস্থায় বায়ুও তাহাদের বসন বিস্রস্ত করিত না, কোন পুরুষের পক্ষে তাহাদের বস্ত্র অপহরণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবার সম্ভাবনাও ছিল না।'

সে-যুগে যদিও বা সুন্দরীরা দিনের বেলায় বন ভ্রমণে বাহির হইত, তখন 'মেঘৈর্মেদুরম্ অম্বরম্' হইয়া যাইত।

প্রাচীন হিন্দুর প্রণয়িনী সম্বন্ধে (তা সে বিবাহিতা পত্নীই হউক না কেন) যে ধারণা ছিল উহার সহিত গোরার যে ধারণা তাহার সমন্বয় হইতে পারিত না। কিন্তু যতই অসম্ভব হউক নব্য বাঙালীর সেটা অবশ্যকর্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি কবিতায় সেই সমন্বয় করিলেন। উহা পুরাপুরি উদ্ধৃত করিতেছি।

রাত্রে ও প্রভাতে

কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি-'পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,

হেসে করিয়াছ পান চুম্বন-ভরা সরস বিম্বাধরে.
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে মধুর আবেশভরে।
তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি,
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে তোমার কমলকোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন, মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি—
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে সখী, হাসিমুকুলিত মুখে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে নবীন মিলন সুখে॥

আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী বাঁশীতে উঠেছে বাজি
এই নির্মলবায় শান্ত উষায় জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুররেখা;
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা!
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনতশিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে॥

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি ১৩০২ সনের ২১শে মাঘ তারিখে লিখিয়াছিলেন। প্রণয়িনীর দ্বিত্বের মধ্যে এই ঐক্যের প্রতিষ্ঠাই প্রেমের ক্ষেত্রে নব্য বাঙালীর সর্বোচ্চ কীর্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রেম—ঘরে ও বাইরে

বাঙালী জীবনে নূতন প্রেমের রূপ কি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। এখন দেখাইতে হইবে কি ভাবে উহাকে বাঙালী জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। সে প্রতিষ্ঠা যেমন ঘরে হইল, তেমনি ঘরের বাহিরেও হইল। ঘর বলিতে বিবাহিত জীবন বুঝিতেছি, বাহির বলিতে পারদারিক। প্রেম বিবাহের গণ্ডীর মধ্যে কোনও দেশেই আবদ্ধ থাকে নাই, থাকেও না। বাঙালীর মধ্যেও ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দুই ক্ষেত্রেই নূতনত্ব দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে নরনারীর সম্পর্কের যে তৃতীয় আর একটা ক্ষেত্র ছিল, যাহাকে 'সাধারণিক' বলা হইত তাহার কথা বলিব না, কারণ উহাতে প্রেম ছিল না।

বিবাহের নূতন বয়স

বাঙালীর মধ্যে ইউরোপীয় রোমাণ্টিক প্রেমের তৃষ্ণা যেমনই জাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের বয়সেরও পরিবর্তন করিতে হইল। হিন্দুর বাল্যবিবাহ সাত-আট হইতে এগার বৎসরের মধ্যে হইবার কারণ স্ত্রীজাতির দৈহিক ধর্ম। ইহার জন্য কোনও ক্রমেই বিবাহের বয়সকে এগারোর উপরে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ইহা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। খুল্লনার বয়স বারো হইয়া গেল, তবুও তাহার পিতা লক্ষপতি বিবাহ দেন নাই, সেজন্য জনাই পণ্ডিত আসিয়া লক্ষপতিকে তিরস্কার করিলেন—

শুনহে অবোধ লক্ষপতি
বার বছরের সুতা, ঘরেতে অবিবাহিতা
কেমনে আছহ সুস্থমতি ॥
সাত বছরের কন্যা, বিয়া দিলে হয় ধন্যা,
তার পুত্র কুলের পাবন।
আহরিয়া বর আনি, কহিয়া মধুর বাণী,
পণ বিনা করে সমর্পণ ॥
নবম বছরে যদি, বর আনি যথাবিধি
তনয়া করয়ে সম্প্রদান
তার পুত্র দিলে জল, সুরপুরে পায় স্থল,
পিতৃকুলে পায় বহু মান ॥
কেহ না বুঝাল তোমা, সুতা হৈল দশসমা,
তথাচ না কৈলে কন্যাদান।

প্রবেশিলে একাদশে, মদন হৃদয়ে বৈসে,
নবরস হয় একস্থান ॥
না করিলে কর্মভাল, এগার বছর গেল,
অপযশ করিলা সঞ্চয় ।
দ্বাদশ বর্ষের বেলা, কন্যা হয় রজস্বলা,
পুরুষেরে নাহি করে ভয় ॥
পুষ্পিতা যাবত নয়, তাবত পুরুষে ভয়,
রয়ে সয়ে তার কামমনা ।
নর দেখি অভিরাম, যদি কন্যা করে কাম,
পায় পিতা নরক-যন্ত্রণা ॥

এই প্রথা যে মুকুন্দরামের সময়েই ছিল তাহা নয়, রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল পর্যন্ত ছিল তাহার প্রমাণ দিতেছি। 'হৈমন্তী' গল্পে তিনি লিখিলেন,—

'কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দূর সম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবৌ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।"...

'আমার মা খুব জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, সে কি কথা! বউমার বয়স হবে এগারো বই তো নয়, এই আসছে ফাল্গুনে বারোয় পা দেবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"'

আসলে অবশ্য হৈমন্তীর বয়স সতেরো। হৈমন্তী এই কথা বলিয়া ফেলাতে শ্বশুরের দ্বারাও তিরস্কৃত হইল, শ্বশুর বলিলেন, 'আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এসব চলিবে না, বলিয়া রাখিতেছি।'

শরৎচন্দ্র একটি গল্পে লিখিয়াছেন, 'কন্যার বিবাহযোগ্য বয়সের সম্বন্ধে যত মিথ্যা কথা চালানো যায় চালাইয়াও সীমানা ডিঙাইয়াছে।' মনে রাখিতে হইবে রবীন্দ্রনাথের গল্পটি ১৯১৪ সনে প্রকাশিত ও শরৎচন্দ্রেরটি ১৯৩৪ সনে।

সুতরাং এগারো বছরের মিয়াদ তখনও বাতিল হইয়া যায় নাই। কিন্তু এগারো বছরে বিবাহ হইলে বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভে 'রোমান্টিক' প্রেম একান্তই অসম্ভব, সেজন্য যতটুকু কম রাখা যায় ততটুকু কম রাখিয়া বিবাহের বয়স তেরো করা হইল, চৌদ্দও হইত। কিন্তু বিবাহের বয়সের এই যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হইল তাহা বাল্য-বিবাহের সহিত একটা গোঁজামিল দিবার জন্য নহে। 'রোমান্টিক' প্রেমের মত তেরো-চৌদ্দ বয়সও আসিল ইউরোপ হইতে। বঙ্কিমবাবুর যুগে কলেজে পড়া বাঙালী যুবক মাত্রেরই 'রোমিও-জুলিয়েট' মুখস্থ থাকিত। তাহারা 'রোমিও-জুলিয়েটের' ব্যাপার নিজেদের জীবনে প্রবর্তন

করা যায় কিনা তাহার কথা দিনরাত ভাবিত। এখন জিজ্ঞাস্য, জুলিয়েটের বয়স কত ছিল। তাহার মাতা ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যে, তাহার চৌদ্দ হইতে এক পক্ষ বাকী আছে, অর্থাৎ জুলিয়েটের বয়স তেরো বছর সাড়ে এগারো মাস। তখন লেডী ক্যাপুলেট কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'Tell me, daughter Juliet,
How stands your disposition to be married ?'

কন্যা উত্তর দিলেন,

'It is an honour that I dream not of.

মাতা আবার বলিলেন,

'Well think of marriage now ;
younger than you,
Here in Verona, ladies of esteem,
Are made already mothers ; by my count,
I was your mother much upon these years
That you are now a maid.'

জুলিয়েটের বয়সকে আদর্শ বলিয়া মানিয়া বাঙালী সমাজে বিবাহ ও প্রেমের সমন্বয়ের সমস্যার সমাধান হইল। ইহা যে আমার কল্পনা মাত্র নয় তাহার প্রমাণ দিতেছি।

প্রভাতকুমারের 'আমার উপন্যাস' গল্পে নায়ক অবস্থাচক্রে রাঁধুনী বামন হইয়া এক গৃহস্থ-বাড়ীতে আসিয়াছে। বাড়ীর কর্তার ডাকে উপরের বারান্দায় একটি বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল। নায়ক লিখিল,

'সেই আমাদের প্রথম চারিচক্ষে মিলন। রোমিও ও জুলিয়েটের অলিন্দ-দৃশ্য মনে পড়িল। আমার জুলিয়েট আলুলায়িত-কুন্তলা, দোতলার বারান্দা হইতে দেখিলেন স্কন্ধে গামছা, হস্তে ভিজা কাপড়, পাচক-ব্রাহ্মণরূপী রোমিও মুগ্ধ নেত্রে দণ্ডায়মান। জুলিয়েটের বয়স চতুর্দশ বর্ষ ছিল, আমার জুলিয়েটের বয়সও তাহাই বলিয়া অনুমান করিলাম। তাহার দেহবর্ণটি ইতালীয় জুলিয়েট অপেক্ষা কিছু মলিন হইলেও, কিন্তু মুখ চক্ষুর সৌন্দর্য অপরাভূত।'

প্রভাতকুমারের গল্পটির ঘটনা ১৮৯৩ সনে।

সেক্সপীয়ারের 'রোমিও-জুলিয়েটে'র কাহিনী যে সে-যুগে সকল বাঙালী লেখকেরই মনে ছিল তাহার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ হইতে দিতেছি। রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' গল্পটি ১৮৯২ সনে লিখিত। তাহাতে প্যারিশংকরের মুখে তিনি এই উক্তি দিয়াছেন,—

'বিবাহের অনতিপূর্বে কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে; বলে, "ইহাতে কাজ নাই, জ্যাঠামশায়।" আমি বলিলাম, "কী সর্বনাশ, সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কী বলিয়া ফিরাইব।"—কুসুম বলে, "তুমি

রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও।" আমি বলিলাম, "তাহা হইলে ছেলেটির দশা কী হইবে ? তাহার বহুদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে, আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব ! আবার তাহার পরদিন তোমাকে তাহার মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বুড়া বয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি।"'

ভুল ধারণার বশে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর যুগল-আত্মহত্যা রবীন্দ্রনাথ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন বলিবার আবশ্যক নাই।

ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্তও কোনো মেয়ে একুশের উপর অবিবাহিতা থাকিলে নিজের বয়স বলিতে লজ্জা বোধ করিত। তাই এলিজাবেথ বেনেট যখন একটু রহস্য করিবার জন্যই লেডী ক্যাথারিনের উত্তরে নিজের বয়স বলিতে অনিচ্ছা দেখাইল, তখন বৃদ্ধা বলিলেন,

'you cannot be more than twenty, I am sure, therefore you need not conceal your age.'

এলিজাবেথ উত্তর দিল, 'I am not one and twenty.'

তখন ইংরেজ সমাজেও ষোল বছর বয়স্কা মেয়ে ও একুশ বৎসরের বেশী বয়স্কার মধ্যে প্রভেদ প্রায় কচি পাঁটা ও বোকা পাঁটার মধ্যে প্রভেদের মত মনে হইত।

কিশোরীর প্রেম

বিবাহ না হয় তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সে হইল। কিন্তু সে-বয়সে কি প্রেমের অনুভূতি হওয়া সম্ভব, উহার উপর সেই অনুভূতির ভাষায় প্রকাশ সম্ভব ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রথমত জুলিয়েটের উক্তি হইতেই দিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রেমালাপের কথা লিখিয়াছিলেন, এই উক্তিটি তাহারই মধ্যে।

জুলিয়েট বলিতেছে—

'I gave thee mine [ভালবাসা] before thou didst request it,
And yet I would it were to give again.
But to be frank, and give it thee again
And yet I wish but for the thing I have ;
My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep ; the more I give to thee,
The more I have, for both are infinite.'

এই উক্তি হইতে বুঝা যাইবে দ্বিজেন্দ্রলাল—'এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি……যত ভালোবাসে তায় ততই বাসিতে চায়।' এই গানটির ভাব

কোথায় পাইয়াছিলেন। সেক্সপীয়রের যুগে নাটকের শ্রোতারা চৌদ্দ বৎসরের কিশোরীর মুখে এই ধরনের উক্তি যদি অসম্ভব মনে করিত তাহা হইলে তিনি তাহার মুখে উহা নিশ্চয়ই দিতেন না।

ইংলণ্ডে আরও দুইশত বৎসর পরেকার অবস্থার কথাও বলিব। তখনকার একটি উপন্যাসে একটি ষোল বছরের ইংরেজ মেয়ে, একথা বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত নয় যে পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকিলে কোনও মেয়ের ভালবাসিবার ক্ষমতাও থাকে। জেন্ অস্টিনের ষোল বছরের নায়িকা মেরি-অ্যান বলিল,—

> 'A woman of seven and twenty can never hope to feel or inspire affection again, and if her home be uncomfortable, or her fortune small, I can suppose that she might bring herself to submit to the offices of nurse, for the sake of the provision and security of a wife. In my eyes it would be no marriage at all, but that would be nothing. To me it would seem only a commercial exchange, in which each wished to be benefited at the expense of the other'.

আর কিছু বলিবার আগে একটা ব্যাপারের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি, কারণ এ-বিষয়ে আমাদের মধ্যে জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। ব্যাপারটা এই—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও, ইউরোপের, বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের, অভিজাত সমাজে সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ হইত ও বিবাহ প্রায়ই পনের-ষোলো বছরে হইয়া যাইত। এমন কি ১৯৫২ সনের পরেও ভারতবর্ষে ফ্রান্সের দূত কাউন্ট অস্ট্রোরগ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ চৌদ্দ বৎসর বয়সে হয়।

পূর্বেকার একটা দৃষ্টান্ত দিব। নেপোলিয়নের যুগে ও তাহার কিছু পূর্ব হইতে একটি তরুণী রূপের জন্য সমস্ত ইউরোপে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার বিবাহ পনর বৎসর চার মাস বয়সে তাঁহার প্রায় পিতৃতুল্য এক ধনী ব্যাঙ্কারের সহিত সম্বন্ধ করিয়া হয়। সে-যুগে ইউরোপে এমন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি তাঁহাকে ভালবাসেন নাই। উহাদের মধ্যে একজন নেপোলিয়ানের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আর একজন প্রুসিয়ার রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রাজকুমার বলিয়াছিলেন, ইনি যদি বৃদ্ধ স্বামীকে 'ডিভোর্স' করেন, তাহা হইলে তিনি সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। তিনি বিধবা হইয়াও বাহাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, তিনি সারা জীবনেও দৈহিক কৌমার্য হারান নাই। তাঁহার যখন ষোল বৎসর বয়স তখন সাতান্ন বৎসর বয়স্ক এক-জন বিখ্যাত ফরাসী লেখক তাঁহাকে একটি পত্রে লেখেন,—

'বিদায়, ম্যাডাম, আমি আপনার কাছে যে সকল ভাব সরলান্তঃ-

করণে প্রকাশ করিয়াছি, তাহাকে আপনি ছাড়া সকলেই আশ্চর্য মনে করিয়া বলিবে ষোল বছরের কোনও তরুণীকে এই ধরনের কথা লেখা যায় কি ? আমি কিন্তু জানি, যে আপনার ষোল বৎসর শুধু আপনার মুখেই রহিয়াছে।'

অর্থাৎ মানসিক পরিণতি ও বৈদগ্ধ্যে তিনি পূর্ণবয়স্কার কম কোনো দিকেই নন। আমাদের ত্রয়োদশী-চতুর্দশীরা বৈদগ্ধ্যে ইহার সমান না হইলেও, মানসিক জীবনে মারী বাশকিরৎসেফের সমকক্ষ হইতে পারিত। মারী বাশকিরৎসেফ কে ও কি করিয়াছিল তাহার পরিচয় পরে দিব। উহার আগে আমাদের কিশোরী ও তরুণীর দুই-একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

শরৎচন্দ্র তাঁহার একটি নায়িকাকে এগারো বৎসর বয়সেই 'প্রেমে পাগল' করিয়াছিলেন। এটি তাঁহার প্রথম দিকের গল্পে, তখনও তিনি সম্ভবত বয়সের হিসাবে পাকা হন নাই। কিন্তু এই গল্পটির দুই বৎসর পরের গল্প হইতেই তাঁহার নায়িকাদের বয়স নূতন যুগের গ্রাহ্য বয়সে উঠিয়া গেল। 'পরিণীতা' গল্পে নায়িকা ললিতার বয়স তেরো, চৌদ্দয় পা দিবে। কথাবার্তা ও আচরণে সে নবযুগের বাঙালী তরুণী, পুরাতন হিসাবে কিশোরী হইলেও।

তাহার পিতামাতা নাই, আট বৎসর হইতে সামান্য অবস্থার মামা তাহাকে বড় করিতেছেন। কিন্তু পাশের বাড়ীর বড়লোকের পুত্র শেখর তাহাকে স্নেহ করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছে। যখন কাহিনী আরম্ভ হইল তখন ললিতা তেরো বছরের, শেখরের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। শেখরের স্নেহ তখন অন্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ললিতা তখনও নিজেকে বুঝিতে পারে নাই। তাই শেখরের আলমারী হইতে নিজেদের শখের খরচের টাকা লইয়া যাইতে যাইতে সে নিজের মনেই বলিল, 'টাকা ত দরকার হলেই নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ শোধ হবে কি করে ?' শেখর উত্তর দিল, 'শোধ হবে, না হচ্ছে।' ললিতা না বুঝিয়া চাহিয়া রহিল।

শেখর শুধু বলিল, 'আরও একটু বড় হও, তখন বুঝতে পারবে।' বড় হইতে মাস খানেকও দেরী হইল না।

শেখর মাকে লইয়া পশ্চিমে যাইবার আগে এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় ললিতা তামাসা করিয়া শেখরের গলায় মালা পরাইয়া দিয়াছিল, তাহার অর্থ কি শেখরও ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিয়াছিল। ললিতা দারুণ অপমান ও লজ্জা মনে করিয়া ছাতের পাঁচিল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন দু'চারটা কথা হইবার পর শেখর নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া ললিতাকে বুকে টানিয়া লইয়া মুখ-চুম্বন করিয়াছিল। ললিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি হঠাৎ তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে ফেলেচি বলেই কি তুমি এ-রকম করলে ?' শেখর বলিল, 'না, আজই ঠিক বুঝতে পেরেছি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।' ললিতা জানিত অবস্থার তারতম্যের জন্যে তাহাদের বিবাহ অসম্ভব, কিন্তু এও জানিল যে চুম্বন গ্রহণের পর তাহার আর পথ নাই—সে সেদিন হইতে শেখরের পত্নী।

শেখর প্রবাস হইতে ফিরিবার আগে আরও বাধার সৃষ্টি হইল। তাহার মামা একটি ব্রাহ্ম যুবকের কাছ হইতে অনেক টাকা লইয়া পূর্বেকার ঋণ শোধ করিয়া বাস্তুভিটা বাঁচাইয়াছিলেন, তারপর ব্রাহ্মও হইলেন, ও সেই ব্রাহ্ম যুবকের সহিত ললিতার বিবাহের জন্যও উদ্যোগ করিলেন। শেখর ফিরিবার পর এই সব জানিতে পারিয়া ললিতার প্রতি বিরাগ দেখাইল। ললিতা যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ও একটা প্রশ্ন করিল, তখন শেখর বলিল, 'এখন তোমরা ব্রাহ্ম, আমরা হিন্দু।'

ললিতা উত্তর দিল, 'মামা যাই হোন, তুমি যা আমিও তাই। মা তোমাকে যদি না ফেলতে পারেন, আমাকেও ফেলবেন না। আর গিরীনবাবুর কাছে টাকা নেবার কথা বলচ—তা সে আমি ফিরিয়ে দেব। আর ঋণের টাকা, দু'দিন আগেই হোক্, পিছনেই হোক্, দিতেই তো হবে।'

শেখর প্রশ্ন করিল, 'অত টাকা পাবে কোথায় ?' ললিতা মুহূর্ত কাল মৌন থাকিয়া শেখরের মুখের পানে একটি বার চোখ তুলিয়া বলিল, 'জান না, মেয়েমানুষে কোথা থেকে টাকা পায় ? আমিও সেইখানেই পাব।' তেরো বৎসরের বালিকা এই কথা বলিল। আবার যখন শেখর বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'কিন্তু তোমার মামা তোমাকে বিক্রী করে ফেলেচেন যে !'

তখন ললিতা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল—'ও-সব মিছে কথা। আমার মামার মত মানুষ সংসারে নেই—তাঁকে তুমি ঠাট্টা করো না। তাঁর দুঃখ-কষ্ট তুমি না জানতে পার, কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে।' ইহার পর একবার ঢোঁক গিলিয়া, ইতস্তত: করিয়া বলিল,—'তাছাড়া তিনি টাকা নিয়েচেন আমার বিয়ে হবার পরে, সুতরাং আমাকে বিক্রী করবার অধিকার তাঁর নেই, বিক্রিও করেননি। এ অধিকার আছে শুধু তোমারি, তুমি ইচ্ছে করলে টাকা দেবার ভয়ে আমাকে বিক্রি করে ফেলতে পার বটে।'

বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুত পদে চলিয়া গেল। সে রাত্রে শেখর বহুক্ষণ পর্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতেছিল, সেদিনকার একফোঁটা ললিতা এত কথা শিখিল কিরূপে ? এমন নির্লজ্জ মুখরার মত তাহার মুখের উপর কথা কহিল কি করিয়া। ভাবিবার কথা বটে। কিন্তু সেইদিন হইতে ললিতা আর শেখরের উপর কোনও দাবী করিল না, তাহার কাছ হইতে আর কিছুই প্রত্যাশা করিল না। সারাজীবন মুখ বুজিয়া নিজের দুঃখ মানিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইল—চৌদ্দ বৎসর বয়সে।

চরিত্রের মহিমায় ললিতারও উপরে যায় এরূপ আর একটি তরুণী শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার 'পথনির্দেশ' গল্পের হেমনলিনীতে। সে-ও তেরো বছর হইতে চৌদ্দতে পা দিবে। তাহার কথা বলি। তাহার মাতা বিধবা হইবার পর নিঃস্ব হইয়া এক ব্রাহ্ম যুবকের আশ্রয় লইয়াছেন, উহার বাল্যবয়সে তিনি তাহার সইমা ছিলেন, ও সে মাতৃহীন হওয়ার পর তিনি তাহাকে বড় করেন। যুবকের নাম গুণেন্দ্র। সে তার সইমাকে অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বাড়িতে রাখিয়াছিল।

কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হইল তাঁহার অপরূপ রূপবতী কন্যা হেমকে লইয়া। গুণী ও হেম দুজনেই পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে কিন্তু গুণী সুবাদে ভাই বলিয়া হেমের মা দুজনের বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। গুণী তাহা জানিয়া নিজের মনকে দমন করিয়া রাখিত, কিন্তু হেমের এই সঙ্কোচ ছিল না। সুতরাং যখন তাহার অন্যত্র সম্বন্ধ করা হইল তখন সে যে গুণীকে ভালবাসে তাহা প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র সংকুচিত হইল না। গুণী ব্রাহ্ম বলিয়া হেম খাইবার সময়ে সেই ঘরে তাহার প্রবেশ করাও নিষেধ ছিল। তবু হেম জোর করিয়া তাহার পাতে খাইতে বসিল। মা বলিলেন, 'ওকি করছিস, হেম! ও যে গুণীর এঁটো পাত, যা, কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে আয়।' হেম উচ্ছিষ্টাবশেষ হইতে একগ্রাস মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, 'ঠাকুর ভাত দাও। গুণীদার এঁটো পাতে বসে খাবার যোগ্যতা, সংসারের কজনের ভাগ্যে আছে? এ পাতে খেতে পাওয়া ভাগ্য।' গুণী পরে হেমকে রহস্য করিয়া বলিল, 'আজ হেমের যে জাত গেল।' কিছু কথা-কাটাকাটির পর হেম বলিল, 'তোমার পাতে বসে খেলে কারো জাত যায় না। যারা জাত তৈরী করেছে—তাদেরও না।' গুণী বলিল, 'তা হোক, কিন্তু কাজটা ভাল হয় নি। যার যা জাত তাই মেনে চলা উচিত। তা ছাড়া মাকে দুঃখ দেওয়া হয় যে!'

হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ যেন রাগ করিয়া বলিল, 'এ যেন তোমার বাড়ি নয় তোমার জায়গা নয়, তুমি যেন সকলের নীচে, সকলের ছোট। এ যদি বা তোমার সহ্য হয় আমার হয় না। তোমার পাতে বসে খেলে মা দুঃখ পান, না খেলে মার চেয়ে যিনি বড়, তাঁকে দুঃখ দেওয়া হয়।' ইহা শুনিয়া গুণীর চোখের উপর হইতে যেন একটা কালো পর্দা সরিয়া গেল। হেমনলিনীর কথা আমি আরও অনেক বলিব। এই খানে শুধু তেরোবছরের মেয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

এখনও অনেকে বলিবেন, তেরো বছরের মেয়ের মুখে এই সব কথা সম্ভব নয়, উহা ঔপন্যাসিকের কল্পনা মাত্র। আজিকার দিনের শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েরা এবং আরও বেশী করিয়া যাঁহারা অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে পড়িতেছেন তাঁহারা, কেন এই ধরণের বাঙালী মেয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে চান না তাহার আলোচনা আমাকে যথাস্থানে করিতেই হইবে। এখানে শুধু বলিব, এই অবিশ্বাস অজ্ঞতা ও মানসিক সংকীর্ণতার ফল। কিন্তু আমি কোনও সত্যকার বাঙালী কিশোরীর উক্তি বা লেখা উদ্ধৃত করিয়া আমার কথা প্রমাণ করিতে পারিব না। আমাদের সামাজিক ইতিহাসের এই পরিচ্ছেদ লিখিবার মত তথ্য প্রমাণ নাই তবে আমি দেখাইব, এই বয়সের মেয়ের এই ধরণের কথা বলিবার ঐতিহাসিক প্রমাণ ইউরোপীয় ইতিহাসে আছে। সেই জন্যই আগে বলিয়াছি, আমাদের কিশোরীরা অন্ততঃ পক্ষে মারী বাশকির্টসেফ হইতে পারিত। এখন এই মেয়েটির পরিচয় দিব।

সে রুশ অভিজাত পরিবারের মেয়ে। তাহার জন্ম হয় ১৮৬০ সনের ১১ই নভেম্বর, মৃত্যু হয় চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইবার এগারো দিন পূর্বে ১৮৮৪

সনের ৩১শে অক্টোবর তারিখে। মেয়েটিকে তরুণী নারীদেহে একটা উজ্জ্বল দীপশিখা বলা যাইতে পারে। তাহার পিতা ও মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়াতে সে ফ্রান্সে বড় হয়, ও সেখানে নিজে নিজে লেখা-পড়া এত করে যে অল্প বয়স হইতে গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু সে জীবনে কখনও ইংরেজীতে যাহাকে 'ব্লু-স্টকিং' বলে তাহা হয় নাই। তাহার উদ্দাম নারী-প্রকৃতি তাহার মৃত্যুর এগার দিন আগে পর্যন্ত 'গৃহপালিত' হইয়া যায় নাই। সে বারো বৎসর হইতে একটি ডায়ারী রাখিতে আরম্ভ করে ও যক্ষ্মায় মৃত্যুর এগারো দিন আগে পর্যন্ত তাহাতে লেখে, তারপর আর শক্তিতে কুলায় নাই। যখন সে জানিয়াছে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত তখনও সে কি ভাবে মনের কথা লিখিয়াছিল তাহা প্রথমে উদ্ধৃত করিব।

ডায়ারীর তারিখ ১৮৮৪ সন, ৫ই মে, সোমবার (মৃত্যুর ৪ মাস ২৬ দিন আগে)।—

> '"মরা" একটা কথা, যা বলা ও লেখা সহজ। কিন্তু "আমি শীগীরই মরতে বসেছি" এটা ভাবা ও বিশ্বাস করা? আমি কি সত্যিই তা বিশ্বাস করি? না, কিন্তু আমি ভয় পাই। সত্য কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা বৃথা। আমার যক্ষ্মা হয়েছে। আমার ডানদিকের ফুসফুসের বেশ অনিষ্ট হয়েছে, বাঁ দিকেরটাও অল্পবিস্তর রোগাক্রান্ত হয়েছে গেল বছর থেকে। সোজা কথা, দুই দিকই নষ্ট হয়েছে। অন্য ধরণের গড়নের হলে, আমি এতদিনে প্রায় শুকিয়ে যেতাম। দেখলে মনে হয় আমি অনেক তরুণীর চেয়ে গোলগাল। কিন্তু আমি যা ছিলাম তা আর নই। এক বৎসর আগেও আমার দেহ অতি সুন্দর অবস্থায় ছিল, যদিও তখনও আমি মোটা-সোটা বা স্থূলকায়া ছিলাম না। এখন আমার বাহু আর নিটোল নয়, এবং উপরের দিকে কাঁধের কাছে টিপলে নীচের হাড় হাতে লাগে। আমার কাঁধ আর সে-রকম সুডোল ও সুঠাম নেই। প্রতিদিন সকাল বেলা স্নানের সময়ে আমি নিজেকে দেখি। আমার কটিদেশ এখনও অতি সুন্দর, কিন্তু হাঁটুর কাছে পেশী গুলি যেন ফুটে উঠছে। আমার পা দুটি এখনও ভালো। সোজা কথা, আমার দেহ ভেঙে, আশার বাইরে চলে গিয়েছে। ওরে অভাগিনী, নিজের যত্ন কর। তা তো করি, ও আমার বুকের দুদিক পোড়াতে দিয়েছি, তাই এখন আরও অনেক মাস আমি নীচু জামা পরতে পারব না। আমাকে মাঝে মাঝে আরও বুক পোড়াতে হবে, নইলে আমি ঘুমতে পারব না। ভাল হবার আর কোনো আশা নেই। মনে হতে পারে—আমি বেশী নিরাশ হয়ে পড়ছি। তা নয়, তা নয়—এটা সোজা সত্য কথা মাত্র। পোড়ানো ছাড়া আমাকে আরও কত কি করতে হয়—সবই তো করি, কড্‌লিভার অয়েল, আর্সেনিক, ও ছাগীর দুধ। আমার জন্যে ছাগী কেনা হয়েছে।

'এতে আমি হয়ত আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু আমার শেষ অবস্থা এসে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি অত্যন্ত কষ্টে আছি। আমি মরব—কথাটা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু ভয়াবহ।'

কিন্তু এই সব লেখার পরেও মেয়েটি সেইদিনই ডায়ারীতে লিখিল,—

'জীবনে কত কিছু আগ্রহ করে নেবার আছে! ধর শুধু পড়াই।

'সবে আমি জোলার সমস্ত গ্রন্থাবলী আনিয়েছি, রেণাঁরও, তাছাড়া তেনের কয়েক খণ্ড। আমার কাছে মিশ্‌লের "ফরাসী বিপ্লবে"র চেয়ে তেনের "ফরাসী বিপ্লব" ভালো লাগে।

'মিশ্‌লে নিজেকে মহাপ্রাণ বলে দেখাতে চান, তবু তিনি ধোঁয়া-ধোঁয়া ও অস্পষ্ট। তেন পড়বার পর ফরাসী বিপ্লবকে আমার কাছে বেশী ভাল লেগেছে, যদিও সবাই বলে তেন শুধু ফরাসী বিপ্লবের খারাপ দিকগুলোই দেখিয়েছেন।*

'আর ছবি আঁকার কথা বলব কি? এ-অবস্থায় এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে, ভগবান আছেন ও তিনি যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যে।'

(এখানে বলা প্রয়োজন, যে-সব বই সে মৃত্যুর অল্পদিন আগে আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেগুলি তখন সারা ইউরোপে বাগ্‌বিতণ্ডার উপলক্ষ্য হইয়াছিল)।

ইহার পর মেয়েটির ডায়ারী হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের কথা উদ্ধৃত করিব। তাহার নানাদিকে সাফল্য ও খ্যাতিলাভ করিবার ইচ্ছা ছিল। সে-সব সম্ভব না-হওয়ায় সে চিত্রকলা শিখিয়াছিল, ও তাহাতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহার একটি ছবি বর্তমানে প্যারিসের লুক্‌সেম্বুর চিত্রশালায় আছে। আমি উহার একটি নকল আনাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এখনও পাই নাই। এই সময়ে একটি বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকরের সহিত তাহার প্রণয় হয়। সে তাহার চেয়ে বারো বৎসরের বড়, কিন্তু সেও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাহার নাম বাস্তিয়ঁ-লোপাজ্‌। তখন মারীও বাড়ী হইতে

---

* এই লেখকেরা কাঁরা যাহাতে এ-বিষয়ে ভুল না হয় সেজন্য নাম রোমান্‌ অক্ষরে দিতেছি।—(1) E. Zola, (2) E. Renan, (3) H. Taine, (4) J. Michelet.

মারী যেমন তেন ও মিশলের প্রভেদের কথা লিখিয়াছিল, তেমনি আমিও কুড়ি বৎসর বয়সে সে-বিষয়ে অবহিত ছিলাম। ১৯১৮ সনের জানুয়ারী মাসে বি.-এ পরীক্ষা দিবার আগে আমি কলেজের ঐতিহাসিক সমিতিতে পঠিত একটি প্রবন্ধে লিখি,

'Michelet and Taine will make us doubt whether any such event as the French Revolution took place, so that rational men could take such divergent views of one movement'. (১৯৮৭ সনে পুনঃপ্রকাশিত ইংরেজী সংস্করণে Autobiography of an Unknown Indian-এর ৩৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।')

বাহির হইতে পারে না, সে-ও প্রায় অচল। তাহার ছোট ভাই তাহাকে কোনোদিন চেয়ারে বসাইয়া, কোনোদিন কোলে করিয়া উপরের তলায় তাহার প্রণয়িনীর কাছে লইয়া আসিত। মারীর শয়নগৃহ তখন ড্রয়িং-রুমেই ছিল। মৃত্যুর পনর দিন আগে (১৬ই অক্টোবর ১৮৮৪ সন) সে তাহার ডায়ারীতে লিখিল—

'আমি তো একেবারেই বা'র হতে পারি নে। কিন্তু বেচারা বাস্তিয়ঁ-লোপাজ আমার কাছে আসে। তার ভাই তাকে কোলে করে এনে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়ে দেয়। আর একটা চেয়ার তার কাছে এনে দেওয়া হয়। আমি তাতে বসি। আমরা দুটিতে সন্ধ্যে পর্যন্ত এ-ভাবে থাকি।

'আজ আমি শাদা রং-এর নানা 'শেডে'র ভেলভেট্ ও লেসের জামা কাপড় মেঘের স্তূপের মত করে পরেছিলাম। আমাকে দেখে বাস্তিয়ঁ-লোপাজের দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, বললে, "আহা, আমি যদি শুধু এখনও আঁকতে পারতাম!"

'সমাপ্তি! বছরের শেষ ছবির সমাপ্তি!'

২০শে অক্টোবর তারিখেও বাস্তিয়ঁ ভাই-এর কোলে উঠিয়া দেখা করিতে আসিল—সেদিন মারী লিখিল—

'সে তো আর হাঁটতেও পারে না। কত দারোয়ানেরও স্বাস্থ্য কত ভালো হয়। এমিল (ভাই) আদর্শ ভাই। সে জুলকে (বাস্তিয়ঁকে) কাঁধে তুলে নীচে নিয়ে যায়।'

ইহার পর মারী আর লিখিতে পারে নাই। ৩১শে অক্টোবর তাহার মৃত্যু হয়। বাস্তিয়ঁ-লোপাজেরও মৃত্যু হয় একমাস দশদিন পরে ১৮৮৪ সনের ১০ই ডিসেম্বর।

আসল কথা বলিবার আগে মারীর রূপের কথাও বলিতে হয়। তার রূপ এক বিশিষ্ট ধরনের ছিল। মুখ চোখের শ্রী অপূর্ব, কিন্তু রং মুখেই হউক, কিংবা বক্ষেই হউক, কিম্বা বাহুতেই হউক মার্বেল পাথরের মত সাদা, অথচ চুল লালচে সোনালী গিনি সোনার রং-এর মত। চক্ষু দুইটি হইতে সর্বদা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে থাকিত। তাহার উপর নিজের রূপ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল। একদিনের ডায়ারীতে সে লিখিল যে, গির্জায় প্রার্থনা করিবার সময়ে সে জোড়হাত করিয়া ছিল, তখন হঠাৎ হাতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়াতে প্রার্থনায় মন বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তাই শাল দিয়া হাতটা ঢাকা দিয়া দিল।

১৮৭৪ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে, নীস্ শহরে আছে, ওর বয়স তখন চৌদ্দ বছর পূর্ণ হইতে মাস দুই বাকী, সে লিখিল—

'আমি ঘরে গিয়ে অতি সুন্দর ক'রে চুল বাঁধলুম—এম্পায়ার স্টাইলে। (যাঁহারা সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের খোঁপার ছবি দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন।) তারপর আমার সাদা গাউন পরলুম। গাউনটা

যেন বহমান, যেমন নাকি পাথরের মূর্তির থাকে। আস্তিন দুটো আমি গুটিয়ে কনুয়ের উপরে তুলে দিলুম। জামাটা পিঠের দিকে উঁচু করে কাটা, কিন্তু গলার দিকে নীচু, তাতে বুকের খানিকটা দেখা যায়, তার উপরে লেস এসে পড়েছে। গাউনের সব ঢিলে ভাঁজ আমি কোমরে ফিতে দিয়ে বাঁধলুম, আবার বুকের নীচেও দুটো সেলাই করা ফিতে দিয়ে বাঁধা হল মাঝখানে একটা সোজা গেরো দিয়ে। দস্তানা পরলুম না, কোনো গয়নাও নয়। নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। আমার দুটি শুভ্র বাহু সাদা পশমের জামার নীচে, ওঃ কি সাদা! আমি সত্যিই সুন্দরী। আমি প্রাণে উচ্ছ্বলিত! আমি কি সত্যিই নীসে আছি?' (অর্থাৎ প্যারিসে নেই কেন?)

কিন্তু যখন তাহার ষোল বৎসর বয়স, তখন এই বালিকাসুলভ রূপের গর্ব সম্বন্ধে লিখিল,

'যদি আমি সত্যিই নিজেকে যত সুন্দরী মনে করি আসলেও তত সুন্দরী হই, তবে লোকে আমাকে ভালবাসে না কেন? তারা শুধু চেয়ে থাকে! মনে হয় তারা ভাবে বিভোর হয়ে যায়। কিন্তু আমাকে ভালবাসে না। অথচ আমার জীবনের অতি বড় প্রয়োজনীয় জিনিষ যা, তা ভালবাসা পাওয়া।

'নভেল পড়ে পড়ে আমার মাথা বিগড়ে গিয়েছে। না, না, আগে থেকেই আমার মাথা বিগড়ে ছিল বলেই তো আমি এত নভেল পড়ি। আমি সব পুরোনো বই বার বার পড়ি। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ দুঃখের ব্যাপার, তবু আমি বই-এ কেবল ভালবাসার দৃশ্য ও ভালবাসার কথাবার্তা খুঁজে বার করি। আমি এইসব গিলে খাই কারণ আমাকে কেউ ভালবাসে না বলে। আমি নিজে ভালবাসি; সত্যিই তাই, কারণ আমার মনের অবস্থার অন্য কোনও নাম আমি দিতে পারিনে।'

কিন্তু তাহাকে ভালবাসিবে কে? কাহার এতটা সাহস হইবে? তাহার শিশুকালে মাতা পিতাকে ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং পিতা তাহাকে ষোল বছরেরটি হইবার আগে আর দেখেন নাই। তবে যখন দেখিলেন তখন এমনই মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে প্রথম দেখায় শুধু মুখ দেখাই নয়, চারিদিকে ঘুরিয়া ও ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে সকলের কাছে গিয়া বড়াই করিতে লাগিলেন।

মেয়েও বাপকে ছাড়িবার পাত্রী নয়। কয়েকদিন পরে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, এখন তুমি কার প্রেমে পড়ে আছো?' স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দুর্বলতার জন্যেই তাহার মাতাপিতার মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়াছিল। পিতা এই প্রশ্নে এত সঙ্কুচিত হইলেন যে, লজ্জায় লাল হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। পরে কন্যা আবার জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিলেন, 'বর্তমানে তোমার মার প্রেমে।' তরুণী কন্যাকে দেখিয়া তরুণী পত্নীর কথা স্মরণ হইয়াছিল।

পিতা উক্রাইনের পোলটাভা শহরে থাকিতেন। বড় জমিদার। কাছাকাছি তাঁহাদের অনেক আত্মীয় কুটুম্ব ছিল—কেহ প্রিন্স, কেহ কাউণ্ট ইত্যাদি। পিসা প্রিন্স, পিসি প্রিন্সেস্ ও পিস্তুত ভাইও রুশ প্রথা অনুযায়ী প্রিন্স। তাহার নাম 'পল্' ডাক নাম 'পাচা'। সে অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত ও সাবধানে মারীর সহিত পরিচয় করিতেছিল, এমন কি প্রথম দিন তেইশ বছর বয়স্ক হইলেও ষোল বছরের মামাতো বোনকে নাম ধরিয়া ডাকিতে ভরসা করে নাই, ডাকিয়াছিল রুশীয় সমাজে সম্মানের ডাকে অর্থাৎ 'মারিয়া কনস্টান্টিনোভনা' বলিয়া। কিন্তু মারী অত্যন্ত আপনার মত ব্যবহার করাতে সাহস করিয়া মারীর আদরের ডাকনাম 'মুসিয়া' ধরিয়াছিল। তবে মারী তাহাকে অল্প-বিস্তর ঠাট্টা-তামাসা করিতেও আরম্ভ করিল। উহার ফল কি হইল সে টের পাইল পিসির কথায়।

পিসি একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জীবনে চরম দুর্বুদ্ধির কাজ কি জানো ?'

মারী—'কি ?'

পিসি—'মুসিয়ার সঙ্গে প্রেমে পড়া।'

এটা কাহার কথা বুঝিতে পারিয়া মারী লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল।

এইবার প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। আমাদের গল্পে উপন্যাসে তেরো চৌদ্দ বছরের কিশোরীর মুখে যে সব কথা দেওয়া হইয়াছে ও যে আচরণ দেখানো হইয়াছে তাহা বাস্তব জীবনেও থাকিতে পারে তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই আমি মারী বাশকির্টসেফকে এই বই-এ টানিয়া আনিয়াছি। এখন দেখা যাক্ মারী সেই বয়সে অথবা উহার পূর্বেও কি বলিত ও কি করিত।

তারিখ ১৮৭২ সনের মার্চ মাস, মারীর বয়স বারো উত্তীর্ণ হইয়া আরও চার মাস হইয়াছে। সে ডায়ারীতে লিখিল—

> 'আমি ডিউক অফ্ হ্যামিল্টনকে ভালবাসি, কিন্তু তাঁকে বলতে পারিনে, যদিও বা বলি তা কি তিনি কানেও তুলবেন ?'

এখানে বলা প্রয়োজন, ডিউক অফ্ হ্যামিল্টন স্কটল্যাণ্ডের অতি প্রাচীন বংশের অতি ধনী জমিদার—এই ডিউক দ্বাদশ ডিউক। সে সময়ে তিনি যুবা ও অবিবাহিত, উপপত্নীকে লইয়া নীস্ শহরে আছেন। মারী আরও লিখিল—

> 'তিনি যখন এখানে ছিলেন তখন বাইরে যাবার ও সাজগোজ করার একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন ?...তাঁকে দেখতে পাবো, দূর থেকে হলেও, এই আশা করে আমি ছাতে গিয়ে দাঁড়ালুম।
>
> 'ভগবান্ ! আমার হৃদয়বেদনার উপশম করো। তোমার অনুগ্রহের সীমা নেই, তোমার দয়া অপরিসীম, তুমি আমার জন্যে এত করেছ ? তাঁকে সমুদ্রের ধারে বেড়াবার জায়গায় না দেখতে পেয়ে আমি এত যন্ত্রণা পাচ্ছি। নীসের ইতর লোকের ভিড়ের মধ্যে তাঁকে কি না অসাধারণ মনে হয়।'

তারপর ১৪ই মার্চ তারিখে লিখিল—

'আজ আবার ডিউক অফ হ্যামিল্টনকে দেখলুম। তাঁর মত চলবার-বসবার ভঙ্গী আর কারও নেই। গাড়ীতে তিনি যেন রাজার মতন বসে আছেন। আমি জি-কেও অনেকবার দেখেছি।' (জি—ডিউকের উপপত্নী।)

ইহার পর মারী এই মহিলার রূপ সম্বন্ধে লিখিল,

'ইনি চেহারায় যত না সুন্দর তার চেয়ে বেশী পোষাক-পরিচ্ছদে ...তাঁকে বড় ঘরের মেয়ে বলে ভুল হতে পারে।'

(বারো বৎসর বয়স্কা রুশ অভিজাত কন্যার 'মেহেরবাণী'!) ইঁহার গৃহসজ্জার প্রশংসা করিয়া লিখিল,

'এঁর মত গৃহস্থালীতে থাকলে আমাকে আরও অনেক বেশী ভাল দেখাবে। আমি আমার স্বামীকে নিয়ে সুখী হব, কারণ আমি নিজেকেও অবহেলা করব না। পরিচয় হবার প্রথম দিকে যেমন তাঁকে খুশী করতে চেয়েছিলাম, তেমনি পরেও খুশী রাখব। বলবো কি, আমি বুঝতেই পারিনে কেন একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ের আগে সর্বদাই খুশী রাখতে চেষ্টা করবে আর বিয়ের পর থেকেই উদাসীনতা দেখাবে। এ-কথা কেন মনে করা যে, বিয়ের সঙ্গেই আর সব ফুরিয়ে গেল, শুধু রইল শান্ত ঠান্ডা মাথার বন্ধুত্ব। কেন বিবাহের ধারণাকে এত নীচু করে আনা এই ছবিটা এঁকে যে, স্ত্রী ড্রেসিং-গাউন পরে, চুল কোঁকড়াবার কাগজ মাথায় গুঁজে, নাকে কোল্ড ক্রীম মেখে বসে আছে, আর স্বামীর কাছ থেকে গাউনের টাকা আদায় করবার তালে আছে। কেন কোনও নারী তখন নিজেকে কেমন দেখায় সে-বিষয়ে শৈথিল্য করবে সেই লোকটিরই বেলাতেই যাকে খুশী রাখাই তার সবচেয়ে বড় ভাবনা হওয়া উচিত? আমি তো বুঝতেই পারিনে স্ত্রী স্বামীকে কেন গৃহপালিত পশুর মত মনে করবে, যখন নাকি বিয়ের আগে এই লোকটিকেই সে মুগ্ধ করে রাখতে চাইত। কেন সে স্বামীকে হাস্যলাস্য লীলাখেলা দেখাবে না, তেমনই ভাবে যেমন নাকি অপরিচিত পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে আগে দেখিয়েছিল?'

এই সব কথা লেখার পর নয় মাস কাটিয়া গেল, মারীর বয়স হইল তেরো। তখন সে লিখিল,

'ভগবান! ওঁর চিন্তা যেন আমাকে ভেঙে ফেলছে। তিনি আমাকে কোনোদিন ভালবাসবেন না মনে করে আমি দুঃখে মরে যাচ্ছি। আমার কোনো আশাই নেই। আমি অসম্ভব জিনিসের আশা করে পাগল হয়ে যাচ্ছি। যে সৌন্দর্য আমার প্রাপ্যের বাইরে তা আমি চাইছি। ওঃ না, আমি তা মেনে নেবো না। আমি কেন নিরাশ হয়ে পড়ব? সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বর কি নেই? তিনি তো সর্বক্ষণ আমায় উপর চোখ

রাখছেন। তা সন্দেহ করবার স্পর্ধা আমার হবে কেন? তিনি কি আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করছেন না? তাঁর পক্ষে কিছুই তো অসম্ভব নয়।'

ইহার পর নয় মাস কাটিয়া গেল, চৌদ্দ হইতে তিনমাস বাকী। তখন লিখিল,

'এমন সব লোক আছে যারা বলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালবেসেও বাইরের লোকের সঙ্গে লীলাখেলা চালাতে পারে। এটা মিথ্যে কথা, কখনও পারে না। কোন যুবক-যুবতী যদি পরস্পরকে ভালবাসে, তারা কি অন্যের কথা ভাবতেও পারে? তারা ভালবাসে, তাই যতটা সুখ দরকার তারা পরস্পরের সংসর্গেই পায়। এই অবস্থায় অন্য স্ত্রীলোকের দিকে একটি বারও তাকানো, অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে একবারও ভাবা এরই প্রমাণ যে লোকটি আগে যাকে ভালবাসতো তাকে আর ভালবাসে না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করবো—তুমি যদি সত্যিই একটি স্ত্রীলোককে ভালবাসো, তুমি কি আর একজনকে ভালবাসার কল্পনাও করতে পারো?'

মারীর একটা অভ্যাস ছিল, কিছুদিন পরপর ডায়েরীতে আগে কি লিখিয়াছে তাহা পড়া ও তাহা বিবেচনা করা। তাই উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি তেরো বছর নয়মাস বয়সে লিখিবার পর চৌদ্দ বছর পাঁচ মাস বয়সে সেই পৃষ্ঠার পাশে এই মন্তব্য লিখিয়া রাখিল—

'সেই বয়সে আমি যা লিখেছিলুম তার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। কিন্তু তখন তো আমি ছেলেমানুষ বই আর কিছু ছিলাম না।'

সাড়ে চৌদ্দ বছরের মেয়ে সাড়ে তেরোর মত মেয়েকে ছেলেমানুষ বলিতেছে—তাও নিজের ঐ বয়সে, ইহার মধ্যে যেমন তামাশা আছে তেমনই মাধুর্যও আছে।

কিন্তু মারী যাঁহার উপর ভরসা রাখিয়াছিল সেই ভগবান তাহার কামনা পূর্ণ করিলেন না। যখন তাহার তেরো বছর পূর্ণ হইতে দিন কয়েক বাকী আছে, সে ঘরে বসিয়া দিনের পড়া শিখিতেছে তখন তাহার ইংরেজ গভর্নেস আসিয়া বলিলেন, 'তুমি শুনেছ কি ডিউক অফ্ হ্যামিলটন একজন ডাচেস্‌কে বিয়ে করছেন?' (আসলে ডাচেস্ নয়, এক ডিউকের মেয়েকে—ডিউক অফ ম্যাঞ্চেস্টারের মেয়ে—লেডী মেরী মণ্টেগুকে)।

মারী লিখিল,

'আমি বইটা মুখের কাছে ধরে রাখলাম, আমার মুখ যেন আগুনের মত জ্বলে উঠল। মনে হলো আমার বুকে যেন কেউ ছুরি বসিয়ে দিলে। আমি এত কাঁপতে লাগলাম যে দেখি বইটা আর ধরে রাখতে পারিনে। ভয় পেলাম মূর্ছা না যাই, বইটা আমাকে বাঁচালে।'

চারদিন পরে এই বিবাহ যে হইবে সেই সংবাদ খবরের কাগজে পাইল ও লিখিল,

'আমার আর দাড়াবার শক্তি রইল না। আমি বসে পড়ে খবরটা দশবার পড়লাম, নিশ্চিত হতে যে আমি স্বপ্ন দেখছিনে।'...

তারপর,

'সময় অবশ্য আসবে, যখন আমি ভুলে যাব। আমার দুঃখ চিরস্থায়ী হবে না। কোন জিনিষই চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু এটাও সত্য যে, বর্তমানে আমি আর কোনও চিন্তা করতে পারছি নে। এই বিয়ে নিশ্চয় তাঁর মার ষড়যন্ত্রে হচ্ছে। ....

'আমি আমার প্রতিদিনের প্রার্থনায় তাঁর যত উল্লেখ করতুম, সব বাদ দেবো। তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবার জন্যে আর আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো না। সবই তো শেষ হয়ে গেল। উঃ, আমি দেখতে পাচ্ছি নিজের ইচ্ছামত কারো কিছু হয় না। কিন্তু প্রার্থনার কথা বদলাতে আমার যা যন্ত্রণা হবে তার জন্যে আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। সংসারে এর চেয়ে কষ্টকর অনুভূতি আর কিছু হতে পারে না। সব কিছুরই অবসান হলো। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।'

অবশ্য তেরো বছরের মারীর শোক চিরস্থায়ী হয় নাই। সতেরো বছর বয়সে প্যারিসের রাস্তায় সে হঠাৎ ডিউক অফ্ হ্যামিল্টনকে দেখিল, ও পরে ডায়ারীতে লিখিল,—

'ভাল কথা, বলতে পারো আজ কাকে আমি শঁজ-এলিজেতে দেখলাম? আর কাকে? ডিউক অফ্ হ্যামিলটনকে, একটা গাড়ীতে একলা বসে। একদিনের রূপবান দোহারা গড়নের যুবক, যাঁর চুল তামাটে বাদামী রং-এর ছিল, ও যাঁর ঠোঁটের উপর ছোট্ট একটি গোঁফ ছিল, তিনি আজ একটি ঘোর লাল ইংরেজ হয়ে গিয়েছেন, তাঁর গাজরের রং-এর জুল্পি গালের মাঝখান অবধি নেমে এসেছে। মানুষ কিন্তু চার বছরেই বদলে যেতে পারে। এই দেখার আধঘন্টা পর থেকে আর আমি তাঁর কথা চিন্তা করলাম না।'

এরপর একটি প্রচলিত ল্যাটিন প্রবাদকে একটু বদল করিয়া লিখিল, 'Sic transit gloria ducis?' (এই ভাবে ডিউকের গরিমা বিলীন হইয়া যায়—ল্যাটিনে আছে gloria mundi—সংসারের গরিমা।)

তবে কুড়ি বৎসর বয়সে এই সব কথা আবার পড়িয়া সে মন্তব্য লিখিল,

'আমি এ-সব লিখেছিলাম একজনের সম্বন্ধে যাঁকে বার কুড়ি শুধু রাস্তায় চোখে দেখেছিলাম, যাঁর সঙ্গে আমার চেনাশোনা হয়নি, ও যিনি আমার অস্তিত্বের কথাও জানতেন না।'

তবে এটাও সে লিখিয়াছিল,

'আমি তখন তাঁকে সত্যিই ভালবেসেছিলুম। কিন্তু সেটা তাঁর রূপ, বংশমর্যাদা ও ধনসম্পদের জন্য।'

এই কাহিনী হইতে বুঝিতে পারা যাইবে একটা ইংরাজী প্রবাদ কত সত্য—

Fact is stranger than fiction.

মারীর ব্যাপার তাহার ডায়ারীতে লিপিবদ্ধ আছে। সেই ডায়ারীর বহ. খণ্ড সম্প্যূর্ণ ভাবে প্যারিসের বিব্লিয়োতেক নাসিয়োন্যালে রক্ষিত আছে। মারী লিখিয়াছিল—এই ডায়ারীই তাহার আসল জীবন—সত্যই তাই।

মারী সম্বন্ধে আমি এত কথা লিখিলাম এইটা দেখাইবার জন্য যে, আমাদের উপন্যাসে তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়ের যে-সব কথা ও আচরণের বিবরণ আছে, তাহা বাস্তব জীবনেও সম্ভব হইতে পারে। এখানে কিশোরী মারীর পাকামো ও পাগলপনাই দেখাইলাম, তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও মনীষার পরিচয় দিলাম না। তাহার ডায়ারী যখন আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয় তখন স্বয়ং গ্ল্যাড্স্টন তাহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি সেই প্রবন্ধ ও মারীর ডায়ারী প্রথম পড়ি ১৯১৬ সনে কলিকাতায় ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে, আর ভুলি নাই। এখন আমার নিজের আছে, ১৮৯২ সনে সুন্দর ভাবে বাঁধানো দুই খণ্ডে। আমাদের ছাত্রাবস্থায় ইউরোপীয় জীবন, ইতিহাস ও চিন্তাধারা জানিবার জন্য বিলাত যাওয়া দূরে থাকুক, দেশেও শ্বেতাঙ্গের সাহায্যের প্রয়োজন হইত না।

সম্বন্ধের বিবাহ ও উত্তররাগ

এইবার সম্বন্ধ করিয়া বিবাহের সহিত প্রেমের সমন্বয় কি করিয়া হইল তাহা বলি। বর্তমানে বিলাতী কাগজে কাগজে সম্বন্ধের বিবাহ লইয়া আলোচনা পড়া যায়। উহার সবটাই বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে এখনও সম্বন্ধ করিয়া পুত্র-কন্যার, বিশেষ করিয়া কন্যার, বিবাহের বিরোধী। বিলাতের লেখকেরা চান যে, বিলাত-প্রবাসী ভারতীয় তরুণীরা তাঁহাদের মেয়েদের মতনই হইবে, সুতরাং সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিলে তাঁহারা মনে করেন গোঁড়া হিন্দু বা মুসলমান পিতা-মাতা মেয়ের উপর অন্যায়-অত্যাচার করিতেছে। সুতরাং ভারতীয় পিতামাতার খুবই নিন্দা পড়া যায়।

এই সব নিন্দাবাদের উত্তরে কেহই বলেন না যে, বর্তমানে বিলাতে বা সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগতে 'লাভ-ম্যারেজের' যে গতি হইয়াছে, উহার তুলনায় সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ অনেক শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে এখনও বেশী বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াই হয়, তাহাতে বিবাহ ও বিবাহিত জীবনের এমন দুর্গতি হয় নাই যে, তাহাকে পাশ্চাত্ত্য বিবাহের তুলনায় অন্যায় বা নিকৃষ্ট বলা চলে।*

তবে আজকাল আমাদের দেশে যে-ভাবে সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ হইতেছে— অর্থাৎ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া কিংবা আকস্মিক যোগাযোগের ফলে— আমি এইরূপ সম্বন্ধের বিরোধী। আমি মনে করি যে আমাদের সমাজেও

* তবে ক্রমাগত এক 'লাভ-ম্যারেজ' ভাঙিয়া আর এক বা ততোধিক 'লাভ ম্যারেজ'কেই যদি বিবাহের চরম উন্নতি বলা হয়, তাহা হইলেও আমরা প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে শ্রেষ্ঠ ছিলাম। তখন একটি বাঙালী মেয়ে বলিয়াছিল—'বছর পনেরো-ষোল বয়স আমার/ ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার।'

যুবক-যুবতীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবার পর বিবাহের কথা হওয়া উচিত। কিন্তু আমার এই মত শুধু বর্তমান কালের প্রথা সম্বন্ধে। এখানে আমি যে সম্বন্ধের বিবাহের কথা বলিতেছি তাহা সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর আগেকার ব্যাপার। উহার ধারা অন্য রকম ছিল। উহাতেও সুখ-অসুখ দুই-ই হইত। তাহার রূপ কি ছিল, উহার আলোচনাও করিব।

কিন্তু সে-সব কথার আগে বিবাহে প্রেম সম্বন্ধে একটা সাধারণ তথ্য, যাহা সর্বকালে সকল দেশে দেখা যাইত, উহার অবতারণা করিব। আজকাল লোকেরা যখন সম্বন্ধ করিয়া বিবাহের সহিত প্রেমের ঝগড়ার কথা বলে, তখন তাহারা ভুলিয়া যায় যে, প্রেমের ঝগড়া শুধু সম্বন্ধ করিয়া বিবাহের সঙ্গেই নয়, বিবাহ-মাত্রেরই সঙ্গে। নহিলে সতীত্ব-অসতীত্ব লইয়া সমাজে সর্বকালে সর্বদেশে এত কথা বলা হইত না, এত নৈতিক উপদেশ থাকিত না, এত আইন-কানুনও হইত না। মনে রাখিতে হইবে ইংরেজ শাসনের আমলেও ভারতবর্ষে ব্যভিচার ইণ্ডিয়ান পীনাল কোডের অন্তর্ভুক্ত অপরাধ ছিল।

আমাদের ঋষিরাও স্ত্রীলোক স্বভাবতই সতী উহা বিশ্বাস করিতেন না, কখনও তাহা লেখেন নাই। বরঞ্চ সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে ও পুরাণে এই কথাই আছে যে, স্ত্রীলোকেরা পরিবার বা সমাজের শাসনে না থাকিলে স্বভাবতই অসতী হয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ঋষিরা এত কটু এমন কি অশ্লীল কথা লিখিয়াছেন যে, সেই সব উক্তি আজিকার দিনে উদ্ধৃত করা সঙ্কোচজনক, আমিও উদ্ধৃত করিব না। শুধু এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিব। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য ভাষা ব্যবহার না করিলে গালি পুরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।' অসতীত্ব সম্বন্ধে এই নিন্দার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, উহা স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ছিল, পুরুষ কামের বশে যাহাই করুক না কেন, উহার সম্বন্ধে কোনও কড়া-কড়ি ছিল না। উহার ভিতর পুরুষের দিকে একটা অপরিসীম ভণ্ডামি ছিল।

নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে যে-কথাটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক সত্য তাহা এই —প্রেম কখনই একমাত্র বিবাহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। উহা বিবাহের মধ্যে যেমন, তেমনই বিবাহের বাহিরেও থাকিতে পারে, এই কথাটাই সর্বকালে সর্বদেশে স্বাভাবিক বলিয়া মানা হইয়াছে। অন্ততপক্ষে যে-সমাজে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকেই নরনারীর প্রেমের সর্বোচ্চরূপ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, সে-সমাজের এই কথা বলিবার অধিকার নাই যে, বিবাহের বাহিরে প্রেম অন্যায় ব্যাপার। ইহার উপরেও একটা তামাশার ব্যাপার আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের আগে কৃষ্ণ ও গোপিনীদের প্রেমের বিস্তারিত বর্ণনা আছে, কিন্তু রাধার নাম কোথাও নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রথম রাধার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু উহাতে রাধা কৃষ্ণের পত্নী। পরবর্তীযুগে রাধাকে পরস্ত্রী (এমন কি

মামী) কেন করা হইল তাহার কারণ কেহই দেখান নাই, কেহ জানিতে চাহিয়াছেন বলিয়াও পড়ি নাই। একটা কারণ আমার মনে জাগিয়াছে তাহার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। যে-সব কবিরা রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী লিখিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন যে বিবাহের পর প্রেমের তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়, সুতরাং প্রেমকে সমান ভাবে ধারালো রাখিতে হইলে উহাকে বিবাহের বাহিরে লইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। হয়ত বা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে আরও ধারালো করিবার জন্য শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়কে শুধু পারদারিকতাই নয় গুর্বঙ্গনাগমনেও পরিণত করিতে হইয়াছিল।

এই সব কথা বলিলাম শুধু দেখাইবার জন্য যে, নরনারীর প্রেম বিবাহের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বালজাক তাঁহার একটি গল্পে প্রেমের সহিত বিবাহের সনাতন বিরোধের একটি যথার্থ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সে-গল্পের নায়ক চিত্রকর। একটি তরুণীকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে। মেয়েটির ভালবাসাও তেমনই, অথবা উহার অপেক্ষাও গভীর। কিন্তু সে বিবাহের কিছুদিন পর হইতেই স্বামীর উদাসীনতা লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল। পরে আবিষ্কার করিল উহার মূলে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা—একটি 'ডাচেস' আছেন। সে তাঁহার কাছে গিয়া স্বামীকে ফিরিয়া দিতে ভিক্ষা করিল।

তিনি তাহাকে উপদেশ হিসাবে বলিলেন, 'বেচারা নিরপরাধা মেয়ে! আমরা মেয়েরা যত ভালবাসি, তত বেশী—তাদেরকে কত ভালবাসি গোপন করতে হয়, বিশেষ করে সে যদি স্বামী হয় তার কাছে আরও বেশী। যে বেশী ভালবাসে তাকেই বেশী অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তার চেয়েও কষ্টকর ব্যাপার উদাসীনতা সহ্য করতে হয়। যদি সত্যই অধিকার রাখতে চাও তবে······'

মেয়েটি উত্তর দিল, 'ম্যাডাম, সর্বদাই কি করে লাভক্ষতির হিসেব করব, বিশ্বাসঘাতকতা করব, চরিত্রের কৃত্রিমতা দেখাবো? এ-ভাবে কি জীবন যাপন করা যায়? আপনি কি পারবেন···'

ডাচেস তখন হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'ভাই, দাম্পত্যসুখ সব সময়েই জুয়াখেলার মত। তা এমন একটা ব্যাপার যে বিশেষ লক্ষ্য রেখে বাঁচাতে হয়। আমি যখন তোমাকে বিয়ের কথা বলছি, তখন তুমি যদি ভালবাসার কথা বলতে থাকো, তাহলে আমিও আর তোমার কথা বুঝবো না, তুমিও আমার কথা বুঝবে না।···'

একমাত্র বালজাকই এ-রকম সত্য কথা এত স্পষ্ট ভাবে লিখিতে পারিতেন। আসল কথাটা এই যে, বিবাহ ভালবাসারই হউক, কিংবা সম্বন্ধেরই হউক, দুইটাতেই সুখ-দুঃখের সমান সম্ভাবনা। শুধু একটাতেই সুখ, অন্যটাতে নয়, এ-কথা কখনও বলা যায় না।

এখন বাঙালী সমাজের অবস্থার কথা ধরা যাক। আমাদের সমাজে তখনকার দিনে সম্বন্ধের বিবাহে অসুখ প্রধানত হইত বধূর রূপ না থাকিলে। পুত্র রূপসী বধূ চায়, পিতা বংশ বা টাকার খাতিরে রূপ-হীনার সহিত তাহার

বিবাহ দিতেন। রূপ সম্বন্ধে আপত্তি সে-যুগের পিতাদের বোধগম্যই হইত না। তাঁহারা মনে মনে বলিতেন, 'তোকে কে রূপের পেছনে যেতে মানা করছে। তা চাস্ তো বেশ্যা-বাড়ী আছে, পরস্ত্রী আছে, এমন কি ঘরেও বৌদিদিরা আছে। তাদের নিয়ে যা কিছু কর না, আমি কি তা দেখতে যাচ্ছি?' আমি কলকাতার একটি বিখ্যাত পরিবার সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছি, খাজাঞ্চী কর্তার হুকুম মত হিসাবে লিখিত 'ছোটবাবুর বাবদে ফরাসডাঙ্গার জরী পাড়ের শাড়ীর জন্যে ২০ টাকা।' আরও গল্প পরে বলিব।

কিন্তু যে-সকল আধুনিক যুবক সমস্ত প্রাচীন প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া বধূ সুন্দরী না হইলে মনে কষ্ট পাইত, তাহাদের কষ্ট ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না।

এই সব দুর্বল-চরিত্র যুবকদের চেয়েও অবশ্য কষ্ট বেশী হইত নিরপরাধা রূপহীনা বধূর। ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত আমি নিজের জানা ব্যাপার হইতে দিতেছি। আমার পিতার মামাতো ভাইদের মধ্যে একজন অত্যন্ত গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয় একটি শ্যামাঙ্গিনী মেয়ের সঙ্গে। আমি আমার সেই কাকীমাকে দেখিয়াছি। তিনি ফরসা না হইলেও মুখশ্রীতে মোটেই কুরূপা ছিলেন না। কিন্তু আমার কাকা বিবাহের রাত্রির পর আর তাঁহার মুখ দেখেন নাই। আমি যখন এই কাকীমাকে দেখি তখন আমি বালক, তবু আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে হইলে কষ্ট পাইতাম।

আর একটি ব্যাপার আমার বৃদ্ধ বয়সের। আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট কিন্তু বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ১৯৪২-৪৩ সন নাগাদ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। পিতাই বিবাহ দিয়াছিলেন। রূপহীনা বলিয়া আমার এই বন্ধুও স্ত্রীর সহিত স্বামীর মত আচরণ করেন নাই। এক বাড়ীতে থাকিয়াও নিঃসম্পর্কিতের মত দুজনে থাকিতেন। অথচ অন্য সবদিকে এই বন্ধুর উদারতা ও সজ্জনতার কোনো অভাব আমি কখনও দেখি নাই। কিন্তু রূপ সম্বন্ধে তাঁহার একটা দুর্নিবার মোহ ছিল।

আমি ১৯৭০ সনে বিলাত চলিয়া আসিবার কিছুদিন আগে তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি তো দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার সময়ে নিতান্ত অল্প বয়সের ছিলেন না। যদি রূপ চেয়েছিলেন, তবে এ-বিয়েতে রাজী হলেন কেন?' তিনি অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, 'নীরদবাবু! আমরা তো কখনও আপনার মত "না" বলতে শিখিনি।' তাঁহার পিতা বিদ্বান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। সেই পরিবারে এ-যুগেও 'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম, পিতা হি পরমন্তপঃ……' এই উক্তি মানা হইত।

কিন্তু আজিকার দিনে এই কথাটা আশ্চর্য বলিয়া মনে হইবে যে, এই দুই ক্ষেত্রে পত্নীরা কখনও স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই; নিজেদের দুঃখের কথাও বলেন নাই। আমার মা আমার কাকীমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, কখনও এই ধরনের উক্তি শোনেন নাই। আমার স্ত্রীও আমার

বন্ধুর পত্নীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিতেন, তিনিও এই উপেক্ষিতার মুখে কোনও দুঃখের কাহিনী শোনেন নাই। আমি জানি কেন—আমাদের সমাজের উপেক্ষিতারা নারীত্বের গৌরব ও সম্মান যে-ভাবে রক্ষা করিতেন, বর্তমান কালের পাশ্চাত্ত্য জগতের মেয়েরা তাহার অনুকরণও করিতে পারে না। তাঁহারা হয়ত মনে করিতেন—ভগবান যখন রূপ না দিয়া তাঁহাদের জীবনের সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তখন আবার কাঁদুনি গাহিয়া নারীত্বের আরও অবমাননা কেন করি!

সম্বন্ধের বিবাহে মেয়েদের যে দুঃখ হইত তাহার আরও কিছু দৃষ্টান্ত দিব। বাঙালী সমাজে তখনকার দিনে এই ধরনের বিবাহে মেয়েদের দুঃখ প্রধানত হইত বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিলে। আমি ইহার আভাস নিজেও পাইয়াছি। কখনও কখনও শুনিয়াছি, মাতা বা প্রবীণা আত্মীয়া বলিতেছেন, 'মেয়ের মুখ ভার। বর পছন্দ হয়নি।' বৃদ্ধ বরের সহিত বিবাহ দিলে, মেয়ের অদৃষ্ট সম্বন্ধে বিলাপ প্রাচীনারা সেকালে বিবাহের সভাতে গ্রাম্যসুরে গান গাহিয়া করিত। গানটি এইরূপ—

'তাল শাঁস কাটমু, বাঁশের বাটমু
আমারদিগের ঝি!
তোমার কপালে বুড়া বর
আমরা করব কি?'

শরৎচন্দ্রও তাঁহার একটি গল্পে বৃদ্ধের সহিত বিবাহের প্রসঙ্গে একটি গৃহিণীকে দিয়া বলাইয়াছেন,

'গিরীশ ভট্‌চায্যির মেয়ের বিয়ে চোখের উপর দেখে হাত-পা যেন পেটের ভেতর ঢুকে গেছে! ঠিক আমাদের মতই—না ছিল তার টাকার বল, না ছিল মেয়ের রূপ—তাই পাত্রের বয়সও গেল ষাটের কাছাকাছি। তার মায়ের কান্নাটা আমি আজও যেন কানে শুনতে পাচ্ছি।......'

'সে মেয়ে যদি ঘেন্নায় বিষ খায়, কি গলায় দড়ি দেয়, কিংবা কুলে কালি দিয়ে চলে যায়—মা হয়ে তাকে বুকের ভেতর থেকে অভিশাপ দিই কেমন করে?'

এই প্রসঙ্গে আমার বাল্যকালে জানা একটা মর্মান্তিক সত্য ঘটনার কথা বলি। একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়ের অর্থাভাবের জন্যে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ ঠিক হয়। কিন্তু এই মেয়েটি বাঁকিয়া বসিল, বলিল, 'আমি এই বিয়ে করবো না।' সুতরাং এই সম্বন্ধ ভাঙিতে হইল। পরে মেয়েটির একটি যুবকের সঙ্গে বিবাহ হইল বটে, কিন্তু সে বছর দুই-এর মধ্যে বিধবা হইল। তখন সে একদিন পুকুর-ধারে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, বৃদ্ধ নিকটে রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিল। তাহার রাগ তখনও পড়ে নাই, সে মেয়েটির কাছে গিয়া বলিল, 'কি লো, আমি তো এখনও মরিনি, তোর সিঁথির সিঁদুর তো ঘুচেছে।' দুঃখের বিষয় বুড়াকে ধরিয়া মার দিবার

মত কেউ সেখানে ছিল না।

ইহার পর সম্বন্ধের বিবাহে সুখের কথা বলি। এই বিবাহে সুখ, বাল্যবিবাহ যখন প্রাচীন ধরনের ছিল, তখনও যে ছিল না তাহা মোটেই নয়। কিন্তু তাহার সুখ স্থির জলের মত হইত, নদীর মত হইত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দুইটি গল্পে এইরূপ বিবাহে দাম্পত্য প্রেমের অতি যথার্থ বিবরণ দিয়াছেন। উহার একটি ১৮৯৩ সনে প্রকাশিত 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে, অপরটি ১৮৯৫ সনে প্রকাশিত 'নিশীথে' গল্পে। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের নায়ক নিবারণচন্দ্র প্রৌঢ়, 'নিশীথে' গল্পের নায়ক দক্ষিণাবাবুর বয়সও ত্রিশের কম নয় হয়ত কিছু বেশী। সুতরাং দুইজনেরই বিবাহ বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত প্রেমের জোয়ার আসিবার আগেই হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৮৬৫ সনের পূর্বে। এই দুই জনেরই পত্নী সতীসাধ্বী, স্বামী অনুরাগিণী, স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রেমের রূপ কি ধরনের ছিল তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কথাতেই দিব।

নিবারণচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন,

> 'সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভালবাসিত, কিন্তু কখনই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।
>
> 'একেবারে পাকা আমের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই।.........'

(এখানে একটা শব্দের পরিবর্তন করিয়াছি।)

দক্ষিণাচরণকে দিয়া রবীন্দ্রনাথ বলাইলেন,

> 'আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিনী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশী ছিল না; সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিনীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত,—
>
> "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
> প্রিয়া শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"
>
> 'কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিতকলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয় সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত।'

কিন্তু দুই স্নেহময়ী পত্নীরই সর্বনাশ ঘটিল যখন দুই স্বামীই বঙ্কিম-প্রবর্তিত প্রেমের সম্মুখীন হইল। বঙ্কিমচন্দ্রই যে এই অশান্তির মূলে তাহা

রবীন্দ্রনাথও চাপা দেন নাই। তিনি লিখিলেন,

> 'তখন বালিকা শৈলবালার (দ্বিতীয়া পত্নীর) ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, সই।
>
> 'লোকটা ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর "চন্দ্রশেখর" পড়িয়া ফেলিয়াছে।' ('চন্দ্রশেখর' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সনে।)

কিন্তু আমি যে-সম্বন্ধের বিবাহের কথা বলিতে চাহিতেছি তাহা এ-সব ঘটনার পরেকার, তখন বঙ্কিম প্রবর্তিত প্রেম দাম্পত্যজীবনের সর্বোপরি কাম্য জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহের পর এই 'রোমাণ্টিক' প্রেমকে আনিবার জন্যও যে, বাঙালী মেয়ের বয়স তেরো বা চৌদ্দ করিতে হইল, এবং এই নূতন বয়সও যে ইউরোপ হইতেই আসিয়াছিল তাহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি। অবশ্য বাঙালী হিন্দু মেয়ের বিবাহের বয়স তখনও চৌদ্দর উপরে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সেটা সামাজিক আচারের জন্য। শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' গল্পের জ্ঞানদা সবে তেরো বছরে পা দিয়াছে, সে সময়ে তাহার মামা উহাকে প্রথম দেখিবার পর বিবাহ হয় নাই জানিয়া বলিয়া উঠিল, 'এ যে একটা সোমত্ত মাগী রে দুর্গা'……তা আমি বলি কি, ওকে হেঁসেলে-টেসেলে ঠাকুরঘর-দোরে ঢুকতে দিয়ে কাজ নেই। জানিস ত এদেশের সমাজ। বিশেষ হরিপাল—এমন পাজী জায়গা কি ভূভারতে আছে?'

আমি যখন কলিকাতায় স্কুলে পড়ি তখন আমার দুই-তিনটি সমপাঠীর বাড়ী ছিল হরিপালে। এই গ্রামের যে এরূপ খ্যাতি আছে তাহা আমি জানিতাম না। মনে রাখিতে হইবে 'অরক্ষণীয়া' গল্প প্রকাশের তারিখ ১৯১৬ সন।

আবার বিবাহকে 'রোমাণ্টিক' প্রেমের সহিত যুক্ত করিতে হইলে বয়সকেও বারো-তেরোর নীচে নামানো সম্ভব ছিল না। প্রেমের বীজ বুনিতে হইলেও দৈহিক উপযোগিতার প্রয়োজন হয়, ফুল ফুটাইবার তো কথাই নাই। দৈহিক উপযোগিতা হইবার পূর্বে প্রেমালাপের চেষ্টা করিলে যে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহার একটি অতি সুন্দর বিবরণ প্রভাতকুমার তাঁহার 'প্রণয়-পরিণাম' গল্পে দিয়াছেন। কুসুমের বয়স সবে দশ পূর্ণ হইয়াছে, মাণিকলাল তাহার সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হইয়া একদিন এই ভাষায় প্রণয় নিবেদন করিল,—

> "দেখ কুসুম, অনেকদিন থেকে একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি। তুমি আমায় বিয়ে করবে?"
>
> 'প্রথম কথাটার মানে কুসুম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু ঐ কথাতেই সব মাটি হইয়া গেল।—"ধেৎ"—বলিয়া মাণিকের হাত ছাড়াইয়া কুসুম ছুটিয়া পলাইয়া গেল।'

কুসুমের নিজের মুখে এই প্রেমালাপ যে-ভাষায় পরে বর্ণিত হইল তাহা দৈহিক উপযোগিতা হইবার আগে প্রেম সম্বন্ধে কথাবার্তা যে-ভাষায় হওয়া উচিত সেই ভাষাতেই হইল—অর্থাৎ কুসুম তাহার মাতাকে বলিল, 'একদিন

বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে ম্যান্‌কা আমায় বল্‌লে কি, তোকে আমি আম পেড়ে দেবো, তুই আমায় বিয়ে করবি ? "দূর পোড়ারমুখো" বলে আমি পালিয়ে এলাম।'

কুসুমের বয়স তেরো-চৌদ্দ হইলে তাহার মুখ হইতে এইরূপ ভাষা বাহির হইত না। এই বয়সের মেয়েরা কি বলিতে পারিত, বা বলিত তাহার কথা আগেই বলিয়াছি।

কিন্তু বয়স চৌদ্দ করিলেই যে, সেই বয়সেই প্রেমের আবির্ভাব বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই গল্পে দেখানো যাইবে, এমন কি জীবনেও সম্ভব হইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। দৈহিক মিলন শুধু দৈহিক প্রবৃত্তি হইতে ঘটা সম্ভব, কিন্তু দৈহিক মিলনের সহিত প্রেমের যে সম্পর্ক তাহার পূর্ণ বিকাশের পূর্বে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি ভালবাসাও বিকশিত হইবার প্রয়োজন আছে। সেই ভালবাসা সময়সাপেক্ষ, অন্ততপক্ষে উহার পূর্ণ প্রকাশ সময়সাপেক্ষ, সুতরাং ভালবাসা হইতে দেহসমর্পণের যে আবেগ আসে তাহাও সময়সাপেক্ষ। উহার পূর্বে দৈহিক পরিণতির সুযোগ নিলে ভালবাসা অনেক সময়েই কুঁড়ি থাকা অবস্থাতেই শুকাইয়া যায়। এই কথা মনে রাখিয়া নূতন যুগের যুবকেরা বিবাহ হইবার পরই পত্নীর দেহ উপভোগ করাকে অন্যায় বলিয়া মনে করিত। এই ধারণা হইতে, অল্প হউক বা বেশী হউক, কিছুকাল উত্তররাগের জন্য রাখিত। উহা বিবাহের আগেকার পূর্ব রাগের মত ছিল।

উহার মূলে ছিল একটা নূতন মনোভাব, দেহের প্রতি শ্রদ্ধা। অর্বাচীন হিন্দু সমাজে, অর্থাৎ প্রাগ্‌ব্রিটিশযুগের 'প্রথাগত হিন্দু সমাজে' এই শ্রদ্ধাটা ছিল না বলিলেই চলে। তাই বাল্য-বিবাহের পর দৈহিক পরিণতি হইবার পূর্ব পর্যন্ত বালিকাদের কোথাও কোথাও বাপের বাড়ীতেই রাখার প্রথা ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা পাইবার পর বাঙালী যুবকদের মধ্যে দেহের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল। তাহার বশে উহারা নিজেকে সংযত রাখিয়া কিশোরী পত্নীর মানসিক বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল।

নূতন যুগের গল্প-উপন্যাসে তরুণীদের মধ্যেও দেহ সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঞ্চার দেখান হইয়াছে। এইরূপ কাহিনীতে পড়া যায় যে, দৈবক্রমে যদি কোনও যুবক কোনও তরুণীর দেহ স্পর্শ মাত্রও করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই যুবকের প্রতি ভালবাসার উন্মেষ মাত্র থাকিলেও তরুণী মনে করিয়াছে যে সে বিবাহিত—অন্য কেহ তাহার দেহ স্পর্শ করিলেও উহা ব্যভিচার হইবে। উহার একটি দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের "দত্তা" উপন্যাস হইতে দিতেছি।

বিজয়া নরেন্দ্রকে নরেন্দ্র বলিয়া না জানিয়াও ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, যদিও নিজে বুঝিতে পারে নাই ; পরিচয় হইবার পর তো কথাই নাই। তখন পর্যন্ত নরেন্দ্র যে বিজয়াকে ভালবাসিয়াছে তাহার আভাসও নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কথায় বলিতে গেলে, 'এই কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত বৈজ্ঞানিক চক্ষের নিমেষে এক বিষম কাণ্ড করিয়া বসিল। অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া বিজয়ার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি আপনি কাঁদচেন ?"

বিদ্যুদ্বেগে বিজয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল।'

কিন্তু তাহার পর বিজয়ার মনোভাব কি হইল, নরেন্দ্র তাহাকে ভালবাসে কি বাসে না, উহার অপেক্ষামাত্র না রাখিয়া কি হইল, তাহার বিবরণ শরৎচন্দ্র এই ভাবে দিলেন,—

> 'এমন একদিন ছিল, যখন বিলাসের হাতে আত্মসমর্পণ করা বিজয়ার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। কিন্তু আজ শুধু বিলাস কেন, এত কোটি লোকের মধ্যে কেবল একটি মাত্র লোক ছাড়া আর কেহ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে ভাবিলেও তাহার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় এবং কি একটা গভীর পাপের ভয়ে ত্রস্ত সশঙ্কিত হইয়া উঠে।'*

শরৎচন্দ্রই তাঁহার অতি অল্প বয়সে লেখা একটি গল্পে একটি তরুণীর উল্টা অনুভূতির বিবরণ দিয়াছেন। এই গল্পটি একটি আশ্চর্য রচনা, উহার পরিচয় পরে দিব। এখানে শুধু যে-প্রসঙ্গ তুলিয়াছি, উহার বিস্তারের জন্য খানিকটা উদ্ধৃত করিব।

একটি রূপসী তরুণী বিবাহিতা কিন্তু বাল্যকাল হইতেই বিধবা— অবস্থাচক্রে এক জমিদারের উপপত্নী হইয়াছে। জমিদার তাহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। মেয়েটি—উহার ছদ্মনাম মালতী—স্বীকার পাইতেছে না। প্রণয়ী—নাম সুরেন্দ্র—কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কি কথাবার্তা হইল তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

'মালতী। "বিবাহ হইতে পারে না।"

'সুরেন্দ্র। "কেন, বিধবাকে কি বিবাহ করিতে নাই?"

'মা। "বিধবাকে বিবাহ করিতে আছে। কিন্তু বেশ্যাকে নাই।"

'সুরেন্দ্রনাথের সহসা সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—"তুমি কি তাই?"

'মা। "নয় কি? নিজেই ভাবিয়া দেখ দেখি?"

'সু। "ছি ছি! ও-কথা মুখে আনিও না। তোমাকে কত ভালবাসি।"

'মা। "সেই জন্যই মুখে আনিলাম; না হইলে হয়ত বিবাহ করিতেও সম্মত হইতাম।"

'সু। "মালতী!"

'মা। "কি?"

'সু। "সব কথা খুলিয়া বলিবে?"

'মা। "বলিব। তুমি ভিন্ন আমার দেহ পূর্বে কেহ কখনও স্পর্শ করে নাই, কিন্তু একজনকে মনপ্রাণ সমস্তই মনে মনে দিয়াছিলাম।"

'সু। "তারপর?"

* রজনী কিরূপ অন্ধ উহা দেখিবার জন্যে শচীন্দ্র তাহার চিবুক ধরিয়া নিজের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। রজনী লিখিল: ডাক্তারির কপালে আগুন জেলে দিই। সেই চিবুকস্পর্শে আমি মরিলাম।'

'মা "আমাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক সাধিয়াছিলাম।"
'সু "তারপর ?"
'মা "জাতি যাইবার ভয়ে সে আমাকে বিবাহ করিল না।"
'সু "সে মনপ্রাণ ফিরাইয়া লইলে কিরূপ ?"
'মা "সে যেরূপে ফিরাইয়া দিল।"
'সু "পারিলে ?"
'মালতী একটু মৌন থাকিয়া কহিল, "পূর্বেই বলিয়াছি, আমি বেশ্যা—বেশ্যা সব পারে।"

শরৎচন্দ্র বাইশ বৎসর বয়সে এই উপন্যাসটি লেখেন। আমি বুঝিতে পারি না, কি করিয়া লিখিলেন। তবে প্রতিভা যুক্তিগোচর নয়, উহার সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতা যুক্তি দিয়া বোঝা যায় না।

মালতীর ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সে আর একজনকে পূর্বে ভালবাসিয়া সুরেন্দ্রকে দেহস্পর্শ করিতে দিয়াছে—শুধু এই কারণেই নিজেকে বেশ্যা মনে করিতেছে, অথচ আগেকার ভালবাসা শুধু মনেই ছিল, এখন সে নিজেও সুরেন্দ্রকে ভালবাসে। তবু, তবু—নরনারীর সম্পর্কে দৈহিক স্পর্শ লোকোত্তর ব্যাপার অবশ্য সত্যকার ভালবাসা থাকিলে।

নবযুগে বাঙালী যুবকেরা যে বিবাহিত পত্নী হইলেও ভালবাসা পূর্ণ-বিকশিত হইবার পূর্বে, পত্নী ভালবাসিয়া দেহ সমর্পণ করিতে উদ্যোগিনী না হওয়া পর্যন্ত, নিজেকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করিত, উহার প্রমাণ দিবার জন্য এত কথা বলিলাম। দেহের প্রতি শ্রদ্ধার বশে দৈহিক মিলন স্থগিত রাখিবার দুইটি দৃষ্টান্ত সত্যকার ঘটনা হইতে দিতেছি। আমার মাতার বিবাহ হয় ১৮৮৭ সনে। তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ (সম্ভবত আমাদের হিসাব মত তেরো পূর্ণ করিয়া চৌদ্দতে পা দিয়াছিলেন, চৌদ্দ পূর্ণ হয় নাই)। কিন্তু তাঁহার প্রথম সন্তান হয় ১৮৯২ সনে। আমার শাশুড়ী ঠাকুরানীর বিবাহ হয় ১৮৯৭ সনে, আমার মায়েরই বয়সে তাঁহারও প্রথম সন্তান হয় ১৯০১ সনে। মনে রাখিতে হইবে, তখন সন্তান জন্ম নিবারণের কৃত্রিম উপায় ছিল না, আমাদের দেশে উহার ধারণাও ছিল না। ১৯৬৫ সনে একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক আমাকে পত্রে জানান যে, বিবাহের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে তিনি পত্নীর সহিত সহবাস করেন। ব্যাপারটা ঘটিতে পারিত শুধু দেহ সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছি তাহা হইতে।

কিন্তু উত্তররাগ যতই উচিত মনে করা হউক না কেন, কার্যত স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে তরুণবয়স্ক হইবার পর উহা চালাইয়া যাওয়া সহজ ছিল না। এমন কি পূর্বরাগেও এই আত্মসংযম চেষ্টার ব্যাপার হইতে পারিত। বর্তমান কালে পাশ্চাত্ত্য জগতে তো এই সংযম বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং বিবাহের পূর্বে এমন কি বিবাহের উদ্দেশ্য না রাখিয়াও কুমারী অবস্থায় মেয়েদের দৈহিক মিলন এমন সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এইসব মেয়েদের কেহ আমাদের প্রাচীন 'ইয়ঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরঃ' এই কবিতাটি আওড়াইলে উহার লাঞ্ছনা করা

হইল মনে করিতে হইবে। তবু সাধারণত সে-যুগের বাঙালী যুবক ও তরুণীরা যে নিজেদের সম্বরণ করিতে পারিত তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

এই বিরহ যে ভালবাসাকে পূর্ণতা ও উচ্ছলতা দিত তাহাতে সন্দেহ নাই। বিরহের যন্ত্রণা সহ্য করার ফলে পরিণামে সুখের কথা বঙ্কিমচন্দ্র যে-ভাবে বলিয়াছেন আর কেহ তেমন পারে নাই। তাঁহার 'ইন্দিরা' উপন্যাস আগাগোড়া পরিবর্তন ও বৃদ্ধি করিয়া তিনি প্রকাশিত করেন ১৮৯৩ সনে। সুতরাং উহাকে তাঁহার শেষ রচনা বলা যাইতে পারে। উহা তাঁহার সব চেয়ে পরিণত রচনা, এমন কি আমার মনে হয় যে, ভাষার সাবলীল সৌন্দর্য ও ভাববিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় এই গল্পটি তাঁহার নিজেরও অন্যান্য গল্পের উপরে।

সে যাহাই হউক, উহাতে উত্তররাগের যন্ত্রণা ও উহার অবসানে যে সুখ হয় তাহার অপূর্ব বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরার মুখে দিয়াছেন। ইন্দিরার বয়স উনিশ বৎসর, তবুও—এমন কি আপাতদৃষ্টিতে কুলটা হইলেও, সে স্বামীকে আট দিনের জন্য প্রণয়ের উপভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এই কয়দিন নিজের মনের অবস্থার কথা সে বলিতেছে,—

> 'আমি আপনার হাসি-চাহনির ফাঁদে পরকে ধরিতে গিয়া, পরকেও ধরিলাম, আপনিও ধরা পড়িলাম। আগুন ছড়াইতে গিয়া, পরকেও পোড়াইলাম, আপনিও পুড়িলাম! হোলির দিনে, আবীর খেলার মত, পরকে রাঙ্গা করিতে গিয়া, আপনি অনুরাগে রাঙ্গা হইয়া গেলাম।……
>
> 'আমি হাসিতে জানি, হাসির কি উতোর নাই? আমি চাহিতে জানি, চাহনির কি পালটা চাহনি নাই? আমার অধরোষ্ঠ দূর হইতে চুম্বনাকাঙ্ক্ষায় ফুলিয়া থাকে, ফুলের কুঁড়ি পাপড়ি খুলিয়া ফুটিয়া থাকে, তাঁহার প্রফুল্ল রক্তপুষ্প-তুল্য কোমল অধরোষ্ঠ কি তেমনি করিয়া, ফুটিয়া উঠিয়া, পাপড়ি খুলিয়া আমার দিকে ফিরিতে জানে না? আমি যদি তাঁর হাসিতে, তাঁর চাহনিতে, তাঁর চুম্বনাকাঙ্ক্ষায় এতটুকু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম, তবে আমিই জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরোষ্ঠ বিস্ফুরণে কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা। কাজেই আমি হারিলাম। হারিয়া স্বীকার করিলাম যে, ইহাই পৃথিবীর যোল আনা সুখ। যে দেবতা, ইহার সহিত দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে, খুব হইয়াছে।……পরীক্ষা ফাঁসিয়া গেল। অষ্টাহ অতীত হইলে, বিনা বাক্যব্যয়ে উভয়ে উভয়ের অধীন হইলাম। তিনি আমায় কুলটা বলিয়া জানিলেন। তাহাও সহ্য করিলাম।'

একশত বৎসর আগেকার, প্রথানুবর্তী ও দেশাচারের অধীন বাঙালী পরিবারের কাহিনী বলিতে গিয়া উনিশ বৎসরের বাঙালী মেয়ের মুখে এইসব

কথা দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইতে পারিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বোঝা যাইবে ইউরোপীয় রোমান্টিক ভাব কি প্রচণ্ডবেগে বাঙালীর মনকে নাড়া দিয়াছিল। ইহাকে কখনও কখনও দোটানা বলা হইত, কিন্তু উহা দোটানা নয়—প্রবল বন্যার মুখে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত।

কিন্তু এখানে একটা স্বগত উক্তি করিবার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা' উপন্যাসের ঘটনাকে ১৮৫১-৫২ সনে উপস্থাপিত করিয়াছেন, কারণ ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্র পঞ্জাবে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে উপস্থিত ছিল; কমিসারিয়েটে যখন কাজ করিত তখন পঞ্জাবের দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয়ই টাকাও করিতে পারে নাই, দেশেও ফিরে নাই; তার পরও ফিরিতে বৎসর দুই দেরী হইতে পারিত। সে-সময়ে কোনও বাঙালী স্ত্রী বা পুরুষের মনোভাব এরূপ হইতে পারিত না। উহা ১৮৮০-১৮৯০ সনের মানসিক অবস্থা।

সে যাহাই হউক, ১৮৯৩ সনে বঙ্কিমচন্দ্র এ-সব উক্তি বিশ্বাস করাইতে পারিয়াছিলেন। ইন্দিরা উপন্যাসের গোড়াতে গল্পটির মূল সূত্র, ধরাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শেলীর ১৮২১ সনে প্রকাশিত 'Song' নামে কবিতাটির নিম্নের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—

'Rarely, rarely comest thou,
Spirit of Delight !
Wherefore hast thou left me now
Many a day and night ?
Many a weary night and day !
'Tis since thou art fled away.

'How shall ever one like me
Win thee back again ?
With the joyous and the free
Thou wilt scoff at pain
Spirit false ! thou hast forgot
All but those who need thee not.

* * *

'Let me set my mournful ditty
To a merry measure ;—
Thou wilt never come for pity,
Thou wilt come for pleasure.
Pity then will cut away
Those cruel wings, and thou wilt stay.

* * *

'Thou art love and life ! Oh Come,
Make once more my heart thy home.'

এই কবিতাটির সহিত ইন্দিরার কাহিনীর সমধর্মিতা বোঝা সহজ নয়, উহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাটির যে-সব অংশ বাদ দিয়া যে-টুকু উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, এ-দুয়ের তুলনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অনুভূতির যে তীব্রতা ছিল তাহা বুঝিয়াছি। অথচ বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আজিকার দিনের একটি বিখ্যাত পণ্ডিত 'ইন্দিরা' উপন্যাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, গল্পটি তুচ্ছ, নায়িকার বাচালতায় আরও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। এ-কথা একমাত্র বাঙালী পণ্ডিতের মুখেই শোনা সম্ভব। শেলী যে দুঃখ করিয়া 'Spirit of Delight' সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'Thou hast forgot all but those who need thee not,' উহা বঙ্কিমের রচনা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—বঙ্কিম ! তুমি একমাত্র আছ তাহাদের জন্য যাহাদের 'ঋষি বঙ্কিম' ভিন্ন অন্য কোনও বঙ্কিমের প্রয়োজন নাই। আমি প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়স হইতে বঙ্কিমের উপন্যাস ভাল করিয়া পড়িতে ও তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করি। ইহার পর তিন চার বৎসরের মধ্যেই আমি এই সিদ্ধান্ত করি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিকে যদি গুণানুযায়ী সাজাইতে হয়, তাহা হইলে প্রথম হইবে 'কপালকুণ্ডলা', দ্বিতীয় হইবে 'ইন্দিরা', ও তৃতীয় হইবে 'রজনী'। অন্যান্য উপন্যাসের অসাধারণ উৎকর্ষ আমি অস্বীকার করিব না, তবে এই তিনটি কাহিনী বিশুদ্ধ উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ রচনা। 'উদিতে আনন্দমঠে ক চ কপালকুণ্ডলা ক চ ইন্দিরা' বলিতে আমি প্রস্তুত নই।

ইহার পর ইউরোপীয় রোমাণ্টিক সাহিত্যের সহিত বঙ্কিমের 'রোমাণ্টিক' উপন্যাসের একটু তুলনা করা প্রয়োজন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বঙ্কিমের উপন্যাস 'রোমাণ্টিক' হইলেও তাঁহার রোমাণ্টিক ভাব তাঁহার যুগের নয়, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের নয়, উহার অনেক আগেকার—সে শতাব্দীর প্রথম দিকের ঔপন্যাসিক শাতোব্রিয়ঁ ও ম্যাডাম দো স্টায়েলের 'রোমাণ্টিক' ভাবের মত। অথচ এটা নিশ্চিত যে, বঙ্কিম জোলা পড়িলেও শাতোব্রিয়ঁ বা ম্যাডাম দো স্টায়েল পড়েন নাই। যে-সাদৃশ্যের কথা বলিলাম উহার উদ্ভব হইয়াছে যুগধর্ম হইতে, যুগধর্মে কোনও মানসিক ভাবের উৎপত্তি হইলে সাক্ষাৎ যোগাযোগ না থাকিলেও নানা যুগে নানা দেশে একই ধরণের মানসিক ভাব দেখা যাইতে পারে। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে ইহাই সম্ভবত ঘটিয়াছিল।

তবে বঙ্কিমের হিন্দুত্বের জন্য ইউরোপীয় প্রেমের উপন্যাস ও তাঁহার প্রেমের উপন্যাসের মধ্যে যে-পার্থক্য দেখা গিয়াছিল,' 'ইন্দিরা'-গল্পে প্রেমের যে পরিণতি ও একটি ইউরোপীয় গল্পে প্রেমের যে পরিণতি এ-দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, উহার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। শাতোব্রিয়ঁর বিখ্যাত 'আতালা' উপন্যাসে ভালবাসা ও দেহ সমর্পণের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব আছে তাহা ইন্দিরার মত সেই উপন্যাসের নায়িকা আতালাও অনুভব

করিয়াছিল। কিন্তু ফল দুই ক্ষেত্রে বিপরীত হইয়াছিল। আতালার পিতা আমেরিকার আদিম অধিবাসী 'রেড্-ইণ্ডিয়ান', কিন্তু মাতা স্পেনীয় ও খৃষ্টান। শিশুকালে আতালার গুরুতর পীড়া হওয়াতে তাহার মা মানত করিয়াছিল, ভগবান যদি তাহার মেয়েকে বাঁচান তাহা হইলে তাহার কন্যা ভগবান ছাড়া আর কাহাকেও স্বামী বলিয়া মনে করিবে না। 'আতালা' সেই মানতের কথা জানিত। কিন্তু সে একটি আদিম যুবককে বন্দিত্ব ও মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া পরে ভালবাসিয়াছিল। তখন সে দেখিল যে মাতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য প্রণয়ীর কাছে দেহ সমর্পণ না করিবার মানসিক শক্তি তাহার নাই। তাই সে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিল। ইহা খৃষ্ট ধর্মের শিক্ষার ফল। পক্ষান্তরে ইন্দিরা দেহসমর্পণ করিয়া গৌরব অনুভব করিল। ইহা হিন্দুত্বের ফল। হিন্দু কখনও নরনারীর দৈহিক আকর্ষণকে পাপ বলিয়া মনে করে নাই। তাই সংস্কৃতে কামের যে মুখ্য অর্থ তাহাতে নিন্দার আভাসমাত্র নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে বাল্মীকি 'ওরে নিষাদ, তোর যেন কখনও প্রতিষ্ঠা না হয়, কারণ তুই দুইটি কামমোহিতক্রৌঞ্চের একটিকে বধ করিলি' এই উক্তি করিয়া রামায়ণের কবি হইতেন না। বাঙালীর মধ্যে রোমাণ্টিক প্রেমের সঙ্গে হিন্দু কাম জড়িত—এই কথাটা যে আগে বলিয়াছি, ইন্দিরা গল্পেও তাহাই, দেখা গেল। উহা বঙ্কিমের দ্বারা উদ্ধৃত **'Spirit of Delight'** এরই প্রকাশ।

অসতীত্ব : পুরাতন ও নূতন

ঘরের প্রেমের কথা বলিলাম, এখন বাহিরের প্রেমের কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসও বাঙালীর প্রেমের দুই দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিবারই কথা। তবে বঙ্কিমচন্দ্র দুইএর সমন্বয় করিয়াছিলেন। আমার পিতা আমাকে অল্পবয়সে একদিন রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'নীরু, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি বউ ঘরের বা'র হয়েছে।' তবু তাহাদের সকলেই সতী রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয় দেখান নাই,—তাহা কি তিনি ব্রাহ্ম ও বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু বলিয়া ? কে জানে ?

যাহা হউক, সেকালের বাঙালী জীবনে ও একালের বাঙালী জীবনে অসতীত্বের কথা এখন বলিতে হইবে। হয়ত আমার পাঠক-পাঠিকারা এই কথাটা আমার মুখে শুনিয়া অবাক হইয়া যাইবেন, এমন কি হয়ত বিশ্বাসও করিবেন না যে, পুরাতন বাংলা সাহিত্যে, অর্থাৎ ইংরেজী ভাষার সূত্রে ইউরোপীয় জীবনের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে সতীত্ব সম্বন্ধে বড়াই দূরে থাকুক সতীত্বের প্রশংসাও নাই। বরঞ্চ এ-কথাটাই সত্য যে, পুরাতন বাংলা সাহিত্য অসতীত্বের স্তুতিতেই পূর্ণ। সে সাহিত্যে কোথাও সতীত্বে সুখ আছে এ-কথা নাই, বরঞ্চ অসতীত্বেই যে আনন্দ ও সুখ তাহারই ঘোষণা আছে। একটি কবিতা হইতে ইহা দেখাইতেছি।

একটি যুবতী বধূ সচ্চরিত্রা, স্বামী প্রবাসে, শাশুড়ী কন্যার সন্তান

হওয়াতে তাহার বাড়ী গিয়াছেন, দেবর শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে, তিনি একাকিনী বাড়ীতে আছেন, গ্রামে তাঁহার প্রণয়ের (অর্থাৎ দৈহিক মিলনের জন্য) পিপাসু বহু যুবক আছে। তবুও তিনি পথভ্রষ্টা হন নাই, কিন্তু দুঃখ করিয়া বলিতেছেন,—

'পরকীয় সুখ যত ঘরে ঘরে শুনি কত
অভাগীর ধর্মভয়
এত করে মরি লো।
পরপুরুষের মুখ দেখিলে যে হয় সুখ,
এ কি জ্বালা সদা জ্বলি,
হরি, হরি, হরি লো!'

বাঙালী মেয়ের চিরাচরিত পরপুরুষ প্রীতির বর্তমানকালে বহুল ব্যতিক্রম* দেখিয়া আমি দুঃখ অনুভব করি, ও সেই দুঃখের বশে অক্সফোর্ডে বাস করিয়া (তরুণী অবশ্য আজকালকার হিসাবে) বাঙালী বধূদের যাহা বলি, তাহাব পুনরাবৃত্তি করিতেছি। কোনও যুবক-যুবতী ছাত্রছাত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি। যখন মেয়েটি বলে—'স্বামী-স্ত্রী', তখন আমি কপাল চাপড়াইয়া বলি, 'হায়, হায়! এ কি হলো! বাঙালী যুবতীর এত অধঃপতন হয়েছে, তা তো আমি কল্পনাও করতে পারতুম না।' তখন প্রশ্ন হয়, 'কেন'? আমি বলি, 'বাঙালী মেয়ে যখন সত্যিকার বাঙালী মেয়ে ছিল, তারা কখনও স্বামীর সঙ্গে বিদেশে আসবার মত কুকাজ করবে ভাবতেও পারতো না।' আবার প্রশ্ন হয়, 'তবে কি করতো!' আমি উত্তরে বলি যে, স্নান করিতে যাইতে যাইতে পথে একটি যুবককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিত—

'আহা মরে যাই, লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই
ভজি ইহারে
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগর পারে।'

সেই বাঙালী মেয়ে আজ স্বামীর সঙ্গে বিলাতবাস করিতেছে, তাও আবার সেই স্বামীর মুখ দাড়ি গোঁপে সমাচ্ছন্ন, নাভির অধোদেশ নীল রংএর মোটা কাপড়ের জীন্‌স্‌-এ আবৃত! এটা কি পরিতাপের বিষয় নয়?

যুবতী বধূরা যখন দল বাঁধিয়া ঘাটে যাইত তখন তাহাদের মধ্যে এই রূপবান যুবক সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত-রূপ কথাবার্তা হইত—

প্রথমা। 'কহে একজন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন মাঝে

* অবশ্য হালে এক ধরণের অসতীত্বের প্রসার হইতেছে। কিন্তু সেটা অতিশয় ছ্যাচড়া। বইয়ে লিখিবার মত নয়।

বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে।'

দ্বিতীয়া। 'আর জন কয় এই মহাশয়—
চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি ;
হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।'

হঠাৎ বাড়ী ফিরিতে হইবে মনে পড়িয়া গেল। তাই একজন বলিল,—

'ঘরে গিয়া আর কি দেখিব ছার,
মিছার সংসার ভাতার জরা ;
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিণী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা।'

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে এই যুবতীদের পতি সম্বন্ধে কি মনোভাব ছিল। প্রাচীন বাংলা কাব্যে-গল্পে পতিভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দূরে থাকুক পতি লইয়া সন্তোষের কথাও নাই। যাহা আসলে থাকিত উহা নারীগণের পতিনিন্দা। উহা এত সহজবোধ্য ও খোলাখুলি ভাষায় হইত যে উহাকে কাল্পনিক উক্তি মনে করা কঠিন। পত্নীদের পতিনিন্দার মূলে ছিল বাল্য-বিবাহ। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার পরে স্বামী-সহবাস করার ফলে স্বামী সম্বন্ধে কোনও কাব্যময় রোমাণ্টিক ভাব পোষণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রাচীন কাব্যে একমাত্র কবি-স্বামী ভিন্ন অন্য স্বামীর প্রশংসা স্ত্রীদের মুখে পাওয়া যায় না। ইহার জন্যই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ 'কবির পুরস্কার' কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। অবশ্য এ কথা বলিতে পারা যায় যে, কবিরাই যখন সাহিত্য-স্রষ্টা তখন তাঁহারা স্ত্রীদের মুখে কবি-স্বামীর নিন্দার কথা দিবেন না। তবে অন্য স্বামীদের বৈষয়িক বা সামাজিক পদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে নিন্দা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ অনেক নিন্দাই যথার্থ বলিয়াই মনে হয়।

সেজন্য, অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ন ভাষায় উক্ত বলিয়া সেগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। তাহা হইলে আজকালকার অনেক স্বামী মনে কষ্ট পাইতে পারেন, বিশেষত অধ্যাপকেরা ও রাজকর্মচারীরা, কারণ সেকালের বাঙালী যুবতীদের বিরাগ ইঁহাদের সম্বন্ধেই বেশী ছিল। এই বিরাগের কেন হ্রাস হইতেছে তাহা আমি বুঝি না।

তাঁহাদের আবার অসতীত্বের একটা 'ফিলসফি'ও ছিল। সেটা ভারতচন্দ্র এইরূপে ভাষাগত করিয়াছিলেন—

'কারে কব লো যে দুখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।

ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী ভয় কত সব আর ।।
শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার।

বাঙালীর চিন্তাধারার এই দিকটার সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়াই প্রমথ চৌধুরী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের সমর্থন করিবার জন্য বাঙালী সমালোচককে উদ্দেশ্য করিয়া একবার লিখিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণের বেনামীতে এই সব গান লিখিলে কোনও বাঙালী পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে দোষী করিতেন না।

এই প্রাচীন প্রেমিকাদের জন্য সেকালের আচারবিচার-মানা বাঙালীর মধ্যে কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থানের দুর্নাম হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, অভিসারিণীরা প্রণয়ের আকর্ষণে 'সঙ্কেত তরু মূলে', 'সঙ্কেত নদীর কূলে', ঘাটে, ভাঙ্গা মঠে ও মাঠে যাইতেন, সুতরাং জায়গাগুলির প্রতিও বিরাগ দেখা গেল। তাহা হইতে 'করোলারী' এই হইল, যে-সব যুবতীর গাছপালা, নদী, বাগান, পরিত্যক্ত মন্দির সম্বন্ধে জ্ঞান আছে তাহারা কুচরিত্রা, এমন কি ভ্রষ্টা। একটি নিষ্ঠুর অথচ সত্য ঘটনা হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৯১৬ সনে আমার ভগিনীর বিবাহ হয় ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার মধ্যে কংশ নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধ গ্রামে। আমি সেই গ্রামে ভগিনীর সহিত দেখা করিতে গিয়া ভগিনীর ভাসুরের মুখে এই ঘটনাটির কথা শুনিলাম। গল্পটি এইরূপ।

বিবাহের পর একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে পাকস্পর্শ হইতেছে। বধূ পরিবেশন করিতেছে, ননদ তাহাকে ধরিয়া আছে। এমন সময়ে একজন প্রৌঢ় জ্ঞাতি ভাতের সঙ্গে লেবু চাহিলেন। শাশুড়ী জানাইলেন যে, ঘরে লেবু নাই। বধূটি খিড়কীর ঘাটে যাইবার সময়ে একটি বড় লেবু গাছে একটি লেবু দেখিয়াছিল। সে ননদকে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া লেবুটির কথা বলিল। জ্ঞাতিরা 'কি বলিল' 'কি বলিল' জিজ্ঞাসা করিলে ননদটি লেবুর উল্লেখ করিল। তখনই জ্ঞাতিরা হাত গুটাইয়া পাত হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'আমরা এই কুলটা মেয়ের হাতের অন্ন স্পর্শ করব না।' মেয়েটি পরিত্যক্তা হইল।

যুক্তিটা এই—মেয়ে যখন লেবু গাছে লেবু দেখিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ীতে আসিবার একদিনের মধ্যেই সেই গাছের নীচে উপপতির সহিত সঙ্গত হইয়াছে। একটি প্রাচীন সংস্কৃত কবিতায় 'তথাপি তত্র রেবারোধসি বেতসী তরুতলে······চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে' এই কথাটি আছে। কিসের জন্য চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞাতিদের কাজটি অর্বাচীন বাঙালী সমাজে কবিতাটির 'প্র্যাক্টিক্যাল' প্রয়োগ। যে কৌমারহর সে-ই বর, এই প্রয়োগে উহার ইঙ্গিতও নাই। ব্যাপারটা যে কত অন্যায় ও নিষ্ঠুর তাহার কোনও

অনুভূতিও বলিবার সময়ে প্রকাশ হইল না। আমার তখন বয়স অল্প, সবে আই-এ পাশ করিয়াছি। তাই এই ত্যাগের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লেবু দেখেছে তো কি হয়েছে?' আমার ভগিনীর ভাসুর শুধু মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন। যতই স্থূল হউক, উহার পিছনে দেশাচার নিশ্চয়ই ছিল।

প্রাচীন বাংলা কাব্যে বিবাহবন্ধনের বাহিরে ভালবাসা পাইবার এই যে আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছিল, উহা আধুনিক কাল পর্যন্তও লৌকিক গানে প্রকাশ পাইতেছিল। একটি গান আমি অল্প বয়সে আমাদের অঞ্চলে শুনিতাম। সম্প্রতি নির্মলেন্দু চৌধুরী উহা গাহিয়াছেন। উহা উদ্ধৃত করিতেছি—

'সুজন বন্ধু বাইয়া নাও,
একখান্ কথা কইয়া যাও,
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা
পান খাইয়া যাও।
রাঙ্গা ঠোঁটে রাঙ্গা পান,
শরমে রাঙ্গাইল প্রাণ,
হাসির বিজুলী দিয়া
পরাণ রাঙ্গাও।
বসে রইলাম নদীর ঘাটে
বন্ধু, তোমায় পাইবার আশে,
মাস যায় বছর যায়
প্রাণবন্ধু না আসে।
সোনার বরণ হইল কালা,
পিরিতের ওই অমনি জ্বালা,
ভাটিয়ালি গান গাইয়া
পরাণ রাঙ্গাও—
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা
পান খাইয়া যাও।'

এখন জিজ্ঞাস্য, এই সব কি কবিদের কবিত্ব বা রসিকতা, বা, নীতিবান লোকের কথায়, বদ্-রসিকতা? না, এই সব কবিতার মূলে প্রচলিত সামাজিক আচরণও ছিল? বিবাহের বাহিরে প্রেমের যে একটা প্রাচীন ধারা ছিল, তাহা বাংলা ভাষায় এক ধরনের বাক্য ব্যবহার হইতেও অনুমেয়। দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯১৪-১৫ সনের কথা। আমি কলিকাতায় কলেজে পড়ি। আমাদের পরিবার কিশোরগঞ্জে থাকে। ছুটিতে গেলে মা আমার পরেরই যে ভাই তাহার সম্বন্ধে নালিশ করিতেন। আসলে সে তখন বিপ্লবী দলে জুটিয়া গিয়াছিল, তাহার বিপ্লবী সহকর্মীরা বাড়ীর বাহির হইতে চাপা গলায় ডাকিলেই সে কয়েক ঘণ্টার জন্য উধাও হইয়া যাইত। মা আমাদের কাছে বলিতেন, 'বাপ-মা, দাদা, কারুর কথাই তো গ্রাহ্য করবে না, কিন্তু বন্ধুরা এসে

কুহুস্বরে ডাক দিলেই পালিয়ে যাবে।' মা 'কুহুস্বরে' কথাটা কেন বলিতেন, বুঝিতে পারিতাম না, মাও নিশ্চয়ই জানিতেন না, নহিলে তিনি যেরূপ ব্রাহ্ম-পন্থী ছিলেন, উহা কখনই ব্যবহার করিতেন না। পরজীবনে পুরাতন বাংলা কাব্য পড়িয়া 'কুহুস্বরে' এই 'ইডিয়ম'-টার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম। কবিতাটি এইরূপ,—

'সুখে শুয়ে পতি আছে রামা বসে তার কাছে
ইসারায় উপপতি পিকডাকে ডাকিল।
রামা বলে হৈল দায় পাছে পতি টের পায়
না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল ।।
কোকিল ডাকিছে হোর কাম ভয়ে পাছে ঘোর
শ্রান্ত আছ নিদ্রা যাও বলে চক্ষু ঢাকিল ।।
জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাক বনপ্রিয়.
আর কি তোমারে ভয়, বলে দুই রাখিল ।।

ইহার অর্থ কলিকাতার দিকে যে 'বাংলা ক'রে বলে ফেলুন না',—উক্তিটি প্রচলিত আছে, সেই রূপ বাংলায় বুঝাইব। উপপতি বাগানে ঢুকিয়া কোকিলের ডাকের অনুকরণ করিয়া প্রণয়িনীকে বাহির হইয়া আসিতে ইসারা করিল। তাহার সংকট স্বামী পাশে শুইয়া আছে, হঠাৎ জাগিয়া হয়ত দেখিবে স্ত্রী শয্যায় নাই। তাই কোকিলকেই যেন গালি দিতেছে এই ছল ধরিয়া বলিল, 'হতভাগা পাখী, তুই ভেবেছিস্ তোর ডাকে আমার বিরহব্যথা জেগে উঠবে, একেবারে না, আমার স্বামী কাছে রয়েছে, বিরহ নেই। দূর হয়ে যা, পোড়ার-মুখো পাখী।' আমার মার 'কুহুস্বরে ডাকা' কথাটা এই দেশাচার হইতে আসিয়াছিল।

আর একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদ ছিল, 'কুকুর মারে হাঁড়ি ফেলে না।' বঙ্কিমচন্দ্র ইহার ব্যাখ্যা দিলেন, 'ঔরঙ্গজেব কাণ্ডটা না বুঝিলেন তাহা নহে। জেবউন্নিসার কুচরিত্রের কথা তিনি সর্বদাই শুনিতে পাইতেন। কতকগুলি লোক আছে, এদেশের লোকে তাহাদের বর্ণনার সময়ে বলে, "কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না।" মোগল বাদশাহেরা সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারা কন্যা বা ভগিনীর দুশ্চরিত্র জানিতে পারিলে কন্যা বা ভগিনীকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগিনীর অনুগৃহীত তাহার ঠিকানা পাইলেই কোন ছলে কৌশলে তাহার নিপাত সাধন করিতেন।'

বঙ্কিম নিশ্চয়ই বার্নিয়ারের ভ্রমণকাহিনীতে সাজাহান ও জাহানারা বেগম সম্বন্ধে গল্পটি পড়িয়াছিলেন। অবিশ্বাসিনী বেগমদিগকে, অথবা প্রণয়ীরা বেগম-মহলে ধৃত হইলে তাহাদিগকে যে আংটা হইতে ফাঁসি দেওয়া হইত তাহা দিল্লীর রং-মহলের ও অন্য ইমারতের নীচের তলায় আছে।

কুকুর মারার ব্যাপার আমার অল্প বয়সে কি ভাবে নিষ্পন্ন হইত ইহার বিবরণ একটি সত্য ঘটনা হইতে দিব। ১৯২৩-২৪ সনে আমি ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রীটে বন্ধু বিভূতিভূষণের (ঔপন্যাসিকের) সহিত মেসে থাকি (আমিই

তাঁহাকে এই মেসে আনি)। তিনি একদিন আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন, 'ওহে নীরদ, ন-এর কথা মনে আছে, সেই যে আমাদের সঙ্গে রিপন কলেজে পড়তো ?' আমার মনে না থাকায় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আরও বলিলেন, 'স্কলার হয়েছে হে, ফ্রেঞ্চ পড়ে, প্রমথ চৌধুরীর কাছে যায়।' আমি বলিলাম, 'তা তো যেন হলো, এখন তার কথা কেন ?' বিভূতিবাবু 'বলছি' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া গল্পটি বলিলেন।

'এখন সে অমুক গ্রামে শ্বশুরবাড়ীতে থেকে মাষ্টারি করছে। (কলিকাতার অল্প দূরে, রেলে আসা-যাওয়া করা যায় একটি গ্রাম।) বৌ ছেলে-মানুষ। কিন্তু শাশুড়ীকে নিয়ে কানাঘুষো চলছে। জান তো, সব বাবুরাই ডেলি প্যাসেঞ্জারী ক'রে কলকাতায় চাকরী করে। তাইতেই সুযোগ।'

ইহার কিছুদিন পরে আসিয়া খবর দিলেন, 'ওহে ন শাশুড়ীকে নিয়ে এসে তার সঙ্গে—স্ত্রীটে আছে। (আমাদের মেসের কাছেই একটা গলির নাম করিলেন)। চল না, দেখে আসবে। জবর শাশুড়ী। বেশ সুখে আছে দুজনে।'

আমি যাইতে কোনপ্রকার আগ্রহ দেখাইলাম না। আবার আসিয়া বলিলেন, 'বড় তামাশা হয়েছে হে, বৌকেও নিয়ে এসেছে। এখন মা-মেয়েতে একসঙ্গে ন-এর সঙ্গে আছে। চল, চল, তামাশাটা দেখবে চল।'

তখনও আমি রাজী হইলাম না। ইহার পর আসিয়া বলিলেন, 'আরও মজা হয়েছে হে। শ্বশুর এসে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

ইহারও পর আবার খবর দিলেন, 'শ্বশুর ঝানু। মেয়েকেও নিয়ে গেছে। এখন ন একলা বসে হুক্কাহুয়া দিচ্ছে।'

ইহাই আধুনিক কুকুর মারা, হাঁড়ি না ফেলা।

আজকালকার স্বামী-স্ত্রীদের এই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতে হইবে। এখন পুরাতন কুলীন মেয়ের বিবাহের মত বিবাহ আবার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং কুলীন মেয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিতে হইতেছে। তাহা এইরূপ,—

'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে,
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই,
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই॥'

বয়সের তারতম্য অবশ্য আজকাল সাধারণত এত বিপরীত হয় না, তবুও সমান সমান হইতে পারে। তাই এখন শাশুড়ী জামাই ঘটিত ব্যাপার আর সম্ভব নয়। তবে সেকালে অনেক সময়েই শাশুড়ী ও জামাতার বয়স প্রায় সমান সমান হইত, বধূ হয়ত হইত এগারো-বারো বছরের। তাই যে-সব শাশুড়ীরা আচরণ সম্বন্ধে অবহিত হইতেন তাঁহারা জামাতার সম্মুখেও ঘোমটা দিয়া থাকিতেন, এবং কথা কহিলেও অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত বলিতেন। আমার দিদিমাকে এইরূপ দেখিতাম। কিন্তু সকল শাশুড়ী এক চরিত্রের হইতেন না, তখন আগুনের খাপরার মত প্রগল্‌ভা-নায়িকা-তুল্যা শাশুড়ীর কাছে কচি স্ত্রী

মুগ্ধা নায়িকার মতও হইত না, নিতান্ত কাঁচা পেয়ারার মত হইত।

আবার অল্পবয়সে কনে কাঁচা পেয়ারা না হইলেও শাশুড়ী জামাতার সমবয়সী হইতে পারিতেন। যেমন, আমার বড় শ্যালিকার বিবাহ হয় ১৯২১ সনে এক আই-এম-এসের কাপ্তানের সহিত। তাঁহার বয়স ও আমার শাশুড়ীর বয়স একেবারে সমান ছিল। আমার নিজের বিবাহের সময় আমার বয়স ও আমার স্ত্রীর বয়সের মধ্যে বারো বৎসরের পার্থক্য ছিল, এবং আমার আর আমার শাশুড়ীর মধ্যে পার্থক্য ছিল তেরো বছরের। সুতরাং বিভূতিবাবুর সমপাঠীর মত চরিত্র আমার হইলে সহজেই উভচর হইতে পারিতাম। বিভূতিবাবু যে ইতিহাস দিলেন তাহা আমাদের কালেও ঘটিতে পারিত।

শুধু এই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই নয়, সব রকমের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই বাঙালী সমাজ যে বিবাহের বাহিরে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে, যাহাকে সমাজের দিক হইতে অনাচার বলা হয় তাহা বহুল পরিমাণে ছিল তাহার প্রমাণ অনেক আছে। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া নানা বাংলা সংবাদপত্রে ও বই-এ বাঙালী সমাজ-সংস্কারকেরা ইহার আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করিতে গিয়া যে-ভাবে ভ্রূণ হত্যার কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা যে খুবই প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ করা চলে না।

গল্প-উপন্যাসেও ইহার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজে' ক্ষেন্তি বামুনীর মুখে এই কথাগুলি দিয়াছেন—

> 'বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কও না? তোমার ছোটভাজ যে ঐ ভাঁড়ার ঘরে বসে পান সাজছে, সে তো আর-বছর মাস দেড়েক ধরে কোন কাশীবাস করে অমন হলদে রোগা শলতেটির মত হয়ে ফিরে এসেছিল শুনি? সে বড়লোকের কথা বুঝি? বেশি ঘাঁটিও না বাপু, আমি সব জারিজুরি ভেঙে দিতে পারি। আমরাও ছেলেমেয়ে পেটে ধরেচি, আমরা চিনতে পারি। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।'

কাশীর এই দুর্নাম প্রাচীন হিন্দুও ঘোষণা করিত, সংস্কৃত শ্লোকে—

> 'শ্রুতি-স্মৃতি-বিহীনানাং যে শৌচাচার-বিবর্জিতাঃ
> যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি, তেষাং বারাণসী গতিঃ।'

আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া কাশী সম্বন্ধে বলিতাম,—

> 'হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
> জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়…'

এই সব ভাঙা জাহাজের প্রসঙ্গে আমি একটি সত্য ঘটনার কথা বলিব। ১৯২৬ সনে আমি প্রথম কাশী যাই, দাদার দিদি-শাশুড়ীকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যে। তিনি বাঙালীটোলার একটি খুব বড় বাড়ীতে ঘর ভাড়া লইয়া থাকিতেন। সেখানে অন্যেরা-ও, বেশীর ভাগই বাঙালী বিধবা, থাকিতেন।

একটি আধবয়সী বিধবা আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, তাঁহার একমাত্র পুত্র মিলিটারী অ্যাকাউন্টসে আমার সহকর্মী ছিল। (আমি তখন সবে মাত্র সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি।) মহিলাটি মাথায় খাটো কিন্তু গঠনে সুন্দর ও দৃঢ়, গৌরাঙ্গী, ভুরু দুটি মোটা ও কালো এবং জোড়া ; নীচে চক্ষুদুটি নিবিড় কালো, জ্বল জ্বল করিতেছিল। হঠাৎ তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পুত্র তাঁকে খুব ভক্তি করে। এই কথাটা মায়ের মুখে এত অস্বাভাবিক লাগিল যে, আমি কৌতূহলী হইয়া পড়িলাম। আমার এক বয়স্ক পিসতুতো দাদা এই পরিবারকে চিনিতেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার কাছে বিধবার প্রসঙ্গ তুলিতেই, তিনি মুখ বিকৃত করিয়া এ-সব জিজ্ঞাসাবাদ করিতে নিষেধ করিলেন। আমি আরও কৌতূহলী হইয়া বৌদিদির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, গ্রামে বাস করিবার সময় তাঁহার স্বামী একদিন আসিয়া ইঁহাকে প্রণয়ীর সহিত শয্যায় আইনের ভাষায় যাহাকে In flagrante delicto বলে সেই অবস্থায় ধরেন, এবং তখনই প্রণয়ীকে হত্যা করেন। সেইজন্য তাঁহার স্বামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। যখন আমি মহিলাটিকে দেখি তখনও তাঁহার স্বামী জীবিত ও দ্বীপান্তরে না মৃত, তাহা আমি জানিতে চাহি নাই। তবে মহিলাটি বিধবার বেশে থাকিতেন। প্রভাতকুমার 'কাশীবাসিনী' গল্পে এবং শরৎচন্দ্র 'চন্দ্রনাথ' গল্পে কুলত্যাগিনীদের কাশীবাস করার কথা লিখিয়াছেন।

প্রবৃত্তির বশে ব্যভিচারিণী স্ত্রীরা কখনও রাক্ষসীর মত হইয়া যাইত। ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিব। একটি আমার এক বন্ধু স্বচক্ষে দেখেন। তিনি ঢাকাজেলার মানিকগঞ্জ মহকুমায় নিজের গ্রাম হইতে জাহাজ ধরিবার জন্য পদ্মার উপরে আরুচা ষ্টেশনে পাল্কী করিয়া আসিতেছিলেন। অর্ধপথে একটি সম্পন্ন মুসলমানের বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিলে দেখিতে পাইলেন যে, একজন বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক বাহিরের উঠানের একদিকে বদ্‌না হইতে জল লইয়া হাতমুখ ধুইতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন অন্দর হইতে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে একটি যুবতী বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে একটা বড় দা। সে ছুটিয়া আসিয়া এক কোপে বৃদ্ধের মাথা কাটিয়া ফেলিল। আমার বন্ধু শশব্যস্ত হইয়া বেহারাদের পাল্কী দ্রুত চালাইয়া গ্রামের বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন, পাছে সাক্ষী দিতে হয়।

ইহার পর প্রভাতকুমারের লেখা হইতে একটি হিন্দু যুবতী হত্যাকারিণীর সত্য বিবরণ দিব। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে একটি গ্রামে মাতঙ্গিনী নামে একটি অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী ছিল। তাহার স্বামী অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া পশ্চিমে চাকুরী করিতে যায়। এই সময়ে মাতঙ্গিনীর সহিত একটি লোকের প্রণয় হয়। তিন বৎসর পরে যখন স্বামী ছুটি লইয়া বাড়ী আসিবার খবর দিল, তখন মাতঙ্গিনী ও তাহার প্রণয়ী প্রমাদ গণিয়া স্থির করিল যে, রাত্রিতে স্বামীকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ জলে ফেলিয়া দিবে। তাহা ঘটিল। কিন্তু মাতঙ্গিনীর পাঁচ বছরের পুত্র হঠাৎ জাগিয়া যাহা দেখিল,

তাহা আদালতে বালক যে-ভাবে বর্ণনা দিয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

> 'অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেলে দেখিলাম, আমার মা ও পুরাতন বাবা ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে, আমার নূতন বাবা, যে সেদিন আসিয়াছিল তাহার গলাকাটা, রক্তে বিছানা ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। বাবা আমায় ধমক দিয়া বলিল, 'চুপ কর পাজি। চেঁচাবি ত তোরও গলা এমনি করে কেটে দেব। ভয়ে আমি চক্ষু মুদিলাম ও পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।'

মাতঙ্গিনী ভয় পাইয়া প্রণয়ীকে বলিল, 'চল দুজনে এইবার লাসটাকে নদীতে দিয়ে আসি।' কিন্তু ব্যক্তিটি ভয় পাইয়া পলাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তাহাকে আর পাওয়া যায় নাই। মাতঙ্গিনী প্রণয়ী পলাইয়াছে দেখিয়া গ্রামের এক ডোমকে লাস ফেলিয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করিল। ডোম তাহাকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া থানায় গিয়া খবর দিল। মাতঙ্গিনী লাস সমেত গ্রেপ্তার হইল। এই ডোম ও ছেলের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া জজ তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দিলেন।

যিনি এই কাহিনী প্রভাতকুমারকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার নাম দীননাথ সান্ন্যাল। তিনি ডাক্তার এবং সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি পরজীবনে জেলের ডাক্তার হিসাবে পোর্ট ব্লেয়ারে যান। সেখানে মাতঙ্গিনীকে দেখেন। তখনও মাতঙ্গিনী সুন্দরী ছিল। ইহার পর দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

> 'একদিন নির্জন পথে মাতঙ্গিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম। অন্যান্য কথার পর বলিলাম, "মাতঙ্গিনী, তোমার মত আমিও নদীয়া জেলার লোক। কৃষ্ণনগরে আমার বাড়ী। ইহা আমার স্ত্রীর কাছে তুমি শুনিয়া থাকিবে। সেসন্ আদালতে যখন তোমার মোকদ্দমা হয়, তখন আমি বালক, স্কুলে পড়ি। সে-সময়ে লোকে বলাবলি করিত, খুনটা কে করিল, তুমিই করিলে, অথবা তোমার সেই লোকটিই করিল, তাহা কিছুই জানা গেল না। এ-বিষয়ে, অন্য সকলের মত আমার মনেও অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। সে-ঘটনার পর বহু বৎসর গত হইয়াছে। এখন তুমি আমায় সে-কথা বলিবে?"
>
> 'এই কথা শুনিয়া মাতঙ্গিনী কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া নতমুখে রহিল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ পশ্চাৎ দিকে ফিরাইয়া বলিল, "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।"'

অনেক সময়েই সমাজ-বিরুদ্ধ প্রণয়ের ফল প্রবঞ্চিতা যুবতী বা তরুণীর পক্ষে শোচনীয় হইত। প্রণয়ীর মোহ ঘুচিয়া গেলে সে মেয়েটিকে ত্যাগ করিত ও তাহার শেষ গতি একমাত্র বেশ্যালয়ে হইত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিচারক' গল্পে এইরূপ পরিণাম দেখাইয়াছেন, 'পয়লা-নম্বর' গল্পেও

এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন। সরল প্রেমে বুদ্ধিহারা হইয়া তরুণীর পরে যে গতি হইত, এ-দুয়ের মধ্যে প্রভেদ ভাষাতেও প্রকাশ পাইত, এবং সে ভাষাগত প্রভেদও মর্মান্তিক। ইহার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্প হইতেই দিতেছি। মেয়েটি গৃহত্যাগিনী হইয়া যাইবার সময়ে ভয় পাইয়া প্রণয়ীকে বলিল, 'এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই এখনো জাগে নাই। এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।' যুবক তাহার অনুনয় শুনিল না, কিন্তু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা মিটিলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া উধাও হইয়া গেল। তখন বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া মেয়েটির আর গতি রহিল না। পরজীবনে যুবক স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান হইয়া জজ হইয়াছে, মেয়েটি একজনকে হত্যার অপরাধে তাহারই দ্বারা ফাঁসি যাইবার জন্য দণ্ডিত হইয়াছে। জজ কৌতূহলবশে জেলে গিয়া দেখিলেন, মেয়েটি প্রহরীর সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। তাহার চুল হইতে একটি আংটি পড়িয়া যাইতে দেখিয়া প্রহরী আত্মসাৎ করিয়াছিল। মেয়েটি বলিল, 'ওগো জজবাবু। উহাকে বলো আমার আংটি ফিরাইয়া দিতে।' জজ হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, মেয়েমানুষের স্বভাব এমনই বটে। মরিতে বসিয়াছে তবু গহনার মায়া কাটাইতে পারে না। আংটিটি হাতে লইয়া দেখিলেন, উহাতে তাঁহার নিজের প্রতিকৃতি।

এই চিরপ্রচলিত ধারা যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে লোপ পাইল তাহা নয়, লোপ পাইবার কথাও নয়। কিন্তু সেই শিক্ষার ফলে অসতীত্বের যে নূতন ধারা দেখা দিল, তাহা পুরাতন খাতের পাশে সমান্তরালভাবে বহিতে লাগিল। এখন তাহারই পরিচয় দিব।

দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে একটি বাঙালী লেখক একশত বৎসরেরও আগে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি।* তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে 'ইয়ং বেঙ্গল' পূর্বাপেক্ষা পত্নীব্রত হইয়াছে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, 'ইয়ং বেঙ্গল' তেমনই উপপত্নীব্রতও হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৯২৩-২৪ সনে যখন আমি ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রীটে থাকি, তখন আমার দাদা হেদুয়ার কাছে মানিকতলা স্ট্রীটে থাকিতেন। আমি আপিস হইতে ফিরিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতে যাইতাম ও সন্ধ্যা আটটা নাগাদ মেসে ফিরিয়া আসিতাম। পথে রাজা উপাধিধারী একজন বিখ্যাত ও অতি ধনবান বাঙালীর প্রাসাদ ছিল। উহার ফটকের একদিকে সর্বদাই বন্দুকধারী পাহারাদার দাঁড়াইয়া থাকিত। আমি ফুটপাথ ধরিয়া আসিবার সময়ে প্রায়ই দেখিতাম যে, রাজা বাহাদুরের জুড়ীবাহিত বিরাট ল্যাণ্ডো ফটকের ভিতর দিয়া বাড়ীতে ঢুকিতেছে। এ-সব বাড়ীর মেয়েরা সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইতেন না। সুতরাং এ-সময়ে কে এই প্রাসাদে জানালা-বন্ধ ল্যাণ্ডো

* ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

করিয়া আসেন সে-বিষয়ে আমার কৌতূহল জন্মিল। সন্ধানের জন্য আমার এক বন্ধুর শরণ লইলাম। তাঁহার সহিত রাজা বাহাদুরের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের পরিচয় ছিল। যে সংবাদ পাইলাম তাহা এইরূপ।

রাজা বাহাদুর তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তাহা ছাড়া বাতে (আরথ্রাইটিসে) পঙ্গু। সুতরাং তিনি তাঁহার যুবাবয়সের রক্ষিতার বাড়ীতে যাইতে পারেন না। তাই প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বৃদ্ধা রক্ষিতা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পদসেবা করিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেন। মনে রাখিতে হইবে সম্ভ্রান্ত বাঙালী গৃহস্থ তখনকার দিনে প্রৌঢ় হইবার পর আর অন্তঃপুরে ঘুমাইতেন না। ব্যাপারটা শুনিয়া বুঝিলাম, ইংরেজী শিক্ষার গুণে রক্ষিতার বেলাতেও সতীত্বের আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। প্রৌঢ় স্বামী পত্নীকে অবহেলা করিলেও উপপত্নীকে ভোলেন নাই। কারণ পত্নী তাঁহার পিতার দান, উপপত্নী স্বেচ্ছাবৃত প্রণয়িনী।

বিবাহিত জীবনের মধ্যেও অসতীত্ব একটা নূতন রূপে দেখা দিল। সে অসতীত্বে দৈহিক সঙ্গমের, এমন কি দৈহিক মিলনের বাসনারও ছোঁয়াচ ছিল না। উহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার ছিল। তাহাতে অসতীত্বের জন্য কোন গ্লানি বা অপরাধবোধ ছিল না। ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিত। হয়ত কোনও তরুণী বিবাহে সুখী হয় নাই, স্বামীর প্রতি কোন ভালবাসাও অনুভব করে নাই। উহার যে নানা সঙ্গত কারণ থাকিতে পারিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই তরুণী হয়ত বালিকা বয়সে কাহাকেও ভালবাসিয়াছিল, অথবা বিবাহের পর কোনও যুবকের সহিত পরিচিত হইয়া অনুরাগিণী হইয়াছিল। সে তখন বঞ্চিত জীবনের অতৃপ্তিকে দূর করিবার জন্য সেই প্রণয়ের পাত্রের কথা ভাবিত। এ-কথাও মনে করিত যে, স্বামীকে দৈহিক জরিমানা দিয়া সে মনের স্বাধীনতার অধিকারিণী হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মানব-চরিত্রের খোঁজ রাখেন তাঁহারা আর একটা ব্যাপারও অনুমান করিতে পারিবেন। এই বঞ্চিতা যুবতীরা স্বামীকে জরিমানা দিবার সময়েও ভালবাসার পাত্রকে মনে না রাখিয়া উহা দিতে পারিত না। প্রভাতকুমার তাঁহার একটি গল্পে একজন যুবতীকে দিয়া এইরূপ কথা একটু ঘুরাইয়া বলাইয়াছেন। যুবতীটি বিবাহের পূর্বে একটি যুবককে ভালবাসিয়াছিল। স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই, স্বামীর দুর্ব্যবহারে তাহার আরও বিরাগ জন্মিয়াছিল। এমন অবস্থায় কলিকাতায় অর্ধোদয় যোগে স্নান করিতে আসিয়া হারাইয়া যাওয়াতে দৈবক্রমে পূর্ব প্রণয়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছিল। সেই যুবক তাহার স্বামীকে অনেক খুঁজিয়া না পাইয়া যখন সেই সংবাদ দিল, তখন মেয়েটি বলিল, সে যুবককে ভুলিতে পারে নাই। তাহার উক্তি এইরূপ—

> 'পতিভক্তি পতিসেবা করবার জন্যও আমি কত চেষ্টা করেছি, পারিনি। বিজয়ার রাতে যখন তাঁকে প্রণাম করেছি, মনে হয়েছে তোমাকে যেন প্রণাম করছি। তিনি যদি কখনও আমায় আদর করেছেন, তখন চোখ বুজে কল্পনা করেছি, যেন তুমিই আদর করছ।'

আশ্চর্যের কথা এই যে, বন্ধু বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পই এই বিষয়ে, উহার নাম 'উপেক্ষিতা'। উহা ১৯২০ সনে (যত দূর মনে পড়ে) 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি তখনই গল্পটা পড়ি, এটা যে আমার পূর্বতন সহপাঠীর লেখা তাহা জানিতে পারি ১৯২২ সনে আবার দেখা হইবার পরে। গল্পটি আমার কাছে খুবই ভাল লাগিয়াছিল। ইহার পর বিভূতিবাবু 'মৌরীফুল' গল্পটি লেখেন। উহার বিষয়ও এইরূপ। পরজীবনে এই বিষয় লইয়া আরও একটি গল্প লেখেন, উহার নাম 'অসমাপ্ত'। শেষের এই গল্পটির মত গভীর অনুভূতির গল্প আমি কম পড়িয়াছি। গল্পটি অসাধারণ। এক বধূ একজনকে তাহার পূর্ব প্রণয়ী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু যখন তাহার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার একটি তেরো চৌদ্দ বছরের পুত্র আছে। তখনও তাহার ধারণা ছিল, তাহার জন্য সেই যুবক বিবাহ করে নাই। তাই অনুরোধ জানাইয়াছিল, যেন সে বিবাহ করে। অথচ যুবক বিবাহিত ছিল।

কিন্তু এইরূপ অসতীত্বের সর্বাপেক্ষা করুণ ও বিভ্রমময় কাহিনী দিয়াছেন শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পথনির্দেশ' গল্পে। হেমনলিনী তাহার সুবাদে ভাই গুণেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে জোর করিয়া অন্যের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। শরৎবাবু যে-ভাবে গল্পটি বলিয়াছিলেন তাহাতে মনে হয় হেমনলিনী দৈহিক জরিমানা দিতেও স্বীকৃত হয় নাই, দেয়ও নাই। এক বৎসর পরে যখন সে বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন গুণেন্দ্রকে বলিল, 'কি করবে গুণীদা? তোমরা ভগবানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলে, সে কথা কেবল আমিই মনে মনে টের পেয়েছিলাম। তখন আমার কথা, গ্রাহ্য করলে না—এখন কান্না আর হায়, হায়!'

হেম বিধবা হইয়াও গুণীর পদসেবা করিত, ও বলিত, 'তোমার পায়ের কাছে বসলেই আমার হাত দেবার লোভ হয়।'

কিছুক্ষণ পরে গুণী জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমার স্বামীকে তুমি ভালবাসতে কি?'

হেম উত্তর দিল, 'একটুও না। সে-কথা আমার কোনদিন মনেও হয়নি।...'

গুণী আবার বলিল, 'কিন্তু যারা সতীলক্ষ্মী তারা নিজেদের স্বামীকে ভালবাসে। বিধবা হলে তাঁর মুখ মনে ক'রে আর বিয়ে করে না। তোমার মার মত তাঁরা মরণকালে স্বামীর কাছে যাচ্ছি মনে করেন।'

হেম বলিল, 'আমাকে তোমরা জোর করে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়েছিলে। আমিও সতী-লক্ষ্মী, তাই মরণকালে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, এই কথাই মনে করবো। আচ্ছা গুণীদা, মরে কি তোমার কাছে যেতে পারব?'

শরৎচন্দ্র লিখিলেন, 'তাহার কথার মধ্যে জড়তা নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জার লেশমাত্র নাই।'

এই ধরণের একটি ব্যাপারের উদাহরণ ইউরোপের ইতিহাস হইতে দিব।

উহা গল্প নয়, সত্য ঘটনা। শরৎচন্দ্র যে এই কাহিনী কখনও পড়িয়াছিলেন তাহা সম্ভব নয়। যে বই-এ উহা আছে সে বই শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে আমাদের দেশে আসে নাই, উহা ফরাসী ভাষায় লিখিত, উহার ইংরেজী অনুবাদও নাই। তবু যে বই-এ উহা পাইয়াছি, উহা ইন্দিরা'র প্রসঙ্গে যে ফরাসী লেখকের নাম করিয়াছি, তাঁহারই লেখা—অর্থাৎ শাতোব্রিয়ঁর। এই কাহিনীটি তাঁহার নিজের জীবনের। তাঁহার আত্মজীবনীতে আছে।

১৭৯৪ সন, শাতোব্রিয়ঁর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর। ফরাসী বিপ্লবে তাঁহার বহু আত্মীয় প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি পলাইয়া ইংলণ্ডে আসিয়া নিজেকে বাঁচান। কিন্তু কপর্দকহীন হইয়া আসাতে লন্ডনে তাঁহার অত্যন্ত দুরবস্থা হয়। কিছুদিন পরে সাফোক কাউন্টির বাঙ্গে শহরে একজন পাদ্রী সাহেব তাঁহাকে আশ্রয় দেন। তাঁহার নাম ছিল ডাঃ আইভ্‌স্‌। তিনি গ্রীক সাহিত্যে ও গণিতে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা ছিল, তাহার নাম শারলোট্‌। মেয়েটি পিতার কাছে লেখাপড়া শিখিতেছিল, সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে মেয়ে পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিত। শাতোব্রিয়ঁ পিয়ানোর গায়ে ভর দিয়া বসিয়া তাহা শুনিতেন। তিনি পর-জীবনে লেখেন যে, শারলোটের গানের ক্ষমতা ইউরোপের একটি বিখ্যাত গায়িকার মত ছিল। গানের পর মেয়েটি দান্তে ও তাস্‌সোর বিখ্যাত কাব্যগুলি বুঝাইয়া দিবার জন্য শাতোব্রিয়ঁকে অনুরোধ করিত। দুজনের মধ্যে প্রণয় জন্মে, যদিও কেহ কাহাকেও বলে নাই। তখন শাতোব্রিয়ঁ কিন্তু বিবাহিত। ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিবার আগে তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া বিবাহ দেন। নববিবাহিতা পত্নীর সহিত বাস করা দূরে থাকুক, তাহার সঙ্গে ঠিকমত পরিচয়ও হয় নাই। আইভ্‌সরা অবশ্য তাহা জানিতেন না। কিন্তু উভয়ের মনোভাব বুঝিয়া একদিন আইভ্‌স্‌ গৃহিনী শাতোব্রিয়ঁকে একা পাইয়া বলিলেন যে, শাতোব্রিয়ঁর বর্তমান অবস্থা যাই হউক তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে তাঁহার স্বামী প্রস্তুত আছেন। শাতোব্রিয়ঁর আর উপায়ান্তর রহিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ম্যাডাম, আমি বিবাহিত।' গৃহিণী এই কথা শুনিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন। শাতোব্রিয়ঁও বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। আর আইভ্‌স্‌ পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ১৮০০ সনে তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া যান।

বহুদিন পরে ১৮২২ সনে শাতোব্রিয়ঁ ফরাসী রাজদূত হইয়া আবার লণ্ডনে আসেন। তখন একদিন তাঁহার আপিসে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভৃত্য ঘরে আসিয়া বলিল, লেডী সাটন নামে এক মহিলা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তখনই প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সের একটি মহিলা প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে দুটি সুশ্রী বালক, একজনের বয়স ষোলো, অন্যের পনেরো মত।

মহিলাটি আবেগ কম্পিতস্বরে ইংরেজীতে বলিলেন, 'My lord, do you remember me ?'

শাতোব্রিয়ঁ চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন 'মিস্ আইভ্স্!' দুজনেই কথা বলিতে পারেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি বলিলেন,

'মাই লর্ড', আমি বাঙ্গেতে আপনার সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলতুম, আবার সে-ভাবেই বলছি। আমার লজ্জা হচ্ছে। আমায় ক্ষমা করুন। আমার এই ছেলে দুটি অ্যাডমিরাল সাটনের পুত্র। আপনি ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাবার তিন বছর পরে আমি তাঁকে বিবাহ করি। কিন্তু আজ আমার মাথার ঠিক নেই, সব কথা বলতে পারব না। আমাকে আবার আসবার অনুমতি দিন।'

কিন্তু শাতোব্রিয়ঁ নিজেই লেডী সাটনের সহিত দেখা করিতে গেলেন। দুজনের আলাপের মধ্যে দুজনের মুখেই শুধু এই কথাটারই ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল, 'সে কথা মনে আছে কি?' কিছুক্ষণ পরে শাতোব্রিয়ঁ বলিলেন যে, মাই লর্ড সম্বোধনটা তাঁহার কাছে খুবই কঠিন বলিয়া মনে হইতেছে।

শারলোট উত্তর দিলেন, 'আমি যখন আমার পিতামাতার কাছে আপনার কথা বলতাম, তখন সর্বদাই 'মাই লর্ড' বলে আপনার উল্লেখ করেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে আপনি তাই। আপনি কি আমার কাছে স্বামীর মত ছিলেন না? আপনি কি আমার 'লর্ড অ্যাণ্ড মাস্টার' ছিলেন না?' তখন ইংরেজ পত্নীরা স্বামীকে 'লর্ড অ্যাণ্ড মাস্টার' (হৃদয়ের রাজা এবং প্রভু) বলিয়া মনে মনে করিত এবং উল্লেখ করিত।

কিন্তু শারলোট আইভ্সের বেলাতে প্রণয়, বিরহ ও বিচ্ছেদ সে-যুগের ইউরোপীয় সামাজিক আচরণের মধ্যেই রহিল। শরৎচন্দ্র গুণেন্দ্র ও হেমের প্রণয়, বিরহ ও বিচ্ছেদকে হিন্দুর প্রাচীন অসতীত্বের ধারার সহিত যুক্ত করিলেন। হেম যখন গুণীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি আমি সহ্য করতে পারব?' তখন গুণী উত্তর দিল,—

'পারবে। যখন বুঝবে, সংসারে ভালবাসাকে মহিমান্বিত করবার জন্য বিচ্ছেদ শুধু তোমার মত অতুল ঐশ্বর্যশালিনীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পেতেছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রেমের কুটিরে অবজ্ঞায় যায়নি—তখনই সহ্য করতে পারবে। যখন জানবে অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ ক'রে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবেই সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর, তখন সইতে পারবে হেম।'

তখনকার চিরাচরিত সামাজিক বিধানে হেম ঘোর অসতী। শরৎচন্দ্র তবু তাহাকে সেইরূপ অসতী করিয়াই বাঙালী জীবনে নূতন অসতীত্বের মহিমা কীর্তন করিলেন। ইহা একটা মানসিক বিপ্লবের ফল। শরৎচন্দ্রের রাধাও সেই বিপ্লবেরই মানসিক সৃষ্টি। এই রাধা জয়দেবে দূরে থাকুক চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিতেও নাই।

সপ্তম অধ্যায়

নারীর সন্ধানে

ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হইবার ফলে সমগ্র বাঙালী ভদ্র-শ্রেণীর যে-সব নূতন সুযোগ অর্থোপার্জনের জন্য দেখা দিল, তাহার আকর্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে উদ্যোগী বাঙালী মাত্রেই অর্থের সন্ধানে গেল। ইহাতে সকল বাঙালী ভদ্রপরিবারেরই আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইল, অবশ্য কাহারও বেশী কাহারও বা কম। এই ব্যাপারটার সবিস্তারে আলোচনা এই বই-এর পক্ষে অবান্তর। দ্বিতীয় যে-সন্ধান আমার আলোচ্য বিষয় নবলব্ধ অর্থই উহার বৈষয়িক অবলম্বন, সেজন্যই উহার উল্লেখ করিতে হইল।

পরবর্তী সন্ধান নারীর সন্ধান। উহা অর্থান্বেষণের অন্তত পঞ্চাশ বছর পরে দেখা দিল। অর্থান্বেষণ ছিল সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার কর্মযোগ, নারীর সন্ধান হইয়া দাঁড়াইল পুরুষের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভক্তিযোগ। অবশ্য তেমনই পুরুষের ভালবাসা পাওয়া বাঙালী নারীরও চরম কাম্য হইল। প্রভাতকুমার তাঁহার একটি গল্পে এক ষোড়শী উপেক্ষিতা বধূর দুঃখের কথা এইভাবে বলিয়াছেন,—'তাহার আত্মীয়গণের, সখিদের স্বামীর ভালবাসার কথা সোহাগের কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। মনে হইত, কি পাপ সে করিয়াছে যাহার জন্য ঈশ্বর তাহাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছেন?' নারীর প্রেমে বঞ্চিত হইলে পুরুষের হৃদয়বেদনাও ইহার অপেক্ষা কম হইত না। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে নারীর সন্ধান মনোবৃত্তি-সম্পন্ন বাঙালী যুবকের পক্ষে মানসিক জীবিকার মত হইয়া গেল।

এই সন্ধানের পিছনে প্রধানত যে-বাসনা ছিল, তাহা জীবনে পূর্ণতা আনা। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'গোরা' উপন্যাসে বিনয়ের মুখে দিয়াছিলেন। সে গোরাকে বলিয়াছিল,—

> 'আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম—যে-কারণেই হউক, আমাদের মধ্যে এই প্রেমের আবির্ভাব দুর্বল—সেই জন্যই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত—আমাদের কি আছে তাহা আমরা জানি না, যাহা গোপনে আছে তাহাকে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, যাহা সঞ্চিত আছে তাহা ব্যয় করা আমাদের অসাধ্য। সেই জন্যই চারিদিকে এমন নিরানন্দ, এমন নিরানন্দ।...'

এই কথাগুলি আমি 'বাঙালী জীবনে রমণী'তে উদ্ধৃত করিয়াছি, ও ব্যাপারটার আলোচনাও করিয়াছি।* সুতরাং এই প্রসঙ্গে প্রেমের আকাঙ্ক্ষার

* ৫ম মুদ্রণের ১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এই দিকটার কথা আর কিছু বলিব না। তবে নারীর সন্ধানের আরও একটা দিক ছিল, তাহার সংক্ষেপে আলোচনা সেই বই-এ করিয়াছিলাম। সেই দিক সম্বন্ধে আরও কিছু বলা প্রয়োজন।

জীবনকে পূর্ণতা দিবার ইচ্ছা যেমন নারীর সন্ধানের একটা মানসিক কারণ হইয়াছিল, তেমনই উহার একটা লৌকিক কারণও ছিল—তাহা তখনকার বাঙালী জীবনের অনিবার্য দুঃখ হইতে আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছা। এই দুঃখ আসিত প্রথমত ধনী বা পরাক্রান্ত দেশবাসীর অবিচার, অবজ্ঞা ও অত্যাচার হইতে; দ্বিতীয়ত আসিত, ইংরেজের অধীনতা ও ভারত-প্রবাসী ইংরেজের অহঙ্কৃত আচরণ হইতে। এই দুইটির কোনটিরই প্রতিকার করিবার সাধ্য সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর ছিল না, অথচ এই দুঃখ ভুলিয়া না থাকিতে পারিলে এই শ্রেণীর বাঙালীকে দিনরাত তামসিক অশুচিতার মধ্যে থাকিতে হইত। ইহা হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার একটি মাত্র উপায় বাঙালী পুরুষের আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তাহা নারীর প্রেম ও করুণা।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার গ্লানি যে বাঙালী পুরুষের ভালবাসা পাইবার আকুলতার পিছনে ছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটির প্রথম প্রকাশিত পাঠে বলিয়াছিলেন। তাহা প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকার ১৩০০ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় (ইংরেজী ১৮৯৪ সন, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী)। তখন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত (ব্যারিস্টার ও ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের পুত্র) ও অন্যেরা উহাতে আপত্তি তোলেন। তাঁহাদের আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি প্রথমে যে ভাবে লিখিয়া-ছিলেন সেই ভাবেই 'চিত্রা'তে প্রকাশিত করেন। কবিতাটির প্রথম পাঠ লেখার তারিখ ১৪ই মাঘ, ১৩০০ সন। সুতরাং লিখিবার অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি 'সাধনা'র জন্য পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করিয়া লেখেন। ইহার পিছনে তাঁহার নিশ্চয়ই একটা প্রবল ধারণা ও অনুভূতি ছিল। আমি 'বাঙালী জীবনে রমণী'তে লিখিয়াছি যে, 'রবীন্দ্রনাথ এই আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া ভুল করিয়াছিলেন'। এইরূপ মনে করিবার কারণও দিয়াছি। (৫ম মুদ্রণের ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) উহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া প্রথম ছাপা পাঠে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিব। কবিতাটি সেই পাঠে আরম্ভ হইয়াছিল এইভাবে,—

'কি হবে শুনিয়া, সখী, বাহিরের কথা—
অপমান অনাদর ক্ষুদ্রতা দীনতা
যত কিছু। লোকাকীর্ণ বৃহৎ সংসার,
কোথা আমি ঘুরে মরি এক পার্শ্বে তার
এক কণা অন্ন লাগি! প্রাণপণ করি
আপনার স্থানটুকু রেখেছি আঁকড়ি
জনস্রোত হতে। সেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন; সদা বহি

সংসারের ক্ষুদ্রভার, কভু অনুগ্রহ
কভু অবহেলা সহিতেছি অহরহ—
সেই শত সহস্রের পরিচয় হীন
প্রবাহ হইতে এই তুচ্ছ কর্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া নাহি জানি
কোন্ ভাগ্যক্রমে।......'

ইহার পর ইংরেজের অধীন হইবার জন্য যে-দুঃখ তাহার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

'......ক্ষুদ্র আমি
কর্মচারী ; বিদেশী ইংরাজ আমার স্বামী
কঠোর কটাক্ষ-পাতে উচ্চে বসি হানে
সংক্ষেপ আদেশ, মোর ভাষা নাহি জানে,
মোর দুঃখ নাহি মানে—রাজপথে যবে
রথে চড়ি ছুটে চলে সৌভাগ্য গরবে
অজস্র উড়ায়ে ধূলি, মোর গৃহ কভু
চিনিতে না পারে।'

এই প্রভুকে, প্রেমের গৌরবে গর্বিত কিন্তু অন্যদিকে গৌরবহীন বাঙালী বলিল,—

"যাও ছুটে যাও, খেলো গিয়ে খেলাঘরে,
কর নৃত্য দীপালোকে প্রমোদ সাগরে
মত্ত ঘূর্ণ্যবেগে, তপ্তদেহে অর্ধরাত্রে
সঙ্গিনীরে লয়ে ; উচ্ছ্বসিত সুরাপাত্রে
তুষার গলায়ে কর পান, থাক সুখে
নিত্যমত্ততায়,"

'এত বলি হাস্যমুখে
ফিরে আসি আপনার সন্ধ্যাদীপ জ্বালা
আনন্দ মন্দির-মাঝে, নিভৃত নিরালা,
শান্তিময়-প্রভু, হেথা কেহ নহ তুমি
আমি হেথা রাজা।........'

কবিতাটির এই অংশগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহেব বন্ধুগণ যে আপত্তি করিয়াছিলেন তাহার মর্ম তিনি নিজে এইভাবে দেন—'সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমানক্ষুন্ন নিরুপায় কেরানীর মুখে এ-কথাগুলো যেন অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শোনায়, উহার সহজ স্বতঃপ্রবাহিত সর্ববিস্মৃত কবিত্ব-রসটি থাকে না।'

আমি প্রভাতকুমারের গল্প সম্বন্ধে রক্ষণশীল অক্ষয়চন্দ্র যে আপত্তি করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম যে উহা মূঢ়তা না ভণ্ডামি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বাঙালী সাহেবদের আপত্তি সম্বন্ধেও এই কথাই বলিব।

রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি এইভাবে লিখিয়া বাঙালী জীবনের বাস্তব অস্তিত্বের সহিত বাঙালীর নূতন প্রেমকে যুক্ত করিয়াছিলেন। এ-দুয়ের মধ্যে সেই যোগের সূত্র কাটিয়া দিলে প্রেম ফানুসের মত আকাশে উঠিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহার মধ্যে সত্য কিছু থাকে না; প্রচলিত বাংলায় যাহাকে 'কাব্যি করে কথা কওয়া' বলে উহা তাই হইয়া যায়; সত্যকার জীবন যাহা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমি প্রথম পাঠের সবটুকু পড়িতে বলিব।

'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটির প্রথম মুদ্রিত পাঠের সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম এই জন্য যে, বাঙালী পুরুষের নারীর সন্ধান সম্বন্ধে আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা চরম ও সর্বোচ্চ রূপে দেখিলাম একজন বাঙালী লেখকের মধ্যে যিনি 'প্রেমের অভিষেক' গল্পের নায়কের মত বাঙালী। সেই বাঙালী আর কেহ নন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি সম্প্রতি বুঝিয়াছি তিনি একান্ত দীন বাঙালী হইয়া জন্মিবার, ও প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত দীন বাঙালী থাকিবার জন্যই, তাঁহার সমস্ত গল্পে উপন্যাসে নারীর সন্ধানই করিয়াছেন। এই আকুল অন্বেষণই তাঁহার সমস্ত রচনার মূলে। বাঙালী বহুকাল ধরিয়াই বামাচারী ছিল, শরৎচন্দ্র বাঙালীর নবজীবনের নবীন বামাচারী। এই কথাটা না বুঝিলে, বা না স্বীকার করিলে, তাঁহার রচনার অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। আমিও প্রথমে বুঝি নাই, যদিও আমি শরৎচন্দ্রের গল্প ১৯১২ সন হইতে পড়িতে আরম্ভ করি। শরৎচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয়ের সমস্ত ইতিহাসটা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্রের রচনা আমি প্রথম পড়ি ১৯১২ সনের প্রথম দিকে। আমরা তখন দুইটি বাংলা মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম—একটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য', অপরটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'। শরৎবাবুর যে গল্পটির কথা বলিতেছি উহা 'সাহিত্যে' বাহির হইয়াছিল—উহার নাম 'অনুপমার প্রেম'। তখনও শরৎবাবু প্রসিদ্ধ হন নাই। একমাত্র 'বড়দিদি' গল্পের দ্বারা তিনি তখন পরিচিত, সেও অল্প বাঙালীর কাছে। আমি তাহা পড়ি নাই। প্রথম যাহা পড়িলাম সেটি 'অনুপমার প্রেম'। আমি তখন পুরাতন দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমানে ক্লাস নাইন-এ) পড়ি, ম্যাট্রিকুলেশন দিতে দুই বৎসর বাকী। পড়িবার সময়ে গল্পের প্রথম দিকে অনুপমার উচ্ছ্বাস দেখিয়া খুব আমোদ অনুভব করিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গল্পটাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হইল—বিশেষ করিয়া চাকরকে মারিয়া অনুপমাকে যে কলঙ্ক দেওয়া হইল তাহা পড়িয়া।

আমার দূর সম্পর্কের এক মামা আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া বি-এ পড়িতে ছিলেন। তিনি গল্পটা দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, 'নীরু, এই লেখকের ওপর দৃষ্টি রেখো। এ কিন্তু খুব বড় লেখক হবে।' আমার এই মামার সাহিত্যবুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। ইহার পর ১৯১৩ সনের শেষের দিকে 'ভারতবর্ষে' আমি 'বিরাজ-বৌ' পড়ি। খুব করুণ কাহিনী মনে হইয়াছিল। এই গল্পের পরই শরৎবাবুর সাহিত্যিক খ্যাতি আসলে হইল। তিনি বাংলা

ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। এই বইটির পর 'পণ্ডিত মশাই' ও 'পল্লীসমাজে'র জন্য তাঁহার নাম আরও বাড়িল। বলা বাহুল্য, সেই বইগুলি আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু আমি এরপর 'শ্রীকান্ত' বা 'চরিত্রহীন' পড়ি নাই। আমাদের পরিবার ব্রাহ্মপন্থী হওয়াতে এই উপন্যাসগুলির প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল। কিন্তু দত্তা' উপন্যাস আমি ১৯১৮ সনে প্রকাশিত হইবার অল্প পরেই পড়িয়াছিলাম। খুব উপভোগ্য মনে হইয়াছিল। তবে উহার গভীর অর্থ তখন আমি এম-এ পড়িলেও ঠিক ধরিতে পারি নাই।

ইহার অল্প পরে হইতেই শরৎবাবুর লেখা সম্বন্ধে আমার একটা আপত্তি জন্মিতে লাগিল। এ-আপত্তি গুরুতর। ইহার বশে আমি অনেকদিন ধরিয়া শরৎবাবু সম্বন্ধে বিরূপ ভাব পোষণ করিয়াছিলাম। যদিও তিনি যে অতি উচ্চস্তরের গল্প ও উপন্যাস লেখক তাহা আমি কখনও অস্বীকার করি নাই।

সেই আপত্তি আমার এখনও যায় নাই। তবে এখন আমার মনে হয়, বিশেষ যে-দোষ গুলির জন্য শরৎবাবু সম্বন্ধে আমার বিরাগ জন্মিয়াছিল, তিনি সেগুলি অতিক্রম করিয়া অন্যদিকে এত ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন যে, পাঠক সেগুলিকে চন্দ্রের কলঙ্কের মত আংশিক দোষ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার লেখার এই উৎকর্ষ ও ধর্ম আমি সম্প্রতি বুঝিয়াছি।

প্রথমে আমি বিরাগের কারণগুলি বলি। তাঁহার গল্পে উপন্যাসে বেশ্যা ও বেশ্যাবৃত্তির কথা যে আছে, তাহা আমার বিরাগের কারণ হইতে পারিত, কারণ আমি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মদের মনোভাবের বশবর্তী হইয়া ছিলাম। সেজন্য আমি সারা জীবনেও দেশে কোনো থিয়েটার দেখি নাই। আমার বাল্যকালে অভিনেত্রীরা বেশ্যা বলিয়া থিয়েটারের প্রতি ব্রাহ্মপন্থীদের ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু এই কারণে বিরাগ আসলে হয় নাই এইজন্য যে, আমি শরৎবাবুর এই ধরনের উপন্যাস, যেমন 'চরিত্রহীন' পড়ি নাই। যে উপন্যাসে বেশ্যা জীবনের বিবরণ আছে উহাকে আমি উপন্যাস বলিয়া মনে না করিয়া সমাজতত্ত্ব বলিয়া মনে করিতাম। সুতরাং সেই বইকে উপন্যাস বলিয়া বিচার করি নাই।

আমার বিরাগের প্রধান কারণ ছিল শরৎবাবুর লেখার অন্য একটা দিক। সেটা কেউ দেখান নাই বলিয়া আমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে। আমি দেখিলাম যে, আগেকার সকল বড় বাঙালী লেখক হইতে শরৎবাবু বিভিন্ন এই ব্যাপারে যে, তিনি বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতার সাফাই গাহিয়াছেন যাহা, না বঙ্কিমচন্দ্র না রবীন্দ্রনাথ কেহই করেন নাই। এটা আশ্চর্য ব্যাপার। কারণ বাঙালী জীবন ও বাঙালী চরিত্রের গুরুতর দোষ যাহা, শরৎচন্দ্র তাহার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে এই সব দোষ সম্বন্ধে তাঁহার ঘৃণা ও ক্রোধ নির্মমভাবে প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। তিনি প্রচলিত বাঙালী পল্লীসমাজের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা ভয়াবহ। আমি পূর্ববঙ্গের পল্লী-জীবনের যে-সব নীচতা ও দোষ আছে তাহার ধারণা করিতে পারিয়া-

ছিলাম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পল্লীজীবন যে শরৎবাবুর বর্ণিত জীবনের মত পৈশাচিক হইতে পারে তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। সেজন্য আমি অনেক পশ্চিমবঙ্গবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, শরৎবাবুর বর্ণনা সত্য কিনা। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, তাহা সত্য। সুতরাং এ-কথা বলিতে পারি না যে, বাঙালীর সত্যকার পাপের ওকালতি শরৎচন্দ্র করিয়াছেন।

আবার এও বলিব, তিনি নিজের মন হইতে যে আদর্শচরিত্র বাঙালী পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার অপেক্ষা মহান চরিত্র কল্পনা করা যায় না। এমন কি এ-ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে ছাড়াইয়া যান নাই। প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ কি হইতে পারে সে সম্বন্ধে বাঙালী যদি কোনও ধারণা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে শরৎবাবুর সৃষ্ট অনেক চরিত্রের কথা মনে করিতে হইবে। একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগিয়াছে, সেটা এই। বাস্তব জীবনে বাঙালীর পল্লীজীবনের যে নীচ ও ঘৃণ্য রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই কি তিনি অলৌকিক মহত্ত্বপূর্ণ বাঙালী পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিব না। যে-জিনিষটা তাঁহার সমস্ত লেখাতে জাজ্বল্যমান তাহা বাঙালীর গুরুতর দোষ সম্বন্ধে তাঁহার ক্রোধানল। তাঁহার ক্রোধ সেই বাঙালী আচরণকে শুধু নিষ্ঠুর ও ক্রূর করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই, বীভৎস করিয়াছে। ইহা কেন? সেই বীভৎসতার সম্মুখে তিনি তাহার কল্পিত আদর্শে সৃষ্ট পুরুষ ও নারীকে স্থাপন করিয়াছেন। এই আদর্শ পুরুষ ও নারীরা অধিকাংশই যুবক-যুবতী। ইহা কেন করিলেন? শুধু বাঙালী জীবনের স্থায়ী দোষগুলিকে উহাদের সহিত তুলনায় আরও ঘৃণ্য করিবার জন্য, না সেই ঘৃণ্য সামাজিক অবস্থা হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় কোনোমতেই নাই বুঝিতে পারিয়া এক কল্পিত মনুষ্য-মহত্ত্বের লোকে শরণ লইবার জন্য? এই প্রশ্নেরও উত্তর আমি দিতে পারিব না। তবে এ-পর্যন্ত শরৎবাবুর সহিত আমার কোনও বিবাদ ছিল না।

বিবাদ বাধিল তাঁহার প্রায় সমস্ত লেখাতে তৃতীয় একটা ব্যাপার থাকার জন্য। সেটা দুর্বলচরিত্র বাঙালীর, যাহাদের শরৎচন্দ্র মূলত ভাল বলিয়া মনে করিয়া ক্ষমা বা করুণার যোগ্য মনে করিয়াছিলেন তাহাদের, সাফাই গাওয়া। আমার মনে হইত এই অপদার্থ বাঙালীগুলি অপদার্থতা হইতেই এমন সব অন্যায় করে যাহা কোনদিকেই ক্ষমার্হ নয়। অথচ দেখিতাম, শরৎবাবু ইহাদের ওকালতি করিতেছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা আমাকে অতি অল্পবয়সেও অত্যন্ত আঘাত করিত, এবং করিত এই কারণে যে আমি দেখিতাম উহাদের অন্যায় কাজ সর্বদাই কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতা হইতে ঘটিতেছে। ইহার দুই-চারিটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব—বিশেষ করিয়া সেগুলি যে-গুলিকে আমি ক্ষমার্হ মনে করি নাই।

প্রথম দৃষ্টান্ত 'পল্লীসমাজে' বিশ্বেশ্বরীর মুখে রমার সাফাই। রমেশ নিজে রমাকে এই কথা বলিয়াছিল,—

'আমিও কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি একদিন যেন তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা না করতে পারায় যে আমার ব্যথা, সে শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন।'

এই রূপ কথা একমাত্র তাহারই বলিবার অধিকার আছে, অন্যায় যাহার প্রতি করা হইয়াছে। অন্যে যদি ক্ষমার কথা বলে তবে সেই অন্যায়ের ভাগী হইবে সে। অথচ শরৎবাবু বিশ্বেশ্বরীকে দিয়া উপদেশ দেওয়াইলেন,—

'তোর ওপর আমার এই আদেশ রইল রমেশ, তাকে যেন তুই ভুল বুঝিস নে। যাবার সময় আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে যেতে চাইনে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনও অবিশ্বাস করিস নে যে, তার বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তোর আর কেউ নেই।'

এই কথাগুলির জন্য বিশ্বেশ্বরীর উপরও আমার বিরাগ জন্মিয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত 'চন্দ্রনাথ' গল্প হইতে। চন্দ্রনাথ চরম কাপুরুষতার বশে সরযূর উপর অত্যন্ত অন্যায় করিল। নিরপরাধা, গর্ভবতী সরযূকে ত্যাগ করিল। যে বৃদ্ধ সরকার সরযূকে কাশীতে নির্বাসন দিতে যাইতেছিল তাহার সীতাদেবীর কথা মনে হইয়াছিল। তাই যখন চোখের জল বহিতে লাগিল, সে চোখ মুছিয়া মনে মনে বলিল, 'আমি ভৃত্য—তাই আজ আমার এই শাস্তি।'

কিন্তু চন্দ্রনাথ যখন পরে অনুতপ্ত হইয়া সরযূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল তখন সে তাহার অনুতাপের গরিমায় ভুলিয়া গেল যে, সে সরযূর উপর কত বড় অন্যায় করিয়াছিল, এবং গায়ে পড়িয়া অশোভন অভিমান করিল।

সে সরযূকে পতিতা বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিল, সুতরাং সরযূ ভাবিয়াছিল সে তাহার হাতে ভাত খাইবে না, লুচি দিয়াছিল। ইহাতে দোষ ধরিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, 'দুপুর বেলা আমি কি লুচি খাই ?...আমি কি খাই তাও বোধহয় ভুলে যাওনি ?'

পীড়াপীড়ির পর সরযূ যখন ভাত না দেওয়ার কারণটা দেখাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার হাতে খাবে ?' তখন চন্দ্রনাথ বলিল,—'সরযূ, দুপুরবেলা আমার চোখে জল না দেখলে কি তোমার তৃপ্তি হবে না ?'

আমি গল্পটা ১৯২০ সনে পড়ি। তখনই মনে হইয়াছিল চন্দ্রনাথকে সামনে পাইলে গালে এক চড় কষাইয়া বলি, 'ভণ্ড, কাপুরুষ, ন্যাকামি দেখাবার আর জায়গা পেলে না ?'

ইহার অপেক্ষাও আমার বিরক্তি হইয়াছিল 'অরক্ষণীয়া' গল্পটির উপসংহারের পরিবর্তন দেখিয়া। গল্পটি আমি ১৯১৬ সনে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবার সময়েই পড়ি। বহুকাল পুস্তকাকারে কি ভাবে প্রকাশিত হইল তাহা দেখি নাই। কিন্তু যখন দেখিলাম তখন শরৎবাবুর উপর আমার অত্যন্ত রাগ হইল। গল্পের উপসংহার প্রথমে কি-ভাবে হইয়াছিল, তাহা আজকালকার পাঠক-পাঠিকা দেখেন নাই, তাঁহারা বই-এ যে-ভাবে এখনও

প্রকাশিত হইতেছে তাহাই দেখিয়াছেন। সুতরাং প্রথমে সেই উপসংহারের কথা বলিতে হইবে।

কিন্তু তাহার আগে গল্পপড়া সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কিছু বলিব। সাধারণত যাঁহাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তাঁহাদের প্রায় সকলেই বলেন যে, 'পড়েছিলাম, কিন্তু মনে নেই'। আমি জানি তাঁহারা দুপুরে বা রাত্রিতে ঘুম আনিবার জন্য গল্প পড়েন, কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য কেহ 'অরক্ষণীয়া'র মত গল্প পড়িতে পারে না। তাহা হইলে, যাহার কোনও অনুভূতির ক্ষমতার লেশমাত্রও আছে তাহারও ইহা পড়িলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিবে, ঘুম আসিলেও দুঃস্বপ্নের কারণ হইবে। দ্বিতীয় এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা আছেন যাঁহারা শখের সমাজ সংস্কারক হইবার জন্য এই ধরনের গল্প পড়েন। তাঁহারা মনে করেন এই সব গল্প পড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজিত হইয়া থাকিলেই, সমাজের প্রতি তাঁহাদের যে কর্তব্য আছে তাহা পালন করা হইল।

আমি পরে কি হইবে না জানিয়া যখন গল্পটি প্রথমে পড়ি তখন এই রূপ-হীনার লাঞ্ছনায় আমার যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহার জন্য সেদিন পর্যন্ত সমস্ত গল্পটি আবার পড়িতে সাহস পাই নাই। শুধু পরিবর্তিত আকারে অতুল যে বক্তৃতা করিয়াছিল উহা পড়িয়াছিলাম। এই অধ্যায় লিখিবার জন্য গল্পটা আবার পড়িতে গিয়া আমার প্রথমবারের মত কষ্ট হইয়াছে। এই কষ্টের অনুভূতি না আসিতে পারে একমাত্র ঘটনাগুলিকে যদি কল্পিত বলিয়া মনে করা যায়। আমি তাহা পারি নাই, ধরিয়া লইয়াছি, এই সব ঘটনা শুধু যে সম্ভব তাহা নয়, সচরাচর দেখাও যাইত।

এইবার প্রথম প্রকাশের সময়ে গল্পটির উপসংহার কি ছিল তাহার কথা বলিব। জ্ঞানদার মাতাকে যখন অতুল ও অন্যান্য আত্মীয়েরা দাহ করিতে গঙ্গাতীরে লইয়া গেল, তখন জ্ঞানদাও পিছন পিছন গেল। কিন্তু সে চিতার কাছে না বসিয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া বসিয়া রহিল। চিতা যখন নিবিল তখন অতুল জ্ঞানদার সন্ধানে গিয়া দেখিল, তাহার দেওয়া কাঁচের চুড়ি কয়গাছা ভাঙ্গা, মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে, জ্ঞানদা নাই। সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া নিজের লাঞ্ছিত জীবনের অবসান করিয়াছে।

শরৎবাবু উহাকে পরিবর্তন করিলেন এইভাবে। অতুল দেখিল, জ্ঞানদা সেই চুড়ি গুলি ভাঙ্গিয়া বসিয়া আছে। সে সেই ভাঙ্গা টুকরাগুলি তুলিয়া লইয়া ভাঙ্গার জন্য জ্ঞানদাকে অপরাধী করিয়া এক বক্তৃতা করিল। অতুল তাহার প্রতি যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহার ক্ষমা নাই—শুধু যে তাহাকে অবহেলাই করিয়াছিল তাহা নয়, তাহাকে অন্যের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অপমানের হাত হইতে রক্ষা করে নাই, নিজেও উপহাস করিয়াছিল ও গঞ্জনা দিয়াছিল। সেই অসহনীয় অপমানের পর শরৎবাবু নিজেই এই দেবীতুল্যা রূপহীনা বাঙালী মেয়েটির সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

'শুধু যাঁহার কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, সেই অন্তর্যামীর

চোখ দিয়া হয়ত বা এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তিনিই শুধু জানিলেন—যে মেয়েটা আজন্ম লজ্জায় কখনও মুখ তুলিয়া কথা কহিতেই পারিত না, সে কেমন করিয়া আজ সকল লজ্জায় পদাঘাত করিয়া নিজের ওই স্বাস্থ্য-শ্রী-হীন দেহটাকে স্বহস্তে সাজাইয়া আনিয়া ওই অতি বৃদ্ধটার পদে ঠকাইয়া বিক্রি করিতে গিয়াছিল। কিন্তু বিক্রী হইল না—ফাঁকি ধরা পড়িল। আজ তাই সবাই ছি-ছি করিয়া ধিক্কার দিয়া গেল, কেহই ক্ষমা করিল না। কিন্তু অন্তরে বসিয়া যিনি সর্বকালের সর্বলোকের বিচারক, তিনি হয়ত এই দুর্ভাগা বালিকার অপরাধের ভার আপনার শ্রীহস্তেই গ্রহণ করিলেন।'

সে তাহার মাতার দুঃসহ ভার হইয়া রহিয়াছে, তাই মাতাকে মুক্তি দিবার জন্য জ্ঞানদা সকল আত্মসম্মান ও অপমান-বোধ বিসর্জন দিয়াছিল। শেষে যখন মাতার মৃত্যুতে সে মুক্তি পাইল, তখন সে আবার আত্মসম্মান ফিরিয়া পাইল, তখন তাহার আর সেই লাঞ্ছিত জীবন রাখিবার কোন ইচ্ছা রহিল না। সকল দুর্বলমনা যুবা বাঙালী, অতুলের অপরাধ নিজেদের সকলেরই অপরাধ মনে মনে জানিয়া এই শাস্তি সহ্য করিতে চাহিল না। শরৎবাবু তাহাদিগের এই দুর্বলতার প্রতি দয়া দেখাইলেন কেন ?

আমি এতদিন বুঝি নাই। অনেক চিন্তা করিয়াছি। শরৎবাবু নিজেও আংশিক ভাবে দুর্বলচিত্ত বাঙালী ছিলেন, তাহা আমি জানিতাম। তবু তিনি দুর্বলতার বশেই গল্পটির উপসংহারের পরিবর্তন করিয়াছিলেন—ইহাই শেষ কথা মনে করিয়া তাঁহাকে অপমান করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছিলাম। এখন পরিবর্তনের কারণ হয়ত আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। যদি তিনি দেখাইতেন যে, নিরপরাধ জ্ঞানদা এইভাবে জীবনের অবসান করিল, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরের বিচারে বা করুণায় আস্থা রাখিতে পারিতেন না, তাঁহাকে 'পণ্ডিতমশাই' গল্পে চরণকে চিতায় দগ্ধ হইতে দেখিয়া কেশব যে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, 'যারা কথায় কথায় বলে ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য, তারা শয়তান, হারামজাদা, জোচ্চোর! তাহাই বলিতে হইত। শরৎবাবু ঈশ্বরের বিচারে ও দয়ায় এত অবিশ্বাসী হইতে পারেন নাই। আমি গল্পটি পরিবর্তন করিবার এইটি একমাত্র ন্যায্য কারণ বলিয়া মনে করি। তবু বলিব, শরৎবাবুর আগে কোনও বড় বাঙালী লেখক বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতার প্রতি করুণা দেখান নাই।

শরৎবাবুর লেখা পড়িয়া এই সব কারণে তাঁহার উপর আমার বিরাগ জন্মিয়াছিল। তাহার পর দুই তিন বার তাঁহার বাজেশিবপুরের বাড়ীতে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমার দাদার শ্বশুর-মহাশয় শরৎবাবুর লেখার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি ঢাকার উকিল ও জমিদার ছিলেন। কলিকাতা আসিলেই তিনি শরৎবাবুর দর্শন লাভ করিতে যাইতেন। তিনি আমাকেও খুবই স্নেহ করিতেন। তাই ১৯২৪-২৫ সনে আমাকে বার দুই-তিন শরৎবাবুর নিকট লইয়া যান।

প্রথমবার যখন গেলাম তখনকার একটা সামান্য ঘটনার কথা আগে বলি। বাড়ীটার সামনে একটা বেশ বড় উঠান ছিল, উহার অন্যদিকে একটি চাতাল ছিল। ফটক পার হইয়া তাহার কাছে গিয়া দেখি, একটি নয়-দশ বছরে মেয়ে বসিয়া আছে। রকম-সকম খ্‌বই সাধারণ ও গ্রাম্য, কিন্তু মেয়েটি ফর্সা ও স্‌শ্রী। তাহার চোখ দ্‌টি একট্‌ কটা। সে বড় বড় চোখে আমাদের দিকে শ্‌ধ্‌ তাকাইয়া রহিল, একটিও কথা বলিল না। আমি শ্‌নিয়াছিলাম, শরৎবাব্‌ বিবাহ করেন নাই, উপপত্নীব সহিত বাস করেন। ভাবিলাম, এইটি সম্ভবত উপপত্নীর সন্তান। এখন জানিয়াছি ১৯১৩ সনে তিনি একটি বিধবাকে বিবাহ করেন। স্‌তরাং সেই নয়-দশ বছরের মেয়েটি তাঁহার সেই বিবাহের সন্তান হওয়া সম্ভব। অবশ্য আমি আর কিছ্‌ জানি না।

মেয়েটির সামনে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে উঠানের একদিকের একটা ঘর হইতে খালি গায়ে একটি ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। যখন দাদার শ্বশ্‌র-মহাশয় তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, তখন ব্‌ঝিলাম ইনিই শরৎবাব্‌। তিনি 'আস্‌ন, আস্‌ন' বলিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গিয়া একটি ছোট ঘরে বসাইলেন। আসবাবপত্রের মধ্যে তিনটি ছোট শেল্‌ফ—তাহাতে বই রহিয়াছে। মেজেতে মাদ্‌র পাতা। আমরা উহাতে বসিলাম, আমাদের দিকে ম্‌খ করিয়া শরৎবাব্‌ও বসিলেন। আমি শ্‌নিয়াছিলাম যে তিনি রসিক লোক, নানা খোস গল্প করিতে পারেন। কিন্তু আমরা যতদিনই গিয়াছি তিনি আমাদের কাছে বক্তৃতাই করিলেন তাঁহার প্রবন্ধের ধরনে। বোধহয় আমাদের বেরসিক বাঙ্গাল মনে করিয়াছিলেন। এই সব বক্তৃতা শ্‌নিবার পর তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আমার শ্রদ্ধা মোটেই বাড়িল না।

এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ আমি আমার ইংরেজীতে লেখা আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে দিয়াছি। (উহার ১০১-১০৫ প্‌ষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) সমস্ত ব্যাপারটা প্রীতিজনক নয়, এবং শরৎবাব্‌র প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা দেখানো আমি উচিত মনে করি না। তাই যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার আভাসমাত্র দিব। প্রথমেই দেখিলাম, যে-সব বাঙালী কিছ্‌ পড়াশোনা করিয়াছে, তিনি তাহাদেরই মত পাণ্ডিত্যাভিমানী, অথচ পাণ্ডিত্য এমন কিছ্‌ নয়। তারপর দেখিলাম, বাঙালী 'ন্যাশান্যালিস্ট'-এর মত তিনি সংকীর্ণ, অন্য ভারতবাসীর, বিশেষত পাঞ্জাবীর উপর অবজ্ঞা পোষণ করেন। শিক্ষিত বাঙালীর এই দ্‌ইটি দ্‌র্বলতা শরৎবাব্‌ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবেন না, তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই। সর্বোপরি আমার খারাপ লাগিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি—যাহা আমার কাছে অভদ্রতার মত মনে হইয়াছিল। তাঁহার বিরাগের বিশেষ কারণ দেখাইলেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীর জীবনের অবসানে। শরৎবাব্‌র মত এই যে, রোহিণীকে এইভাবে হত্যা করানো বঙ্কিমচন্দ্রের উচিত হয় নাই। এই আপত্তি স্পষ্ট করিয়া তিনি বলিয়াছেন একটি প্রবন্ধে স্‌তরাং আমি সেটিই উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিলেন—

'আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় "কৃষ্ণকান্তের উইলে"

রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী কিছুই রইল না। ভালই হলো। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।'

শরৎবাবু মনে করিয়াছিলেন যে, এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমের 'কবিচিত্ত যেন ওঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।' এই মতের জন্য কেহই শরৎবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারে না, কারণ মতটা তাঁহার সমস্ত লেখাতে নারীর প্রতি যে মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় তাহার সহিত সঙ্গত।

শরৎচন্দ্রের নারীর সন্ধানই যখন এই অধ্যায়ের মূল বিষয়, তখন এই প্রসঙ্গে আর কিছু লিখিব না। কেবল শরৎবাবুর জ্ঞান ও সাহিত্যিক প্রতিভার মধ্যে যে কয়েকটা অসম্পূর্ণতা বা অভাব ছিল তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহার আসল কীর্তির কথা বলিব।

শরৎবাবুর সত্যকার কৃতিত্ব ও কীর্তি বুঝিবার জন্য গোড়াতেই একটা কথা মানিয়া লইতে হইবে। তিনি বুদ্ধি বা বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন না, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে 'ইন্টেলেকচুয়্যাল' বলে তিনি তাহা একেবারেই ছিলেন না। সেজন্য তাঁহার গল্প-উপন্যাসের সহিত তাঁহার প্রবন্ধ বক্তৃতা ইত্যাদির কোনও তুলনা করা চলে না।

প্রবন্ধাদি রচনায় তিনি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী যেরূপ হইতে পারিত তাহার ঊর্ধ্বে পৌঁছিতে পারেন নাই। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটির বক্তব্যের সঙ্গে তাঁহার সমস্ত গল্পে-উপন্যাসে নারী সম্বন্ধে যে-ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তুলনা করিলে সেটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রবন্ধটিতে এক ধরনের বিদ্যাবত্তা প্রকাশের চেষ্টা থাকিলেও উহা গভীর কিছু নয়। এমন কি তাঁহার দীর্ঘ উপন্যাসগুলিতে যেখানে যেখানে তত্ত্বের পরিবেশন হইয়াছে, সেখানে উপন্যাস-গুলিরও উৎকর্ষ কমিয়া গিয়াছে। এই সবই শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের স্বভাবসিদ্ধ তর্কাতর্কি, কথা-কাটাকাটি ও কচ্‌কচি। উহা বাঙালীর তাস পাশা বা খুব উঁচুদরের হইলে দাবা খেলার মত। এই ধরনের আলোচনায় সময় কাটানো যায় বটে, কিন্তু জীবনের কোনও সহায়তা হয় না। তবে এটা শরৎ-বাবুরই বিশিষ্ট দোষ নয়, উহা বাঙালীর জাতীয় অক্ষমতা। সেজন্যই বাঙালীর মানসিক সৃষ্টির মধ্যে কবিতা, গল্প-উপন্যাস ও গান ছাড়া কিছুই টিকে নাই, টিকিতেছে না। শরৎবাবু তাঁহার প্রবন্ধ ইত্যাদিতে যে-সব কথা বলিয়াছেন, সেই ধরণের আলোচনা আমি ১৯২৫ সন হইতে ১৯৪২ সন পর্যন্ত শুনিয়া খুবই ক্লান্তি বোধ করিতাম। বুদ্ধি দিয়া নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সাদা চোখে দেখিবার শক্তি না থাকাতেই বাঙালীকে আত্মঘাতী হইতে হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বাঙালী মনের এই অক্ষমতার বিস্তারিত আলোচনা করিব। সুতরাং এখানে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

শরৎবাবু সম্বন্ধে দ্বিতীয় যে-কথাটা মনে রাখা দরকার সেটা একদিক হইতে খুবই আশ্চর্যজনক। তিনি লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ১৯১০ সনের পরে। বোধহয় তাঁহার প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে বেশী হয় ১৯২০ সনের পরে। কিন্তু তিনি আসলে এই যুগের মানুষ মোটেই ছিলেন না। ১৯০৫ সনের পরেকার অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পরেকার বাঙালী জীবনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সমস্ত সামাজিক চিত্র উহার আগেকার যুগের। যখন তিনি পরেকার যুগের আচার ব্যবহারের পরিচয় দিতে গিয়াছেন তখনই সে-সব বর্ণনা ঝাপসা অথবা বানানো বলিয়া মনে হয়। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৭৬ সনে এবং ত্রিশ বৎসর বয়স হয় ১৯০৬ সনে। এই বয়সই তাঁহার জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা, দুঃখ কষ্ট, সংগ্রামের কাল। এই যুগের সমস্ত বাহ্যিক অভিজ্ঞতা ও আভ্যন্তরীণ অনুভূতি তাঁহার মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল। তিনি উহার বাহিরে আর কিছু কায়মনে অনুভব করেন নাই। সুতরাং তিনি আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের বাঙালী যুবক, ও তাহাই সারাজীবন ছিলেন।

১৯০৫ সনের পরেকার বাঙালী জীবনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অপরিচয় আরও ভাল করিয়া বোঝা যায় তাঁহার রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে রচনা বা আলোচনা পড়িয়া। না স্বদেশী আন্দোলন, না বাঙালী বিপ্লববাদীদের কার্যকলাপ, না মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ, কোনটির সহিতই তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই, সুতরাং সত্যকার জ্ঞানও জন্মে নাই। এটা দেখা গেল সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তাঁহার 'পথের দাবী' উপন্যাসে। আমি শুনিয়াছি, এই উপন্যাসটি পড়িয়া কিরণশংকর রায় নাকি বলিয়াছিলেন, 'শরৎবাবু, আপনি এই বইটা নিশ্চয়ই দীনেন্দ্রকুমার রায়কে দিয়ে লিখিয়েছেন।' কিরণবাবুর বাংলার রাজনৈতিক জীবনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিকের সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল, তাহার উপর তিনি অত্যন্ত রসিক লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি 'পথের দাবী' সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎবাবু এই প্রসঙ্গে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা দেখান নাই। শুনিয়াছি ইহার পর তিনি কিছুকাল কিরণবাবুর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও 'পথের দাবী' পড়িয়া লিখিয়াছিলেন, 'এ বই প্রবন্ধের আকারে লিখিলে মূল্য ইহার সামান্যই থাকিত।' কিন্তু তিনি বইটিকে উপন্যাস হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। শরৎচন্দ্র ইহাতে ভরসা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি সে-ভরসাও করি না।

রাজনৈতিক ব্যাপারে আসলে শরৎচন্দ্র 'আনন্দমঠে'র সন্তান। উপন্যাস হিসাবে বিচার করিয়া তিনি 'আনন্দমঠে'র প্রশংসা করেন নাই। কিন্তু সে-বইটির মূল বক্তব্য যাহাই হউক, উহার মানসিক ফল অন্যভাবে সকল বাঙালীর মধ্যেই দেখা দিয়াছিল। কেহই উহার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই কার্যক্ষেত্রে বাংলার ইতিহাসে ইহার দুইটি ফল দেখা গেল—ধর্মের ক্ষেত্রে

বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি।

বিবেকানন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যানন্দের নূতন রূপ, চিকিৎসক-গুরু তাঁহাকে যে-পথ ধরিতে বলিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিবার পর তিনি যাহা হইলেন বা হইতে পারিতেন তাহাই বিবেকানন্দের মধ্যে দেখিলাম। তবে তাঁহার মুস্কিল হইল ইহা হইতে যে, তিনি ছিলেন কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী। এই নির্ভাজ বিবেকানন্দ বাঙালীর দ্বারা গৃহীত হইলেন না। তাঁহাকে তাই ভক্ত ও সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের শরণ নিতে হইল। ইহাতে বিবেকানন্দ দুই কুলই হারাইলেন।

শরৎবাবু হয়ত যুগান্তর বা অনুশীলনে যোগ দিতেন। কিন্তু তখন তাঁহার যে-বয়স হইয়াছিল, তাহাতে এই পথ ধরা তাঁহার পক্ষে সম্ভব আর ছিল না। তাই তিনি 'আনন্দমঠে' শান্তি যে-উপদেশ দিয়াছিল তাহা মানিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র-ধর্মের জন্য তিনি শান্তির উপদেশ অপেক্ষা শান্তিকেই বড় বলিয়া মনে করিলেন, এবং সারা জীবন সেই মানসী শান্তিরই পূজা করিলেন।

তবু 'আনন্দমঠ' হইতে লব্ধ বিপ্লববাদের মোহ তিনি কাটাইতে পারেন নাই। তিনি এক রাত্রি শেষে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'আচ্ছা, এই রেভোলুশ্যনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?' চিত্তরঞ্জনের উত্তর শরৎবাবুর লেখায় পাই—

> 'সম্মুখের আকাশ তখন ফরসা হইয়া আসিতেছিল, তিনি রেলিং ধরিয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—"এদের অনেককে অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক হয়ে যাবে। এই অ্যাক্টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তাছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিষ যাবে না, তখন আরও স্পর্ধিত হয়ে উঠবে, সামান্য মতভেদে একেবারে সিভিল ওয়ার বেধে যাবে। খুনোখুনি, রক্তারক্তি আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, শরৎবাবু।" '

(আসলে পঁচিশ বৎসরের জন্য নয়, বাঙালীর অনিষ্ট চিরকালের জন্য হইল। পরের রক্তারক্তির কথা চিত্তরঞ্জন আয়র্ল্যাণ্ডের ব্যাপার দেখিয়া বলিয়াছিলেন, উহা বাংলাদেশে হয় নাই।)

ইহার পর শরৎবাবু লিখিলেন, 'আমি নিশ্চয় জানি তাঁহার মুখ দিয়া সত্য ছাড়া আর কোন বাক্যই বাহির হয় নাই।' শরৎবাবুর এই প্রবন্ধটি ১৩৩২ সনের আষাঢ় সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। অথচ এই বৎসরেই তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার মুখে আমি নিজের কানে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা শুনিয়াছি ও তাহার পর শুনিয়াছিলাম এই কথা—'ভারতবর্ষের আর কাউকে দিয়ে কিছু হবে না, হবে কয়েকটি বাঙালী যুবক দিয়ে।' আসল কথা এই, রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনও সত্যকার অনুভূতি

শরৎচন্দ্রের ছিল না। এই বিষয়ে তিনি সব সময়েই সাময়িক ঝোঁকের মাথায় লিখিতেন বা বলিতেন।

একমাত্র গল্পে ও উপন্যাসেই শরৎচন্দ্রের মনের শক্তি এবং মাহাত্ম্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁহার কতকগুলি অক্ষমতা দেখা যায়। সেগুলি অংশত তাঁহার মানসিক ধর্মের জন্য, অংশত কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতার জন্য। এগুলি গুরুতর দোষ নয়। তবুও সত্যের খাতিরে উল্লেখ করিতে হইবে। ইহাও বলা দরকার যে, এইসব ছোটখাটো দোষ অতিক্রম করিয়া তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে যে উচ্চ স্তরে উঠিয়াছেন তাহা তাঁহার সাহিত্যিক গৌরবকে ক্ষুণ্ন না করিয়া আরও বড় করিয়া দেখাইবে।

প্রথম কথা এই যে, তিনি গল্পলেখক হিসাবে যত বড়, ঔপন্যাসিক হিসাবে তত বড় নন। ইহার জন্য তাঁহার উপন্যাসকে তুচ্ছ করা যায় না, এই নিকৃষ্টতা কেবলমাত্র তাঁহার গল্পের তুলনায়। আমি যখন রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাসের তুলনা করিয়াও এই কথা বলি, তখন শরৎবাবুর প্রতি কোন অশ্রদ্ধা দেখাইতেছি বলিয়া মানিব না।

দীর্ঘ উপন্যাস লিখিতে গেলে উহার সমস্ত ঘটনা ও সকল চরিত্রকে মূলত কেন্দ্রমুখীন করিতে হয়, এগুলি যত বিভিন্ন হয় এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আরও তত বেশী হয়। ইহার জন্য লেখকের মনে একটা প্রবল শক্তি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাহাকে 'সেণ্ট্রিপেটেল ফোর্স' বলে তাহা থাকিতে হয়, যাহা বিচিত্র ঘটনা ও বিভিন্ন চরিত্রের স্বাভাবিক 'সেণ্ট্রিফুগেল ফোর্স'কে লোপ করিয়া দিতে পারে। বাঙালী মনের এই শক্তি কম, তাই বাঙালী লেখক যদি বড় উপন্যাস লিখিতে যান তাঁহার অবস্থা হয় তাহার মত যে এক ঘোড়ার গাড়ী চালাইতে জানে, কিন্তু আট ঘোড়ার গাড়ী চালাইতে যায়। শরৎবাবু গল্পের টমটম্ হইতে জুড়ী পর্যন্ত বেশ চালাইতেন, কিন্তু আরও বেশী ঘোড়া জুড়িলে রাশ টানিয়া রাখিতে পারিতেন না। তাহা ছাড়া, দৈর্ঘ্যের সুযোগ থাকিলেই তাঁহার বক্তৃতার ঝোঁক বাড়িয়া যাইত।

ইহা ছাড়া ভদ্রবাঙ্গালী সমাজের যে-স্তর হইতে তিনি আসিয়াছিলেন ও যে-স্তরের জীবনযাত্রা ও চরিত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাহার বাহিরে গেলে তিনি ভুল করিতেন। তাঁহার অপূর্ব গল্প 'পথনির্দেশে'ও উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। শেষ দৃশ্যে হেম পীড়িত গুণীর ঘরে আসিয়া 'লোহার সিন্দুক খুলিয়া চেক-বই বাহির করিয়া ব্যবহৃত অংশগুলি পরীক্ষা করিয়া গুণীর দস্তখত মিলাইয়া' দেখিতে লাগিল। গল্পটি ১৯১৩ সনে প্রকাশিত, তখনও শরৎবাবুর উপার্জন এত হয় নাই যে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট রাখিবেন, সুতরাং জানিতেন না যে, চেকের 'কাউণ্টার ফয়েলে' সই থাকে না।

সেই গল্পেই হিন্দু আইনে বিধবার সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধে গুরুতর ভুল করিলেন। হেম তীর্থে যাইবার জন্য সরকারের কাছে পঞ্চাশটি মাত্র টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। সরকার বলিয়াছিল, মালিক ছোটবাবুর, অর্থাৎ হেমের দেবরের হুকুম ব্যতীত টাকা দিতে পারিবে না। হেম তখন আড়ালে থাকিয়া

দেবরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি চেয়ে পাঠালে কি পঞ্চাশটা টাকা সরকার দিতে পারে না ?' দেবর উত্তর দিয়াছিল, 'না, আপনি শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী —টাকা পেতে পারেন না।'

ইহা সম্পূর্ণ ভুল। একান্নবর্তী পরিবার যদি অবিভক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহা হইলে যে-কোন ভাইএর মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা স্ত্রী তাহাঁর ভাগের পূর্ণ অধিকারিণী হয়, যদি না প্রাপ্তবয়স্ক বয়স্ক পুত্র থাকে, নাবালক পুত্র থাকিলেও পুত্র সাবালক না হওয়া পর্যন্ত বিধবা মাতাই তাহার ভাগের সমস্ত উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারে, কেবল মূল সম্পত্তির কোন অংশ দান-বিক্রয় করিতে পারে না। হেমের জমিদার ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। তাহার স্বামীরা দুই ভাই ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সে সন্তানহীনা সুতরাং সে অবিভক্ত সম্পত্তির অর্ধেক আয় পাইত। শরৎবাবু যে-রূপে ঘরের কথা বলিয়াছেন তাহাতে হেমের স্বামীর সম্পত্তির মিলিত আয় দশ হাজার টাকার কম হইতে পারে না। হেম তাই প্রতিবৎসর সদর জমা দিবার পরও অন্তত চার হাজার টাকা পাইত। সরকারের কাছে পঞ্চাশ টাকা চাহিবার তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ-কথাও বলা চলে না যে, দেবর তাহাকে ধাপ্পা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথমত দেবর এত মূর্খ হইত না, দ্বিতীয়ত হেমেরও হাতে যথেষ্ট নগদ টাকা থাকিত। এই ভুল শরৎবাবু পৈতৃক সম্পত্তি না পাওয়ার জন্য করিয়াছিলেন।

আর একটা ভুল 'পরিণীতা' গল্পে। তিনি দেখাইলেন যে, ললিতার সই-এর ব্রাহ্মপরিবার ও তাহাদের আত্মীয় গিরীন্দ্র তাস খেলে ও থিয়েটারে যায়। তিনি জানিতেন না যে, ব্রাহ্মরা তাস খেলাকে মদ্যপানের মত ও থিয়েটারে যাওয়াকে প্রায় বেশ্যালয়ে যাওয়ার মত মনে করিত। আমি হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সম্বন্ধে বিখ্যাত গল্পটি স্মরণ করিতে বলিব, যদিও বা পরজীবনে হেরম্ববাবু কাননবালার অস্থায়ী শ্বশুর হইয়াছিলেন, তবু তাঁহার পূর্বজীবনে তিনি স্টার থিয়েটারকে অদূরবর্তী সোনাগাছির গৃহবিশেষ বলিয়া মনে করিতেন।

ব্রাহ্মজীবন সম্বন্ধে আর একটা ভুল করিলেন 'দত্তা' উপন্যাসে। তাহাতে রাসবিহারীবাবু রাত্রিতে বিজয়ার সহিত দেখা করিয়া রেজেস্ট্রি বিবাহের দলিলটি স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। শরৎবাবু রেজেস্ট্রি বিবাহের আইন কি তাহা জানিতেন না, তাই এই কথা লিখিয়াছিলেন। ১৮৭২ সনের আইন অনুযায়ী বিবাহ রেজেস্ট্রি করিতে হইলে বিবাহার্থী যুবক ও যুবতীকে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার বা কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইয়া বলিতে হইত দুইজনেই বিবাহ করিতে সম্মত, তাহার পর দলিলে সই করিতে হইত। বিজয়া নিজের বাড়ীতে অন্যের সম্মুখে সই করিলে সেই সই বিবাহ-স্বীকার হিসাবে গ্রাহ্য হইত না।

তাহা ছাড়া সময়ের হিসাব ও জায়গার অবস্থান সম্বন্ধেও শরৎবাবু ভুল করিতেন। 'দত্তা'তে বিজয়া নরেনের প্রতি দুর্ব্যবহার করিল ও পরে জানিল যে তাহার অন্যায় হইয়াছিল। এ দুই ঘটনার মধ্যে বিজয়ার হিসাবে একরাত্রির ব্যবধান, নরেনের হিসাবে কয়েক দিনের ব্যবধান। কোন্‌টা ঠিক ? আবার

বিজয়ার বাড়ী ও দিঘড়ায় নরেনের পৈতৃক বাড়ীর মধ্যে দূরত্ব ও দিক সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা আছে। প্রথমে শরৎবাবু বলিলেন যে, দুই বাড়ীর মধ্যে দূরত্ব বেশী নয়, পরে আর এক জায়গায় বলিলেন, যে, সরস্বতীর উপরে বাঁশের পোলের কাছ হইতে (যাহা বিজয়ার বাড়ীর আরও কাছে) 'বামদিকে অনেক দূরে জমিদার বাটির সৌধচূড়া চোখে পড়ায়…' ইত্যাদি। এখানেও আর একটা ভুল—বাঁশের সাঁকোর কাছ হইতে বিজয়ার বাড়ী আসলে ডানদিকে, বাম দিকে নয়।

তবে বিজয়ার বাড়ী যে ঠিক কোথায় তাহার ধারণা আমি এখনও করিতে পারি নাই। সে-নিজে হুগলী স্টেশন হইতে 'মস্ত দুই ওয়েলার বাহিত খোলা ফিটনে' চড়িয়া আসিল। এখানেও ভুল, তখনকার দিনে কলিকাতা অঞ্চলে ধনী বাঙালীর জুড়ী গাড়ী ফিটন হইত না। শরৎবাবু নিশ্চয়ই জুড়ী বাহিত খোলা ল্যাণ্ডোর কথা ভাবিয়াছিলেন। যাহাই হউক, নরেন আসিত যাইত অন্য স্টেশন দিয়া, তাহা হয় ব্যাণ্ডেল অথবা বাঁশবেড়ে। আমি ধরিয়া লইয়াছি বিজয়ার বাড়ী শরৎবাবুর জন্মস্থান দেবানন্দপুরের কাছাকাছি।

শরৎবাবুর লেখায় ছোটখাটো দোষের তালিকা আর একটি ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া শেষ করিব। নিম্নতর জাতের উপর বাঙালী ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা ছিল, যাহা রাম এইরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিল—'তুমি ছোটজাত, বামুনের মান-মর্যাদা জান না, তাই বলে ফেললে…।' শরৎবাবুরও মনোভাব (অজ্ঞাতসারে হইলেও) প্রায় রামেরই মত ছিল। উদাহরণ দিতেছি 'দত্তা' উপন্যাস হইতেই। বনমালী রায় (নিশ্চয় বংশে দক্ষিণ রাঢ়ী কুলীন ব্রাহ্মণ) ও রাসবিহারী (কৈবর্ত) দুজনেই ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্ম কন্যা বিবাহ করিলেন। তাহাতে বনমালীর জন্মিল অপরূপ সুন্দরী কন্যা বিজয়া। কিন্তু রাসবিহারী কৈবর্ত হওয়ার দরুণ সেই ব্রাহ্ম পত্নী সত্ত্বেও পাইলেন বিলাসকে—বেঁটে খাটো, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুযুক্ত: গায়ের বর্ণের কথা শরৎবাবু বলেন নাই: তৃতীয় বন্ধু, জগদীশ মুখোপাধ্যায় হিন্দু রহিলেন, ও বনমালীর প্রতিবেশী মধ্যবিত্ত পূর্ণ গাঙ্গুলীর ভগিনীকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র হইল নরেন্দ্র, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ছিপছিপে, সুপুরুষ। তাহার দেহ ছয় ফুটের উপর দীর্ঘ, ঋজু।

এমন কি ব্রাহ্ম মাতা সত্ত্বেও বিলাস কথাবার্তায় চুয়াড় হইল। একদিন সে স্বভাবসিদ্ধ অভদ্রতার বশে বিজয়ার সহিত এরূপ ব্যবহার করিল যে, রাসবিহারী পর্যন্ত বলিলেন,—

> 'আরে বাপু হিঁদুরা যে আমাদের ছোটলোক বলে সেটা ত আর মিছে কথা নয়! ব্রাহ্মই হই, আর যাই হই কৈবর্ত ত! বামুন-কায়েতের ছেলে হলে ভদ্রতাও শিখতিস্, নিজের ভালমন্দ কিসে হয় না হয়, সে কাণ্ডজ্ঞানও জন্মাতো। যাও এখন মাঠে মাঠে হাল-গরু নিয়ে কুলধর্ম করে বেড়াও গে।'

ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শরৎবাবু বিলাসকে 'স্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠ'

বলিয়া উল্লেখ করিলেন, কৈবর্ত হইয়া জন্মিবার দুর্ভাগ্য দেখাইবার জন্য। সাধারণত এই ধরনের গলাকে প্রচলিত বাংলায় বলে 'হেড়েগলা', অর্থাৎ হাড়ি জাতীয় লোকের গলা। বিলাস হাড়ি না হইয়াও কর্কশকণ্ঠ হইল। শরৎবাবু বিলাসের যে-আচরণ দেখাইলেন, ভদ্র বাঙালীর সর্বদাই ধারণা ছিল যে, নিম্নজাতীয় লোকের, এমন কি নবশাখ-জাতীয় লোকেরও, কথাবার্তা এই ধরনের হয়। উহারা রাগের বশে বিপদের সম্ভাবনাও ভুলিয়া যাইত। 'সমাচার দর্পণে' একটি বিবরণ পড়িয়াছিলাম। একটি তিলি জাতীয় লোক একদিন হুগলী জেলার গোবিন্দপুর বলিয়া একটি গ্রামে আসিতেছিল। উহার বাহিরে, পথে ডাকাতেরা তাহাকে বলিল, 'তোর কাছে কি আছে দে, নইলে তোকে মেরে ফেলব।' 'সমাচার দর্পণে' মন্তব্য পড়িলাম—'নিম্ন জাতীয় লোকেরা সাধারণত কোপন হয়, তিলি বলিল, "শুধু অমুক আছে, নিবি?" ডাকাতেরা তখনই উহা কাটিয়া ফেলিল। তখন হইতে সেই গ্রামের নাম হইল অমুক-কাটা গোবিন্দপুর।'

শালীনতার খাতিরে 'সমাচার দর্পণ' নামটা আসলে 'ধন-কাটা গোবিন্দপুর' হইল তাহা ছাপে নাই। শরৎবাবুও বিলাসকে 'বিজয়া-কাটা বিলাস' করিবার ইচ্ছা দেখাইলেন।

শরৎচন্দ্রের স্বভাবে ও রচনায় যে-সব দোষ বা অসম্পূর্ণতা আছে তাহার কথা অনেক বলিলাম, এখন তাঁহার মাহাত্ম্যের কথা বলিব। এই জিনিষটির আসল উপলব্ধি হয় নাই তিনি খাঁটি বাঙালী বলিয়া। খাঁটি বাঙালীর একটা অভ্যাস এই যে, সে নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করে, অথচ বুঝিতে পারে না যে সে সজ্ঞানে নিজেকে যাহাই মনে করুক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সত্য নয়, কারণ আসলে সে চতুর মাত্র (অর্থাৎ চালাক), বুদ্ধিমান নয়। গীতায় একপ্রকার চরিত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'প্রকৃতির দ্বারা সর্বভাবে যা কৃত হয়, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তি মনে করে তাহা আমি করিলাম।' বাঙালী-চরিত্রের এই দুর্বলতা শরৎবাবুর পুরামাত্রায় ছিল, তাই তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, নিজের যে-রূপটিতে তিনি মহৎ এবং লোকোত্তর, সেই রূপটি বাঙালী আত্মার বিস্মৃত-অবতারের। তাঁহার সকল কথা ও কর্মের মধ্যে কার্য-কারণ অথবা কর্তা-ও-কর্ম সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। তিনি বড় যাহা কিছু করিয়াছেন, উহা প্রবৃত্তির বশে, সজ্ঞানে নয়।

তাই দেখিতে পাই যে, তাঁহার জীবনব্রত ছিল নারীর সন্ধান। এই সন্ধানের কোনও বাহ্য কারণ ছিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কামনা যে উহার পিছনে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার মানসীকে সমাজের সব স্তরে—ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, সমাজের সব অবস্থানে—গৃহস্থঘরে ও বেশ্যালয়ে, নারীর সব মূর্তিতে—সতীলক্ষ্মীতে ও পতিতায় খুঁজিয়াছেন। নারীর জীবনযাত্রা ও সামাজিক মর্যাদা তাঁহাকে এক নারী হইতে অন্য নারীকে বিভিন্নরূপে দেখাইতে প্রবুদ্ধ বা বাধ্য করে নাই। তিনি নারীত্ব বলিতে কি বুঝিতেন তাহা তাঁহার নিজেরই এত গোপন ও সূক্ষ্ম

অনুভূতির ব্যাপার ছিল যে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় সেটা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি 'আঁধারে আলো' গল্পে লিখিলেন,—

> 'স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না! বিজলী নর্তকী, তথাপি সে নারী! আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা তাহার নারীদেহ। ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত, অর্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে।'

তাহা হইলে নর্তকী হওয়া, এমন কি বারাঙ্গনা হওয়াও কি নারীত্বের অংশ নয়? যতদূর বোঝা যায়, তাহাতে মনে হয় যে ভালবাসার অকৃত্রিম ও একান্ত অনুভূতিকেই যেন শরৎচন্দ্র প্রকৃত নারীত্ব মনে করিতেন। এই ভালবাসার উদ্ভব হইলে পতিতাবৃত্তিরও কোন দোষ থাকে না।

পক্ষান্তরে, প্রচলিত ধারণায় যাহাদের সতী বলিয়া সকলেই শ্রদ্ধা করিত, সেই সতীত্বকেও শরৎচন্দ্র যেন প্রকৃত নারীত্ব মনে করিতেন না। ইহার পরিচয় তাঁহার 'সতী' গল্পে দিয়াছেন। ইহাতে একটি পত্নী তাঁহার স্বামীকে সারাজীবন 'আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া যে অত্যাচার করিল তাহা একমাত্র রাক্ষসী হইলেই করিতে পারে। এই সতী স্ত্রীর সহিত বিবাহিত জীবন যাপন করিয়া স্বামীটি যখন প্রৌঢ় হইল, তখন তাহার বিধবা ভগিনী আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, 'দাদা, তুমি আবার বিয়ে কর।' স্বামী বোনকে 'পাগল!' বলিল বটে, কিন্তু একা বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভাল জিনিষ, সংসারে তার তুলনা নেই। কিন্তু···।' ইত্যাদি। স্বামীর কথা ভুলিয়া গল্পটি পড়িলে উহাকে একটা হাস্যরসাত্মক গল্প মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু সেই হতভাগ্যের কথা মনে রাখিলে এই সতী পত্নী পাওয়া পূর্বজন্মের বহু পাপের ফল বলিয়া মানিতে হইবে।

এই গল্পটির পিছনে যে শরৎবাবুর প্রতিশোধ লইবার একটা ইচ্ছা ছিল, তাহা কেহই বলেন নাই। অথচ এ-বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নাই। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সনে জুন-জুলাই মাসে। ১৯২৪ সনে একটি বক্তৃতায় শরৎবাবু, তিনি অসতীত্বের প্রচারক বলিয়া তাঁহার উপর একটা আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। আক্রমণকারী যতীন্দ্রমোহন সিংহ। তিনি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তবু ঔপন্যাসিক হইয়াছিলেন। তাঁহার একটি উপন্যাসে সতীত্বের মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন। সেই উপন্যাসটি আমাদের ছাত্রাবস্থায় খুবই সাড়া জাগাইয়াছিল। উহার নাম 'ধ্রুবতারা'। আমিও তখন উহা পড়িয়াছিলাম। শরৎবাবুর বক্তৃতার কিছুদিন আগে যতীন্দ্রবাবু তাঁহার 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে শরৎচন্দ্রের রমাকে এইভাবে ধিক্কার দিয়াছিলেন—'তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার

জমিদারি শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কিনা বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি! ছিঃ।' এই প্রসঙ্গে শরৎবাবু শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সতীত্বের নির্বোধ উপাসনার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। সেই উপাসক কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। আমার মনে হয় 'সতী' গল্পে শরৎবাবুর যতীন্দ্র-মোহন সিংহের উপর একহাত লইয়াছিলেন।

সতী-অসতী নির্বিশেষে মানসীর সন্ধান করিতে করিতে তিনি বাস্তব জীবনে যাহাই পাইয়া থাকুন অথবা না পাইয়া থাকুন, তাঁহার গল্প উপন্যাসে সে মানসীকে বিভিন্ন মূর্তিতে দেখাইলেন। প্রত্যেকটি মূর্তিই অপূর্ব, ও সব গুলিতে মিলিয়া আমাদের যুগে বাঙালী জীবনের উপর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার দীপ্তি ও স্নিগ্ধতা বর্ষণ করিতে লাগিল।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁহার এই মানসী নারীদের জন্যই আমার মনে আমার অল্প বয়সে শরৎবাবুর গল্প-উপন্যাসের উপর একটা বিরাগ জন্মিয়াছিল। ইহার বশে একদিন আমি কি করিলাম বলি। যখন প্রথম আমার দাদার শ্বশুর-মহাশয় আমাকে শরৎবাবুর বাড়ীতে লইয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি আমার বিরাগের কথা জানিতেন। তাই পথে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শরৎবাবুর লেখা তোমার ভাল লাগে না কেন?' তিনি গুরুজন হইলেও আমি একটা অশোভন উত্তর করিলাম, 'ও-সব হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত যুবতী ও বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনীদের কথা আমার ভাল লাগে না। তিনি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিলেন, 'বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী বলছ কেন?' ঐ কথাটা আমি রমার ওকালতি করার জন্য বিশ্বেশ্বরীর উপর রাগের বশে বলিয়াছিলাম। শরৎবাবুর সৃষ্ট এই ধরণের মহৎ-প্রকৃতি প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধাদের সম্বন্ধে এখন শুধু এইটুকু বলিব যে, আমার মনে হয় এই চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের অন্নপূর্ণা, ক্ষেমঙ্করী ও আনন্দময়ী চরিত্রের অনুসরণে লেখা।

হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত যুবতীদের সম্বন্ধে আমার বিশেষ করিয়া বলিবার আছে। দাদার শ্বশুর-মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিবার সময়ে আমি বিশেষ করিয়া বিন্দুর কথা স্মরণ করিয়াছিলাম। বিন্দুর উপর আমার বিরক্তির কারণ ব্যক্তিগত—আমার মাতার হিস্টিরিয়া দেখিয়া। বিন্দুর মত তিনিও সামান্য কারণে বা কল্পিত কারণেও রাগের বশে অনর্থ করিয়া বসিতেন। শিশু অবস্থায় সেই সব দেখিয়া নিশ্চয়ই আমার ভীতি জন্মিয়াছিল। তাই তাঁহাকে গান করিতে শুনিলেও, আমি হিস্টিরিয়া উঠিয়াছে ভাবিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতাম। আমার যখন আড়াই বৎসর বয়স, তখন মা আমাদের লইয়া শিলং গিয়াছিলেন। শিলং-এর হিন্দুরাও শহরের ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন। মা ভাল গাহিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহাকে গান গাহিতে বলা হইত। কিন্তু তিনি যাহাই গাহিতেন না কেন—'কি করিলি মোহের ছলনে...' বা 'অনেক দিয়েছ, নাথ, আমার বাসনা তবু পুরিল না ' ইত্যাদি, সুর আরম্ভ করিলেই তাঁহার হিস্টিরিয়া উঠিতেছে ভাবিয়া আমি চীৎকার জুড়িয়া

দিতাম। ইহাতে রাগিয়া একদিন মা আমাকে শিলং-এর পুলিশ বাজারের কাছ হইতে সারা জেল রোড্ ধরিয়া আছাড় মারিতে মারিতে নিয়া গিয়াছিলেন। সে-সব কথা আমার মনে থাকিবার নহে, কিন্তু হিস্টিরিয়া ভীতি রহিয়া গেল।

মনে রাখিতে হইতে, তখনকার দিনে নব্যা বাঙালী মেয়ের হিস্টিরিয়া প্রায় তাহার সেমিজ-জ্যাকেট-পেটিকোট পরার মতই ছিল। কম বেশী হিস্টিরিয়াগ্রস্ত না হইলে তাহাদের নব্যা বলিয়া মনে করাই হইত না। তাহা ছাড়া শরৎবাবুর প্রত্যেকটি নায়িকারই হঠাৎ আবেগের বশে তা সে অভিমানই হউক বা রাগই হউক—অপরের প্রতি অবিচার, এমন কি নিজেরও অনিষ্ট ও সর্বনাশ পর্যন্ত করিবার একটা দুর্নিবার প্রবৃত্তি জাগিত। অথচ তাহাদের কাহারও চরিত্রের মহত্ত্ব—বুদ্ধিতে, ন্যায়পরতায়, ধর্মাধর্ম জ্ঞানে, কম ছিল না। ইহা সত্ত্বেও তাহারা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিত। ইহা 'বড়দিদি'র মাধবী হইতে আরম্ভ করিয়া কুসুম, রমা ইত্যাদি সকলের মধ্যেই দেখা যায়। আমার মারও এই ধরণের চরিত্র ছিল। তাঁহার মত উদার, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম বোধ সম্পন্ন বাঙালী মেয়ে আমি কম দেখিয়াছি। কিন্তু কখন যে তাঁহাকে কি আবেগে পাইয়া বসিবে ও প্রায় জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিবে তাহা কখনই বোঝা যাইত না। আমার পিতাকে প্রায়ই শুনিতাম বলিতেছেন, 'নিরর্থক অশান্তির সৃষ্টি কর কেন ?'

এই সব চরিত্রের বাঙালী মেয়েদের একটি দুর্নিবার প্রবৃত্তি ছিল—যাহাকে ভালবাসে তাহাকে আঁকড়াইয়া রাখা। সুতরাং তাহাতে কোনদিকে ব্যাহত হইলে উহারা পাগল হইয়া যাইত। আর একটা বিশ্বাস ছিল তাহারা অভিশপ্ত, তাহাদের দুঃখভোগ করিতে হইবেই, ইহা হইতে নিষ্কৃতি নাই। আমার মা আমাকে বলিতেন,—'আমার শাশুড়ী আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন "সব সুখে থেকো, শুধু মনের সুখে থেকো না, তা ফলেছে।' আমি জিজ্ঞাসা করিতাম, 'মা, তোমার দুঃখ কি ?' তিনি উত্তর দিতেন, 'এখন বুঝিবি না, মরবার আগে বলে যাবো।' বলিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু তাঁহাকে যখন-তখন একটা গান গাহিতে শুনিতাম,—

'যেথায় সেথায় যাও না রে মন,
ফল পাবে কি কপাল ছাড়া,
বিধি কপালে মেরেছে কলম,
ঘুচবে না তার কলম-নাড়া।'

আমি এইসব শুনিয়া আতঙ্কিত হইয়া থাকিতাম। শরৎবাবুর নায়িকাদের সম্বন্ধে আমার বিরাগ জন্মিয়া ছিল আমার মাতাকে দেখিয়াই। নহিলে প্রত্যেকটির সহিতই জীবনে সাক্ষাৎ হইলে ভালবাসিয়া পুজা করিতাম।

এখন শরৎবাবুর উপন্যাসের দুই তিনটি নায়িকার পরিচয় দিয়া তাঁহার নারীর সন্ধানের বিবরণ শেষ করিব। প্রথম দৃষ্টান্ত দিব তাঁহার যুবাবয়সের রচনা 'শুভদা' হইতে। এই উপন্যাসটির ইতিহাস বিস্ময়কর। উহা শরৎবাবুর জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত হয় নাই, হইয়াছিল মৃত্যুর পরে। এমন কি শরৎবাবু

লেখাটি পুড়াইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন ও তাঁহার এক ভাগিনেয়কে বলিয়াছিলেন তাহা করিতে। সে পাণ্ডুলিপিটি না পুড়াইয়া লুকাইয়া রাখে। শরৎবাবু শেষ জীবনে উহা পাইয়া প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। তবু তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সনে উহা প্রথমে মাসিক পত্রিকায়, পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

শরৎবাবু বইটি প্রকাশ না করিবার যে কারণ দিয়াছিলেন তাহা আশ্চর্যকর। বইটির পাণ্ডুলিপি তিনি নিরুপমা দেবীকে পড়িতে দেন। নিরুপমা দেবী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার 'অন্নপূর্ণার মন্দির' গল্পের উপর 'শুভদা'র আভাষ অলক্ষ্যে আসিয়া গিয়াছে। শরৎবাবু ভাবিলেন, তাঁহার বইটি প্রকাশ করিলে নিরুপমা দেবীকে হেয় করা হইবে, সেজন্য প্রকাশ করা উচিত নয়। ইহা শরৎবাবুর মনের উদারতার পরিচায়ক। কিন্তু 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র সহিত 'শুভদা'র প্রকৃত সাদৃশ্য ছায়ার মত। 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র সতী ও 'শুভদা'র ললনা এক চরিত্রের নয়। দুটির মধ্যে তুলনা চলে না।

আমি 'শুভদা' হইতে 'মালতী' ছদ্মনামধারিণী ললনার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। এখন আরও কিছু করিব। সে সুরেন্দ্রকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। কেন না একজনকে ভালবাসিয়া সে সুরেন্দ্রের উপপত্নী হইয়াছিল বলিয়া। কিন্তু সে সুরেন্দ্রকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, যদিও সে বুঝিয়াছিল বাল্যকালের সেই ভালবাসার মধ্যে ও এখনকার ভালবাসার মধ্যে অনেক প্রভেদ। তবু সম্মত হয় নাই যে-কারণে, তাহা নিজে বলিল,—

> 'প্রাণাধিক তুমি—তোমার এক গাছা কেশের জন্য মরিতে পারি, তুমি আমার জন্য কলঙ্কিত হইবে? শুধু আমার জন্য পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিবে—তাহা তুমি সহিবে? আমি অজ্ঞাতকুলশীলা—আমার লজ্জা নাই, কিন্তু তুমি মহৎ—তোমার কলঙ্ক, তোমার লজ্জার কথা জগৎসুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িবে। লোকে বলিবে, তুমি বেশ্যা বিবাহ করিয়াছ। সমাজে তুমি হীন হইবে, মর্মপীড়া অনুভব করিবে, তাহা আমি হইতে দিব না।'

মালতী রক্ষিতা হইয়াই রহিল। কিন্তু সে কিছুতেই সাজসজ্জা করিবে না। তবু সুরেন্দ্র জেদ করিতে লাগিল। মালতী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল,—

> 'তোমার এ নিরাভরণা মূর্তি বড় জ্যোতির্ময়ী—স্পর্শ করিতেও সময় সময়ে কি যেন সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে—দেখিলেই মনে হয় যেন আমার পাপগুলা ঠিক তোমারি মত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমাকে বলিতে কি—তোমার কাছে বসিয়া থাকি, কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত ভয় আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে হয়। আমি তেমন সুখ পাই না—তেমন মিশিতে পারি না, তাই তোমাকে অলঙ্কার পরাইয়া একটু ম্লান করিয়া লইব।'

মালতী তখন ঘরের বড় দর্পণে দুইজনকেই দেখিল। শরৎচন্দ্র

লিখিলেন,—

> 'মনে হইল সে বুঝি যথার্থই বড় উজ্জ্বল, বড় জ্যোতির্ময়ী ; মনে হইল পুণ্যের অতীত স্মৃতি এখনও বুঝি সে-দেহ ছাড়িয়া যায় নাই, পবিত্রতার ছায়াখানি এখন-ও সে-দেহে বুঝি ঈষৎ লাগিয়া আছে। রাত্রে সহসা নিস্তব্ধ কক্ষে মালতীর ঈষৎ ভয় জন্মিল—সে দেখিল মুকুরে এক কলঙ্কিত দেবীমূর্তি, আর পার্শ্বে জীবনের আরাধ্য সুরেন্দ্রনাথের অকলঙ্ক দেবমূর্তি'।

অথচ মালতীই অকলঙ্কিতা, সুরেন্দ্রই কলঙ্কিত।

শরৎবাবু অতি দরিদ্র গ্রাম্য বাঙালী পরিবারের বালবিধবাকে এইভাবেই দেখাইলেন। বাঙালীর নবজীবনে নারী পূজার বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারি, কিন্তু একটিও ইহার উপরে যাইবে না। শরৎবাবু বইটি যে প্রকাশিত হইতে দিলেন না, তাহাতেই বোঝা যায় তিনি যখনই বিস্মৃত অবতার না থাকিয়া সজ্ঞান 'ইন্টেলেকচুয়াল' হইবার চেষ্টা করিতেন তখনই তিনি আর শরৎচন্দ্র থাকিতেন না, যে-কোন শিক্ষিত বাঙালী হইয়া যাইতেন।

শরৎবাবুর নারীপূজার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিব একটি ঘটনা হইতে—যাহাতে একটি পতিতা যুবতীর সহিত একটি তরুণী গৃহলক্ষ্মীর সাক্ষাতের কথা আছে। গৃহলক্ষ্মীটিই পতিতাকে নিজের শোবার ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে ১৯৩৭ সনেও কলিকাতার রেডিও স্টেশনের কোন স্টুডিয়োতে যখন গীত-ব্যবসায়িনীরা গান গাহিত, তাহার অব্যবহিত পরেই গীত-ব্যবসায়িনীর সহিত গৃহস্থঘরের গায়িকার চাক্ষুষ মিলন হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাকে আসিতে দেওয়া হইত না। শরৎবাবু কিন্তু দুই শ্রেণীরই বাঙালী মেয়ের কথাবার্তা শুনাইলেন—তাঁহার 'আঁধারে আলো' গল্পে।

যুবক সত্যেন্দ্র কলিকাতাবাসী বড় জমিদার। তাহার পত্নী রাধারাণী ষোল-সতেরো বছরের তরুণী। ছেলের অন্নপ্রাশনের উৎসবে চারটি বাঈজীকে আনা হইয়াছে। রাধারাণী দোতলার বারান্দায় বসিয়া চিকের আড়াল হইতে উহাদের দেখিতেছে, এমন সময় স্বামী আসিলে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। যে বাঈজীটি সাধারণ পোশাক পরিয়াছিল তাহাকে রাধারাণী সব চেয়ে সুন্দরী বলিল, কিন্তু এ-ও বলিল এ যেন বড় গরীব, কারণ তার গায়ে গয়না নাই, সাজসজ্জাও সাধারণ। সত্যেন্দ্র বলিল, উহার পারিশ্রমিক দুইশত টাকা, অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সত্যেন্দ্র এই বাঈজীর সহিত তাহার প্রেমের কাহিনী বলিল ; প্রবঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য উহাকে আনিয়াছে তাহাও বলিল ; বাঈজী যে পরে অনুতপ্তা হইয়া ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহাও বলিল। রাধারাণী শুনিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, 'তাই আজ ওঁকে অপমান করে শোধ নেবে ? এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে ?'

পরে বিজলীকে সে নিজে শোবার ঘরে ডাকিয়া আনিল। বিজলী ত্রস্ত

কুণ্ঠিত পদে আসিতেছে দেখিয়া রাধারাণী তাহার হাত ধরিয়া ঘরে নিয়া একটা চেয়ারে জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, 'দিদি, চিনতে পারো ?' বিজ্‌লী তো হতবুদ্ধি। হইবারই কথা। তখন রাধারাণী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, 'ছোট বোনকে না হয় নাই চিনলে দিদি, সে দুঃখ করিনে, কিন্তু এটাকে চিনতে না পারলে সত্যিই ভারী ঝগড়া করব।' বিজ্‌লী কিছুক্ষণ পরে সব অনুমান করিয়া শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। যখন বলিল সে চিনিতে পারিয়াছে, তখন রাধারাণী উত্তর দিল, 'দিদি, সমুদ্রমন্থন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোট বোনটিকে দিয়েছ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন বলেই তো আমি তাঁকে পেয়েচি।'

বিজ্‌লীর মত বাঈজী হয় কিনা বলিতে পারি না, রাধারাণীর মত গৃহলক্ষ্মীর অস্তিত্বেও বিশ্বাস করা শক্ত। তবু শরৎবাবু বিশ্বাস করাইতে পারিলেন।

সকলের শেষে 'দত্তা' উপন্যাস সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই দীর্ঘ অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

উপন্যাসটি আমি প্রথম ১৯১৯ সনে পড়িলেও উহার গভীর অর্থ তখন ধরিতে পারি নাই, উহাকে একটা হালকা-গোছের মিলনান্ত প্রেমের গল্প বলিয়া মনে করিলাম। আসলে মোটেই সে-রকম কিছু নয়, উহাতে নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে যে-ভয় ও যে আশা, যে সঙ্কট ও যে সুখ আসা-যাওয়া করে, কিন্তু কোন্ দুইটি থাকিবে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না—তাহার অনুভূতি রহিয়াছে। গল্পটা সুখের করিয়া শরৎচন্দ্র শেষ করিলেন বটে, কিন্তু এই পরিণামের আগে সর্বত্র উহাতে 'ট্র্যাজেডি'র সম্ভাবনা অশনি-সম্পাতের মত রহিয়াছে।

ইহা বুঝিতে হইলে গল্পটা পড়িবার সময়ে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে হয়। যখন প্রথম পড়িলাম, তখন আমিও পরিহাস করিয়া বলিলাম—শরৎবাবু নিষ্কাম বৈজ্ঞানিক চরিত্র সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সত্যকার ধারণা নাই, কারণ কোনও একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকই মাইক্রোস্কোপকে প্রেমের বাহন করে না। ইহা কিন্তু আমার সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছিল। নরেন মাইক্রোস্কোপকে প্রেমের ছুতা করে নাই, সে বেচারা জীবিকার দায়ে তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় যন্ত্রটিকে বিক্রী করিতে আসিয়াছিল। উহাকে প্রেমের ছুতা করিল বিজয়া। তাহাও যতটা না জ্ঞাতসারে, তার চেয়ে বেশী অজ্ঞাতসারে।

এই সূত্রে শরৎবাবুর নানা বিষয়ে জ্ঞানে যে-অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহার আবার উল্লেখ করিতে হইল। তিনি রাসবিহারীকে দিয়া বলাইলেন, 'কি বল ! বিলাস, কলেজে তোমার এফ-এ ক্লাসে কেমিস্ট্রিতে ত এ-সব অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেচ—দুশো টাকা একটা মাইক্রোস্কোপের দাম !' শরৎবাবু জানিতেন না যে, এফ-এ (বর্তমান আই-এ বা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) ক্লাসে কেমিস্ট্রি পড়িলেও

মাইক্রোস্কোপ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয় না। আমি আই-এ ক্লাসে কেমিস্ট্রি পড়িতাম, মাইক্রোস্কোপ ধরি নাই। মাইক্রোস্কোপ আই-এ ক্লাসে ব্যবহার করিতে হয় বটানীতে (উদ্ভিদবিজ্ঞানে) আমার স্ত্রী বিষয়টা পড়িতেন ও মাইক্রোস্কোপ লইয়া অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছিলেন। 'দত্তা' গল্পে মাইক্রোস্কোপ অবশ্য বিজ্ঞানের দাবিতে প্রবেশ করে নাই। নরেনকে দ্বিতীয় পাস্তোর বানাইবার জন্যই উহা প্রয়োজন হইয়াছিল। সেখানে শরৎবাবু ভুল করেন নাই।

বইটির মূল তাৎপর্য আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহার পরিচয় দিতে হইলে প্রথমে 'দত্তা' গল্পের সামাজিক আবেষ্টনী কেন ব্রাহ্ম করিতে হইল, তাহা বলিতে হয়। তাঁহার অন্য গল্পে নর-নারীর প্রেম হিন্দু সমাজের ধারা ও আচার-ব্যবহারের সহিত জড়িত, উহার প্রায় সবগুলিতে সমাজের সহিত প্রেমের সংঘর্ষের ব্যাপার আছে। 'দত্তা'তে শরৎবাবু প্রেমকে সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া উহার স্বাধীন মূর্তি দেখাইতে চাহিলেন। আসলে 'দত্তার' ব্রাহ্ম সামাজিক আবেষ্টনী কোন সামাজিক আবেষ্টনীই নয়। 'গোরা'তে ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রেমের যে যোগাযোগ আছে, 'দত্তা'তে তাহা একেবারেই নাই।

তবে ব্রাহ্মসমাজ কেন আসিল উহার কারণ দেখাইবার আগে একটা ভুল ধারণা দূর করিতে চাই। 'দত্তা' যখন প্রথম প্রকাশিত হইল, তখন ব্রাহ্ম-বিরোধী অনেকের মুখে শুনিতাম, এই গল্পে শরৎবাবু ব্রাহ্মদের ভণ্ডামি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহা একেবারে বানানো কথা। শরৎবাবু ব্রাহ্ম-বিরোধী ছিলেন না, তাহা হইলে বিজয়া, বিজয়ার পিতা, দয়াল ও নলিনীকে এই গল্পেই যে-ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা করিতেন না। ইহা ছাড়া অন্যত্রও, যেমন 'পরিণীতা' গল্পেও ব্রাহ্ম গিরীন্দ্রকে অত্যন্ত মহান চরিত্রের যুবক বলিয়াই দেখাইয়াছেন। 'দত্তা'তে একমাত্র রাসবিহারী-ই কুচক্রী ও ভণ্ড, কিন্তু এরূপ কুচক্রী তিনি হিন্দু হইলেও হইতে পারিতেন। বিজয়াকে ব্রাহ্ম করা হইয়াছে, এই গল্পের মূল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য। মূল উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নায়ক-নায়িকাকে সকল সামাজিক আচার, নিয়ম ও সামাজিক জীবনের সংস্রব হইতে মুক্ত রাখিয়া শুধু পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রেমের লীলার নিজস্ব রূপ দেখাইবার জন্য।

ইহার জন্য বিজয়াকে শুধু যে ব্রাহ্মই করা প্রয়োজন হইল তাহাও নয়, তাহাকে একাকিনী করিতে হইল পিতৃহীনা করিয়া ও গ্রামে আনিয়া। তাহার উপর প্রেমের স্বাধীনতা দেখাইবার জন্য তাহাকে ধনী করিতে হইল। তাহার জন্যই আবার রাসবিহারী ও বিলাসকে ব্রাহ্ম করিতে হইল, এমন কি নরেন্দ্র জন্মে হিন্দু হইলেও তাহার সহিত হিন্দু সমাজের সকল বন্ধন কাটিয়া দিতে হইল। 'দত্তা' উপন্যাসে সমাজ যতটকু আছে, তাহা সমাজকে অবান্তর করিবার জন্য। গল্পটিতে প্রেমের নিয়ন্ত্রক রহিল শুধু মানব মন। পুরুষ-নারীর ভালবাসার প্রকৃত রূপ কি, উহা মানব মনের ধর্মের দ্বারাই একদিকে যেমন সক্রিয় হয়, তেমনই ব্যাহতও হয়—এই দুইএর সংঘাতই 'দত্তা'র বিষয়। সুতরাং শরৎবাবুকে প্রথমেই দেখাইতে হইল ভালবাসার মূলে কি আছে।

বিজয়া মূর্তিমতী ভালবাসা, সেজন্যই নরেন্দ্রকে ভালবাসিবার জন্য সে দেহ-নিরপেক্ষ হইতে পারে নাই। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র দেখাইতে গেলেন—জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে বলিতে পারি না—যে প্রেম কখনই দেহকে বর্জন করিতে পারে না, দেহ ভিন্ন জন্মিতেও পারে না, উহা প্রেমিক বা প্রেমিকার দিক হইতে 'মনসিজ' হইতে পারে, কিন্তু প্রেমের অবলম্বনের দিকে সম্পূর্ণ 'দেহজ'। 'দত্তা'-তে ইহাই প্রথম দেখানো হইল।

বিজয়া যখন ধরিয়া লইয়াছে যে, বিলাসের সহিত তাহার বিবাহ হইবে, তখন নরেন তাহার নিজের পরিচয়ে নয়, প্রতিবেশী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পূর্ণ গাঙ্গুলীর ভাগিনেয় হিসাবে দেখা করিতে আসিল। বিজয়া বিলাসের ব্যবহারে বিরক্ত হইলেও বাহ্যিকভাবে নরেন্দ্রের সহিত জমিদার কন্যা যে আচরণ ভদ্র প্রজার প্রতি করে তাহাই দেখাইল। ইহার বেশী যাহা প্রকাশ করিল তাহা দরিদ্র প্রজাদের মনে কষ্ট না দিবার ইচ্ছা। শেষে 'আপনি তবে এখন আসুন', বলিয়া হাত তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিল।

কিন্তু নরেন চলিয়া গেলে, মিনিট খানেক বিজয়া অন্যমনস্ক ও নীরব থাকিয়া সহসা চকিত হইয়া মুখ তুলিতেই, নিতান্ত অকারণেই তাহার কপোলের উপর একটা ক্ষীণ আরক্ত আভা দেখা দিল। শরৎবাবু লিখিলেন, 'বিলাসের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ না থাকিলে তাহার বিস্ময় ও অভিমানের হয়ত পরিসীমা থাকিত না।' ইহা কেন? উত্তর সহজ—নরেনের দেহ।

উহার পর সরস্বতী নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া বিজয়া হঠাৎ দেখিল তখনও অপরিচিত নরেন্দ্র মাছ ধরিতেছে। শরৎবাবু লিখিলেন, 'ঠিক সেই সময়েই বিজয়ার মুখের উপর সূর্যরশ্মি আসিয়া পড়িল কিনা জানি না, কিন্তু চোখা-চোখি হইবা মাত্র তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি একেবারে যেন রাঙা হইয়া গেল।' কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইবার পর বিজয়া বাড়ী ফিরিল। বৃদ্ধ দরোয়ান কানাই সিং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বাবুটি কে মাইজী?' বিজয়া কিন্তু 'এতটা বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, যে বুড়ার প্রশ্ন তাহার কানেই পৌঁছিল না। সেই প্রায়ান্ধকার নদীতটে সমস্ত নীরব মাধুর্যকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই পথ চলিতে লাগিল—লোকটি কে এবং আবার কবে দেখা হইবে?'

ইহার পরে আর একদিন বাহিরের দিকে চাহিয়া যখন দেখিল 'বেলা পড়িয়া আসিতেছে, অমনি নদীতীরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস তাহাকে সজোরে টান দিয়া যেন আসন ছাড়িয়া তুলিয়া দিল, এবং আজিও সে বৃদ্ধ দরোয়ানজীকে ডাকিয়া লইয়া বায়ুসেবনের ছলে বাহির হইয়া পড়িল।' পূর্ণবাবুর ভাগ্নেটিকে দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু 'যেন দেখিতেই পায় নাই এই ভাবে চলিয়া যাইতেছিল, তখন সহসা কানাই সিং পিছন হইতে ডাক দিয়া উঠিল, "সেলাম বাবুজী, শিকার মিলা?" কথাটা কানে যাইবা মাত্র তাহার মূল পর্যন্ত বিজয়ার আরক্ত হইয়া উঠিল।' এরপর শরৎবাবু মন্তব্য করিলেন, 'যাঁহারা বলেন যথার্থ বন্ধুত্বের জন্য অনেকদিন এবং অনেক কথাবার্তা হওয়া চাই-ই, তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া

প্রয়োজন যে, না, তাহা অত্যাবশ্যক নহে।' বাঙালী বলিয়া শরৎবাবু 'যথার্থ ভালবাসা' লেখেন নাই।

তাহার পর আর দেখা হইল না। কিন্তু বিজয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যহই আশা করিত একবার না একবার তিনি আসিবেনই। কিন্তু দিন বহিয়া যাইতে লাগিল—না আসিলেন তিনি, না আসিল তাঁহার অদ্ভূত ডাক্তার বন্ধুটি (অর্থাৎ নরেন)। দুই জনই যে এক ব্যক্তি তাহা বিজয়া জানিত না। কিন্তু যখন জানিল, নরেনকে দেখিবার তৃষ্ণা তখন তাহার অদম্য হইয়া উঠিল। অথচ প্রকাশ্যভাবে তাহার খোঁজ লইতে সঙ্কোচ হইল।

তাহার পরে দেখা হইল, মাইক্রোস্কোপ বিক্রয় করিবার জন্য নরেন্দ্র আসিল এবং মাইক্রোস্কোপ দেখাইতে লাগিল। কিন্তু বিজয়া দেখিবে কি? 'যে বুঝাইতেছে, তাহার কণ্ঠস্বরে আর একজনের বুকের ভিতরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, প্রবল নিঃশ্বাসে তাহার এলোচুল উড়িয়া সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করিতেছে, হাত হাতে ঠেকিয়া দেহ অবশ করিয়া আনিতেছে—তাহার কি আসে যায় জীবাণুর স্বচ্ছদেহের অভ্যন্তরে কি আছে না আছে দেখিয়া?'

মাইক্রোস্কোপের জন্য নিজে টাকা দিয়া রাসবিহারী নরেনকে দূর করিলেন। বিজয়াও মাস দুই পরে ভাবিল, যে সে নরেনকে ভুলিয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'দুদিনের পরিচয়ে কেমন করিয়াই না জানি এই লোকটির প্রতি এত মমতা জন্মিয়াছিল, ভাগ্যে তাহা প্রকাশ পায় নাই। না হইলে, মিথ্যা মোহ একদিন মিথ্যায় মিলাইয়া যাইতই—কিন্তু সারা জীবন লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই থাকিত না।' কিন্তু তখনই নরেন আসিয়া উপস্থিত হইল, ও এক পেয়ালা চা দিতে অনুরোধ করিল: বিজয়া ভৃত্যকে বলিয়া দিতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু 'বলিয়া দিয়াই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে পারিল না। উপরে যাইবার সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতরটা ভীষণ ঝড়ে সমুদ্রের মত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কারণেই হৃদয় যে মানুষের এমন করিয়া দুলিয়া উঠিতে পারে ইহা সে জানিতই না। তথাপি একথা স্পষ্ট বুঝিতেছিল, এ আন্দোলন শান্ত না হইলে কাহারও সহিত সহজভাবে কথাবার্তা অসম্ভব।' ভালবাসার সহিত দেহের কি সম্পর্ক তাহা আর কি ভাবে স্পষ্ট করা যাইত?

বিজয়া এই ভাবে নরেনের প্রতি ভালবাসার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল—নিজেকে ভাসিতে দিল বলিব না, কারণ ভাসা-না-ভাসা তাহার ইচ্ছাধীন ছিল না। তবু সে রাসবিহারীর জাল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে, উহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে কোন শক্তি পাইল না কেন? অসহায় ভাবে নিজেকে কেন বন্দী হইতে দিতে লাগিল? শুধু স্বর্গগত পিতাকে স্মরণ করিয়া কেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, 'বাবা, তুমি ত এদের চিনতে পেরেছিলে, তবে কেন আমাকে এমন করে তাঁদের মুখের মধ্যে সঁপে দিয়ে গেলে?' সে যে ধরণের তেজস্বিনী মেয়ে তাহার রজ্জুবদ্ধ অসহায় বলির পশুর মত অবস্থা হইল কেন?

ইহার পিছনে অবশ্য ছিল যাহারা ভালবাসে তাহাদের মনের চিরন্তন ভয়—ভালবাসার প্রতিদান না পাইবার; আরও ভয় এইজন্য যে, ভালবাসিয়া ভালবাসা পাইবার সুখ এত সৌভাগ্যের ব্যাপার যে তাহা কাহারও কপালে সয় না। তাহার উপর ছিল সে-যুগের বাঙালী মেয়েদের ধারণা যে, তাহারা অভিশপ্ত, তাহাদের সুখ ঈর্ষ্যাপরায়ণ দেবতারা সহিতে পারিবেন না, সেজন্য যে যত বেশী ভালবাসার যোগ্য সেই তত আরও বেশী অভিশপ্ত।

এই অসহায় ভাব হইতে বিজয়া নরেনকে বুঝিতেও দেয় নাই যে, সে নরেনকে ভালবাসে, কোনো ভরসাও সে নরেনকে দেয় নাই তাহাকে ভালবাসিতে। সুতরাং নরেন ভালবাসিলেও তাহা দমন করিয়াছে, নরেনের পক্ষে উহা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। নলিনী স্ত্রীলোক বলিয়া বিজয়ার ভালবাসা স্পষ্ট দেখিল কিন্তু নরেনকে বলিলেও নরেন বিশ্বাস করিল না।

তবু নরেন তাহার প্রতি উদাসীনতা দেখাইতেছে এই কল্পনাও করিলে, বিজয়ার আচরণ শিকার পলাইবার চেষ্টা করিলে হিংস্র বাঘিনীর যেমন হয় তেমন কেন হইতে লাগিল। এই হিংস্রতার বশেই সে নিজের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইল, ভুল বুঝিতে পারিয়াও মরণ ভিন্ন আর কোন পথ দেখিল না।

তবুও যে বিজয়া বাঁচিল তাহার কারণ শরৎবাবু বাঙালী ঔপন্যাসিক ছিলেন, এস্কিলস্, সোফোক্লেস, বা ইউরিপিডিস্ ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র অ্যাটিক নাটকের অনুসরণে কপালকুণ্ডলাকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। শরৎবাবু বিজয়াকে বাঁচাইবার জন্য দয়ালকে Deus ex machina-র মত আনিলেন।*

শরৎবাবু নারীর অন্বেষণে নারীর এই যন্ত্রণার রূপ নানাভাবে দেখাইয়াছেন, পুরুষের যন্ত্রণার কথাও চাপা দেন নাই। প্রেম একদিকে যন্ত্রণা, আর একদিকে জীবনের চরম সুখ ও গৌরব, ইহাই শরৎবাবুর শেষ কথা। তাঁহার প্রতিটি গল্প-উপন্যাসে ইহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সুখ-দুঃখের একাত্মতা তাঁহার সুখের গল্পে যেমন দেখাইয়াছেন, তেমনই দুঃখের গল্পেও দেখাইয়াছেন। প্রেমে দুঃখ কি সুখ তাহা তিনি সারাজীবন নারীর সন্ধানে থাকিয়াও নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

তেমনই নারীর সন্ধানই যে তাঁহার সর্বোচ্চ কীর্তি সেটাও শরৎচন্দ্র নিজে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ক্ষ্যাপা হইয়া পরশ পাথরের সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সত্যকার মূর্তি যে কি তাহা কখনও দেখেন নাই—দেখেন নাই যে,—

* রাসিন ফিড্রার বেলাতে তাহা করেন নাই। এই বিখ্যাত নাটকটি ইউরিপিডিসের অনুসরণে রচিত। উহার ভূমিকাতে রাসিন লিখিয়াছেন, 'ফিড্রা সম্পূর্ণরূপে অপরাধিনী নয়, সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধাও নয়। সে অদৃষ্টের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছিল, ও দেবতাদের কোপে পড়িয়াছিল···তাহার অপরাধ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় হয় নাই, উহা দেবতাদের শাস্তিদান।' বঙ্কিম রাসিন পড়িয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই পড়েন নাই।

'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় কটা
মলিন ছায়ার মত ক্ষীণ কলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।'

কিন্তু তাঁহার সারাজীবনেও তাঁহাকে কোন গ্রামবাসী ছেলে জিজ্ঞাসা করে নাই,—

'সন্ন্যাসী ঠাকুর এ কী, কাঁকালে ও কি ও দেখি?
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?'

অথচ তিনি বাঙালীজীবনের লোহার শৃঙ্খলকে সোনার করিয়াছিলেন। লৌকিক জীবনে ক্রমাগত নিজেকে প্রবঞ্চনা করিয়া শরৎচন্দ্র সেটা বুঝেন নাই। এই না বোঝার মধ্যেই তাঁহার নিজের ব্যর্থতা। দেশবাসীও বুঝে নাই। তাই বঙ্গজননীর এই দীন, পাগল, অবুঝ, অথচ মহান সন্তানটির জন্য কোনও বাঙালীর চোখ হইতে দুই ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়ে না। আর তাঁহার সত্যকার কীর্তির—তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির শোকাবহ পরিণাম এই যে, উহা আজ সাহিত্যের অধ্যাপকত্ব বলিয়া যে একটা ব্যবসা দেখা গিয়াছে, তাহার পুঁজিপাটা হইয়া অকিঞ্চিৎকরত্ব লাভ করিতে চলিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

চরিত্রবল ও ঈশ্বরপ্রেম

এতক্ষণ ধরিয়া বাঙালী-জীবনে যে নূতনত্বের কথা সবিস্তারে কিংবা অতিবিস্তারেই বলিলাম, উহা নরনারীর সম্পর্কে দেখা গিয়াছিল। উহার আবির্ভাব সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া বাংলার গ্রামে ও শহরে ইউরোপীয় স্থাপত্য-রীতিতে নির্মিত বাড়ী দেখা যাইবার মত। তবে বাড়ীটা ছিল দেহের আশ্রয়, মন হইল প্রেমের আশ্রয়। দুই-এর জন্যই দৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজন ছিল। বাংলার মাটি এত নরম ছিল যে, সৌধের বুনিয়াদ বেশ শক্ত করিতে হইত। আমাদের বাল্যবয়সেও দেখিতাম যে, মাটি কাদা-কাদা হইলে শালের খুঁটি, পরে কনক্রীটের 'পাইল' বসানো হইত। নহিলে ভারে উপরের বাড়ীতে ফাটল ধরিত, শেষে ধ্বসিয়া পড়িবারও সম্ভাবনা ছিল। তেমনই বাঙালীর চরিত্রও নরম, এমন কি কাদা-কাদা বলিয়া প্রেমের জন্যও শক্ত বুনিয়াদ গড়িতে হইল। এই বুনিয়াদ-গড়া প্রেম আবির্ভূত হইবার আগেই সুরু হইয়াছিল, চারিত্রিক বল বাঞ্ছনীয় শুধু এই অনুভূতি হইতেই। এই যে বুনিয়াদ গড়া হইল, উহা অর্ধেক নীতিজ্ঞানের, বাকী অর্ধেক ধর্মবোধের।

এখানে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, 'নীতি' ও 'ধর্ম' এই দুইটি শব্দ আমি ব্যবহার করিতেছি নূতন অর্থে—অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী লেখক ও প্রচারকেরা যে-অর্থে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে। এই অর্থ প্রাচীন ও বহু-প্রচলিত সংস্কৃত অর্থ নয়। সংস্কৃতে 'নীতি' অর্থ রাজনীতি, যেমন 'শুক্রনীতি'তে। ধর্ম অর্থ নানা রকম। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুকে দিয়া শিষ্যকে এইভাবে ভর্ৎসনা করাইলেন,—

> 'ধর্ম কথাটার অর্থটা উল্টাইয়া দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে। ধর্ম শব্দটা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিলে. উহা ইংরেজী Religion শব্দের আধুনিক তরজমা মাত্র। দেশী জিনিষ নহে।'*

কিন্তু ইংরেজী হইতে আরোপিত নূতন অর্থই চলিত হইল। তেমনই নবযুগে বাঙালী 'নীতি' বলিতে যাহা বুঝিতে আরম্ভ করিল তাহা ইংরেজীতে ও সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় যাহাকে 'মর্যালিটি' বলে তাহা। আমার মনে পড়ে ছাত্রাবস্থায় 'মর্যাল-কনশাসনেস' কথাটা শিখিবার পর, মাতার সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া কি বিভ্রাট হইয়াছিল। বিবাহের পর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয় এ-বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে একদিন মাকে জিজ্ঞাসা

* এখানে বলা প্রয়োজন যে, গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষাতেও বর্তমান যুগে religion বলিতে যাহা বোঝায়, এ-রকম কোন শব্দ নাই।

করিলাম, 'মা, বিয়ের পর তোমার কোন নৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল কি?' মা ব্রাহ্মপন্থী, 'নীতি,' 'নৈতিক' বলিতে ব্রাহ্মরা যাহা বুঝিত তাহাই বুঝিতেন। তিনি বলিলেন, 'সে-আবার কি? নৈতিক পরিবর্তন কি বুঝতে পারছি না?' হয়ত 'নৈতিক' কথাটা শুনিয়া তিনি কুলটা-বা-বারাঙ্গনা-বৃত্তি সম্বন্ধে ইঙ্গিতে করিতেছি ভাবিলেন।

নূতন অর্থে 'নীতি' ও 'ধর্মে'র প্রচার আরম্ভ হইল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই। ধর্মের ক্ষেত্রে নূতন আলোচনা ও প্রচার আরম্ভ করিলেন রামমোহন। নৈতিক শিক্ষাকে এইভাবে কোন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। উহার জন্য উদ্যোক্তা হইল সমগ্র বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়। তবে ধর্মেই হউক বা নীতিতেই হউক, বাঙালী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকেরা যাহা আরম্ভ করিলেন, তাহার পিছনে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব ছিল। বাঙালী হিন্দুরা যাহা করিল, তাহা অংশত মিশনারীদের শিক্ষা গ্রহণ, অংশত উহাদের প্রতিবাদ। সেই ইতিহাস এখানে দিবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু বাঙালীর নূতন 'নৈতিক' ও নূতন 'ধর্ম' জীবন ১৯০০ সনের কাছাকাছি কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় দিব।

চারিত্রিক উন্নতি

চরিত্র সম্বন্ধে লিখিতে গেলেও শব্দতত্ত্ব আনিতে হইবে। চরিত্র বলিতে ইংরেজী শিক্ষা পাইবার আগে যাহা বুঝিত তাহা আচরণ, যেমন 'মানব-চরিত্র', 'স্ত্রী চরিত্র' ইত্যাদি, সহজ অর্থ ছিল স্বভাব, যে-স্বভাব মরিলেও যাইত না। ইংরেজী পড়িবার পর চরিত্র বলিতে বাঙালী যাহা বুঝিতে আরম্ভ করিল তাহা ইংরেজী 'ক্যারাকটা'র কথাটার বিশিষ্ট অর্থ, নানা অর্থের এক অর্থ। সোজা বাংলায় জিতেন্দ্রিয় হইলে যে-চরিত্র হয়, সেরূপ চরিত্র। এই অর্থে 'চরিত্রবান' ও 'চরিত্রহীন' দুইটি বাক্য বাংলায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল। তাই 'চরিত্রহীন' শব্দের রূঢ় অর্থ হইল লম্পট। অনেকে সেজন্য কাহাকেও বাংলাতে চরিত্রহীন বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন, এবং একটু মৃদু করিয়া বলিবার জন্য ইংরেজীতে Characterless বলিতেন। আমি নিজের কানে এই ইংরেজী শব্দের অপব্যবহার শুনিয়াছি।

মানসিক ধর্মে ও আচারব্যবহারে উন্নত হইবার এই যে ইচ্ছা বাঙালীর মধ্যে জাগিল, উহার পরিচয় আমরা বাল্য বয়সে পাইতাম দুইটি বাণী হইতে। প্রথমত, 'আবার তোরা মানুষ হ' ইহা হইতে; দ্বিতীয়ত, 'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ করনি' হইতে। সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া যে-সব মহান বাঙালী সমগ্র জাতির শিক্ষাদাতা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই এই উপদেশ ক্রমাগত দিতেন। এই বিষয়ে 'লিবারেল' ব্রাহ্ম ও 'কনসারভেটিভ' হিন্দু, এই দুই বিভিন্নপন্থী শিক্ষাদাতাদের মধ্যে কোনও মতভেদ ছিল না। সকলেই বলিতেন, সর্বাগ্রে বাঙালীকে তাহার চরিত্রের দৌর্বল্য ও আচার-ব্যবহারের শিথিলতা ত্যাগ করিতে হইবে।

এইসব ধারণার ও ধারণার বশে কাজ করার পিছনে যে পাশ্চাত্ত্য ও বিশেষ করিয়া ইংরেজ জীবনের প্রভাব ছিল তাহা কখনও কাহারও দ্বারা অস্বীকৃত হয় নাই। বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, যতদিন আমরা ইংরেজের সমকক্ষ না হই, ততদিন যেন ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে জাতিবৈর থাকে। এই উক্তির তারিখ ১৮৭৩ সন। ইহার মাত্র কয়েক বৎসর আগে একজন বাঙালী যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও উদ্ধৃত করিব। ইনি সেই বাঙালী যাঁহার বাঙালীর পত্নীব্রত হওয়া সম্বন্ধে উক্তিও আমি উদ্ধৃত করিয়াছি।* তিনি লিখিলেন--

'Young Bengal was forming itself in imitation of Anglo-Saxon models of character. Absolute equality with Englishmen Young Bengal will never claim. His physical development can never be equal to his mental and intellectual development.'

বিলাতে একটি বক্তৃতায় এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া আমি বলিয়াছিলাম—ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমি নিজে। কিন্তু সকল বাঙালীর পক্ষে উহা বলা ঠিক নয়। অনেক বাঙালীই ইংরেজের মত উন্নতদেহ না হইলেও শারীরিক ক্ষমতায় সমকক্ষ হইতে পারিত। ১৮৮৮ সনে প্রকাশিত ভারতশাসন সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে স্যর জন স্ট্রেচী বাঙালীর শারীরিক দৌর্বল্য ও শ্রমবিমুখতার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯১১) বইটির সম্পাদক স্যর টমাস হোলডার্নেস লিখিলেন যে, এ-বিষয়ে বিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙালী অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ও পরে ব্যায়াম ইত্যাদির জন্য যে-সকল সমিতি হইয়াছিল, উহার কার্যকলাপের ফল দেখিয়া তাহা লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু দৈহিক শক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, আচরণ ও মানসিক ধর্মের দিক হইতে বাঙালী ইংরেজের কাছ হইতে বহু সদ্গুণ আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছিল। যেগুলি প্রধান তাহার উল্লেখ করিতেছি—উদ্যম, অধ্যবসায়, সাহস (দৈহিক ও নৈতিক), শৃঙ্খলা, সত্যভাষণ, আর্থিক ব্যাপারে সততা, আত্মসংযম ও 'ডিসিপ্লিন'। এই সবগুলি গুণেরই স্বল্পতা বাঙালী চরিত্রে ছিল। সর্বোপরি নূতন লক্ষ্য এই হইল যে, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। এই ধারণাটাও নূতন। ইউরোপীয় 'হিউম্যানিজম্' হইতে আসিয়াছে। এ-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, 'সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।' সকল প্রকার মানসিক বৃত্তিকে তিনি দুইভাগে ভাগ করিলেন—প্রথম, কার্যকারণী বৃত্তি, দ্বিতীয় জ্ঞানার্জনী বৃত্তি।

ইংরেজের কাছ হইতে যে, দৈনিক আচরণ সম্বন্ধেও শিক্ষা করিবার আছে, তাহা স্কুলে পড়িবার সময়ে একটি পাঠ্যপুস্তকে দেখিয়াছিলাম। তাহাতে বাঙালীরা যে রাস্তায় দেখা হইলেই দাঁড়াইয়া গল্প জুড়িয়া দেয় সেই অভ্যাসকে

---

* ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিন্দনীয় বলা হইয়াছিল, এবং ইংরেজ রাস্তায় কিভাবে বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির প্রতি সামাজিক কর্তব্য পালন করে তাহার বর্ণনা এই ভাষায় দেওয়া হইয়াছিল—

'শিরস্ত্রাণ উত্তোলন, শির-সঞ্চালন, ও হস্ত-কম্পন করিয়াই তাহারা বিদায় লইয়া থাকে।'

একেবারে নূতন একটা ধারণা জন্মিল অর্থ সম্বন্ধে। পুরাতন সমাজে দুই প্রকার সাধনার প্রতি শুধু শ্রদ্ধাই নয়, ভক্তি ছিল। প্রথমত, সকল পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ করিয়া পারলৌকিক সম্পদের সাধনা; দ্বিতীয়ত, সকল অপার্থিব সম্পদের কথা ভুলিয়া অর্থের সাধনা—নাস্তি তু তৃতীয়ঃ; ইহাই ছিল প্রাচীন ধারণা। বাঙালীর নূতন যুগে অর্থের জন্য অর্থের পূজা নিন্দনীয় হইল। বঙ্কিম লিখিলেন, 'কিয়ৎ পরিমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্ক্ষা মাত্র হওয়া অমঙ্গলজনক এ-কথা বলি না, ধন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর।' ব্রাহ্মরা এ-বিষয়ে আরও একটু অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে ইংরেজ 'পিউরিটান'দের আদর্শ গ্রহণ করিলেন। 'পিউরিটান'রা ধর্মের সঙ্গে অর্থের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল, সুতরাং তাহারা অর্থগৃধ্নু না হইয়া সৎ উপায়ে অর্থোপার্জন করাকে বা অর্থবৃদ্ধি করাকে প্রায় সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। ব্রাহ্মরাও এই পথ ধরিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে একনিষ্ঠভাবে ধর্মপরায়ণ ও ঈশ্বর-ভক্ত বলিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন, সেই পরেশবাবুকেও অর্থসম্বন্ধে সচেষ্ট করিলেন। পরেশবাবু সুচরিতাকে বলিলেন, 'মৃত্যুর সময়ে তোমার বাবা আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যান। আমি তাই খাটিয়ে বাড়িয়ে তুলে কলকাতায় দুটো বাড়ী কিনেছি। এতদিন তার ভাড়া পাচ্ছিলুম, তাও জমছিল...' ইত্যাদি। অর্থ সম্বন্ধে উদাসীন বা বে-হিসাবী হওয়া ব্রাহ্মরা অন্যায় মনে করিতেন। সেজন্যই অনেক ব্রাহ্ম প্রচারক হইয়া দারিদ্র্য বরণ করিলেও, কোন কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ব্যবসা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। ইঁহাদের মধ্যে গুরুচরণ মহলানবীশ (প্রশান্তকুমার মহলানবীশের পিতা), উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের নাম করিতে পারি। ইঁহারা বৈষয়িক আচরণে ইংরেজ 'পিউরিটান'দের মত ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের উপার্জিত অর্থের গৌরবে, ইঁহাদের পুত্রেরা বাঙালী বড়লোক হইয়া গেলেন, 'পিউরিটান'দের ধর্মবুদ্ধি ও ব্যবসাবুদ্ধি দুইই হারাইলেন, ও সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের ব্যবসাও নষ্ট হইয়া গেল।

কিন্তু এই যুগের শিক্ষিত বাঙালী অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করাও অশোভন মনে করিতেন, অর্থের বড়াই করা তো অকল্পনীয় ছিল। পক্ষান্তরে এই শ্রেণীর বাঙালী ভদ্রলোক নিজেদের আর্থিক অবস্থা গোপন করিয়া রাখিতেন। একটি সরল-প্রকৃতি ব্রাহ্মের দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিতেন বলিয়া স্ত্রীর শাসনে ছিলেন। তিনি এক আত্মীয়ের কাছ হইতে কিছু টাকা পাইয়াছিলেন। ইহা জানিয়া একজন বন্ধু তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, কত? তিনি অত্যন্ত সত্যপরায়ণ ছিলেন, তাই উত্তর দিলেন, 'আমার স্ত্রীর নিষেধ আছে বলা।' বন্ধু চালাক, তখন জিজ্ঞাসা করিল, 'পনেরো হাজার?' সত্যপরায়ণ ভদ্রলোক উত্তর না দিয়া পারিলেন না, বলিলেন, 'না, অত নয়।' তখন চালাক বন্ধু আবার বলিলেন, 'দশ হাজার?' তখন ভদ্রলোক সত্যের খাতিরে আবার বলিলেন, 'না, অত কম নয়।' মোটের উপর অর্থ সম্বন্ধে শালীনতা বজায় রাখিয়া নিজের সম্পদ অনুযায়ী থাকা সকল শিক্ষিত বাঙালীর আচরণ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা অপব্যয়কে যেমন নিন্দা করিতেন, কৃপণতাকে তেমনই নিন্দা করিতেন। কিন্তু তিনটি ব্যাপারে না ব্রাহ্ম, না নব্য রক্ষণশীল বাঙালী কেহই ঢিলা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই তিনটি এই—স্ত্রীলোক-ঘটিত অনাচার, অর্থঘটিত অসততা, ও মদ্যপান।

তবে বাঙালীর চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্মের জন্য বাঙালীর অন্যায় কার্যকলাপে যেমন অসংযম দেখা যাইত, ভাল কাজেও সেই অসংযম দেখা গেল। নব্য বাঙালী স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসিয়াই লম্পট হওয়া, অর্থের সন্ধানে গিয়া চোর বা জুয়াচোর হওয়া যেমন ছাড়িল, তেমনি আবার নীতিবান হইয়া নৈতিক শুচিবাই ধরিল। এই শুচিবাই যেমন হিন্দুর দিকে কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত হইল, ব্রাহ্ম-দিকেও তেমনি হইল।

দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্কুলে আমাকে চন্দ্রনাথ বসুর 'সংযম-শিক্ষা' পড়িতে হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথের হিং টিং ছটের ব্যাখ্যাকারক গৌড়ীয় পণ্ডিত নাকি চন্দ্রনাথবাবু। সে যাহাই হউক, সংযম শিক্ষা কি করিয়া দিতে হয়, উহা দেখাইবার জন্য চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার পরিচিত এক ধর্মনিষ্ঠ ও সংযমী বাঙালী ভদ্রলোকের কথা বলিলেন। সেই ভদ্রলোক পুত্রকে ক্ষীর মুখে লইয়া অল্পক্ষণ মুখে রাখিয়া কুলকুচি করিয়া ফেলিয়া দিতে বলিতেন, যাহাতে অনাসক্ত হইয়া ক্ষীর খাইতে পারে।

ব্রাহ্ম শুচিবাই-এর দৃষ্টান্ত, আমার স্ত্রীর মুখে শোনা, ১৯৩৫-৩৬ সনের কথা। আমাদের নীচের তলায় একটি পরিবার বাস করিতেন। গৃহস্বামী সুপরিচিত লেখক ছিলেন, নাম করিব না। তাঁহাদের সঙ্গে একটি অবিবাহিতা পনেরো-ষোল বছরের মাতৃহীনা আত্মীয়-কন্যা থাকিত। তাহার দিদিমা আমাদের আগের যুগের গোঁড়া এবং সুপরিচিত ব্রাহ্ম পরিবারের ছিলেন। মেয়েটি একদিন আমার স্ত্রীকে বলিল, 'দিদিমার জ্বালায় আমি শান্তিতে ঘুমুতে পারিনে।' স্ত্রী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, কি ব্যাপার?' তখন এই উত্তর পাইলেন—দিদিমা একদিন ভোরে তাহার শোবার ঘরে আসিয়া দেখিলেন যে সে চিৎ হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে তখনই জাগাইয়া যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'কুমারী মেয়ের চিৎ হয়ে ঘুমানো যে কেবল অশোভন তাই নয়, দুর্নীতিরও চরম।'

তখনকার দিনে সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারেও এই মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখা যাইত। একটি ঘটনার কথা—১৯০০ সনের কাছাকাছি, আমার মা আমাকে বলিয়াছিলেন। উহা তাঁহার গ্রামেই ঘটে। একটি যুবক বাড়ীর কর্তা। সে

বিবাহিত, কলিকাতা থাকিয়া পড়াশুনা করে, গ্রামের বাড়ী তাহার মায়ের তত্ত্বাবধানে। সে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া স্ত্রী-পুরুষের সাম্যের ধারণা গ্রহণ করিল ও গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল যে যতদিন সে বাড়ীতে আছে তাহার তরুণী পত্নীকে তাহার পাশে বসাইয়া খাওয়াইতে হইবে। বিধবা মাতা পুত্রের এই নির্দেশ অমান্য করিবার সাহস পাইলেন না। কিন্তু তরুণী বধূর অবস্থা কি হইল তাহা বর্ণনা করা কঠিন নয়। সে ঘোমটা টানিয়া খাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিষম খাইতে লাগিল। শেষকালে যখন দুজনের পাতেই পেটির মাছ দেওয়া হইল, পুত্র স্ত্রীর পাতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে মাকে বলিল, 'মা! ওর পাতের মাছটা ছোট কেন?' ইহার পরের ঘটনা মা কি বলিয়াছিলেন মনে নাই—সম্ভবত স্ত্রী স্বামীর ক্রোধ অগ্রাহ্য করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, কিম্বা বেহুঁস হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

আমার বাল্যজীবন এই আত্মসংযম ও সমাজ-সংস্কারের ধারণাতেই কাটিয়াছিল। সুতরাং আমিও অনেক বয়স পর্যন্ত সংযমের ব্যাপারে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতাম। স্কুলে পড়িবার সময় আমার ধারণা হইল চেয়ারে বসিয়া পড়া আলস্য ও বিলাসিতার লক্ষণ,—তাই টেবিলের উপর একটা ছোট ডেস্ক রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া আর এক ধরণের কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করিলাম। তখন সাত বৎসর আমি তোষকের উপরে শোয়া বিলাসিতা বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম। সিমেণ্টের মেজেতে মাদুরের উপর শুইতাম, এক শীতকালে ছাড়া। তখন একটা কিছু পাতিয়া লইতাম ও লেপ ব্যবহার করিতাম।

তাহা ছাড়া স্কুলে পড়িবার সময়ে দেখিতাম, শিক্ষক কোন ছাত্র নুইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলিতেন, 'stand up straight'। সেজন্য আমি সর্বদাই বুক চিতাইয়া দাঁড়াইতাম, শুধু ক্লাসে নয়, সব সময়ে।

বাঙ্গাল বলিয়া এইসব অভ্যাস আয়ত্ত করিয়া যখন ১৯১০ সনে কলিকাতা আসিলাম, তখন কলিকাতার ছেলেরা আমাকে বলিত, 'তুমি অত বুক চিতিয়ে দাঁড়াও কেন?' তবে ইহার ফল ভালই হইয়াছে। নব্বুই বৎসর পার হইয়াও এখনও আমার দৈহিক পিঠ গোল হইয়া যায় নাই, দৈহিক কোমরও ভাঙিয়া যায় নাই।

অন্যদিকেও অল্প বিস্তর নিজেকে রাশ টানিয়া রাখিবার জন্য নব্বুই উত্তীর্ণ হইবার পরও মনের পিঠও গোল হয় নাই, মনের কোমরও ভাঙ্গে নাই। এই বইটির মত বই লিখিতে পারিতেছি। এমন কি এই বই-এ যাহা আছে, নৈতিক শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকদের বিবেচনায় তাহা অশ্লীলতা বলিয়াই মনে হইবে। ইহাও লিখিতে পারিতেছি। সাহিত্যিক অশ্লীলতাতে উৎকর্ষের জন্যও সংযম আবশ্যক।

সমগ্রভাবে বাঙালী সমাজের কথা বিবেচনা করিয়াও ইহাই বলিব। বাঙালী এই যুগে প্রতিভায় যেমন অসামান্যতা দেখাইয়াছিল, তেমনি চরিত্র-বলেও

অসামান্যতা দেখাইয়াছিল। অথচ এই চরিত্রবান ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। কেবল একজন অন্য বিষয়ে প্রতিভার সঙ্গে এমন চরিত্রবল দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি সকল বাঙালীর চরিত্র-মাহাত্ম্যের দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছেন—তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি খ্যাতিতে একক হইলেও, চারিত্রিক বলে একক নহেন। এই চরিত্রের বাঙালীরাই বাঙালী সমাজে দৃঢ়তা আনিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাদের মধ্যে **Primus inter pares.**

তাঁহারা সকলেই বুঝিতেন জ্ঞানে ও কর্মে উন্নত হইতে হইলে সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির বাসনাকে সংযমিত করিয়া নিজেকে স্বাধীন করিতে হইবে। তাঁহারা বুঝিলেন, মানুষের প্রকৃত দাসত্ব বাহিরের লোকের বা বাহিরের অবস্থার অধীনতা নয়, আসল দাসত্ব প্রবৃত্তির অধীনে থাকা। এই দাসত্ব হইতে মুক্ত না হইলে কাহারও পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। এই উপদেশ দিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন। উহা এইটি—

'যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥'

কূর্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গসকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনই যিনি ইন্দ্রিয়ের লক্ষীভূত বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল সংহরণ করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫৮ শ্লোক)

বঙ্কিম ইহার পর লিখিলেন, 'এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোনপ্রকার ধর্মাচরণ নাই, ইহা সকল ধর্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্মমন্দিরের প্রথম সোপান।' এই প্রসঙ্গে তিনি গীতার বক্তব্যের সমর্থনে ইমানুয়েল কান্টের এই উক্তিও উদ্ধৃত করিলেন—

'All ethical gymnastic consists therefore singly in subjugating the instincts and appetites of our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances hazardous to morality ; a gymnastic exercise rendering the will hardy and robust and which by the consciousness of regained freedom makes the heart glad.'

(Kant : Metaphysics of Ethics)

বলা প্রয়োজন, বঙ্কিম গীতার উপর নির্ভর করিলেও তিনি যে আত্মসংযম প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা কান্টের প্রচারিত সংযমের বেশী কাছাকাছি। গীতার কথা—শুভতেও আনন্দিত হইবে না, অশুভতেও বিরক্ত হইবে না, অর্থাৎ সর্বত্র 'স্নেহশূন্য'—শ্রীধর স্বামীর মতে পুত্রমিত্র সম্বন্ধেও স্নেহশূন্য, শঙ্করের মতে দেহ ও জীবন সম্বন্ধেও স্নেহশূন্য হইবে। সংযম সম্বন্ধে বাঙালীর নূতন অনুভূতিতে জীবন সম্বন্ধে এই নির্লিপ্ততা ছিল না। জীবনকে প্রকৃত মূল্য দিতে হইলে সংযত হইতে হইবে এই ধারণা ছিল। উহা ইউরোপীয়।

সুতরাং তখনকার দিনে 'নীতিপরায়ণতা'র কথা বলিতে চাহিলে শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী 'প্রিন্সিপ্‌ল' শব্দটা ব্যবহার করিত। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যাপূরণ' গল্পে আধুনিক পুত্র বিপিনবিহারী ('দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, অতিশয় সচ্চরিত্র, এমন কি তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না।') যখন শুনিলেন যে, তাঁহার ধর্মনিষ্ঠ ও দয়াবান, ও দানী পিতার মুসলমানী উপপত্নী ছিল এবং তাহার গর্ভে একটি পুত্রও হইয়াছিল, তখন 'এটুকু তাঁহার মনে উদয় হইল, সেকালের ধর্মনিষ্ঠা এরূপ বটে ; শিক্ষা ও চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল ; স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্‌ল না থাকার এই ফল'। মনে রাখিতে হইবে বিপিন হিন্দু, ব্রাহ্ম নন। তেমনই 'গোরা' উপন্যাসে গোঁড়া নব্য হিন্দু অবিনাশ ও তাহার বন্ধুরা বলিল, 'আমরা বিনয়বাবুর মত বিদ্বান নই, আমাদের অত অত্যন্ত বেশী বুদ্ধিও নাই, কিন্তু বাপু, আমরা বরাবর যা হয় একটা প্রিন্সিপ্‌ল ধরিয়া আসিয়াছি…' ইত্যাদি।

এটাও একটা বিশেষ অর্থে 'প্রিন্সিপ্‌ল'। ইহার অর্থ অক্স্‌ফোর্ড ইংলিশ ডিক্‌শনারীতে এইভাবে দেওয়া আছে—'An inward or personal view of right conduct' (OED, Vol. O-P, p. 1377, sense 7b) আরও বিশদভাবে বুঝইবার জন্য শার্লট্‌ ব্রণ্টির 'শার্লি' উপন্যাস হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি। মিসেস প্রায়র ক্যারোলাইন হেল্‌স্টনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'My dear, you acknowledge an inestimable value in principle ?' অষ্টাদশ বর্ষীয়া ক্যারোলাইন উত্তর দিল, 'I am sure no character can have true worth without it.' প্রত্যেক সচ্চরিত্র বাঙালীই ঠিক এই কথা বলিত, ভণ্ডেরাও না বলিয়া পারিত না।

ঈশ্বরপ্রেম

নবযুগের বাঙালীর যে-ঈশ্বরে বিশ্বাসের, ও যাঁহার প্রতি তাহাদের ভক্তির কথা বলিতে যাইতেছি, তিনি বাঙালীর নূতন প্রেমের রক্ষাকর্তা হিসাবে সৃষ্ট হন নাই, হইয়াছিলেন তাহার বহু পূর্বে বিশেষ দাবীতে। সেই ঈশ্বরের উপর সর্বান্তঃকরণে বাঙালী নির্ভর করিত বলিয়াই তাঁহাকে প্রেমেরও রক্ষাকর্তা করিল।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল ব্রাহ্ম ধর্মের দ্বারা। উহার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতে হইবে। তাহার পূর্বে আর একটা জিনিস দেখাইবার প্রয়োজন আছে—ব্রাহ্ম-হিন্দু-নির্বিশেষে এই নূতন বিশ্বাস বাঙালী শিক্ষিত সমাজে আমার শিশুকালেও কি রূপে দেখা যাইত।

আমরা ব্রাহ্মপন্থী হইলেও দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলাম না। গ্রামে পৈতৃক বাড়ীতে ধুমধাম করিয়া দুর্গা পূজা হইত। তাহাতে যোগ দিবার জন্য প্রতি বৎসর কিশোরগঞ্জ শহর হইতে পৈতৃক নিবাস বনগ্রামে যাইতাম—বলির পাঁঠার

তত্ত্বাবধান করিতাম, পাঁঠা এবং মহিষ বলি দেখিতাম। বিজয়া দশমীর দিনে পুরোহিত আমাদের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া খড়্গ ছোঁয়াইতেন। কিশোরগঞ্জের বাসাতেও ষষ্ঠী-ভাইফোঁটা ইত্যাদি অনুষ্ঠান হইত। তবুও আমাদের আসল ধর্মবিশ্বাস ছিল ব্রাহ্ম ধর্ম হইতে লব্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস। কিশোরগঞ্জে একটি ছোট ব্রাহ্ম মন্দির ছিল, উহাতে মাঘোৎসবের সময় আমরা যাইতাম। মা শিলং-এ তাঁহার ভাইদের বাড়ীতে গেলে যে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতেন তাহার কথা বলিয়াছি।

আমাদের বাড়ীতে কখনও ব্রাহ্ম উপাসনা হইত না। তবে আমার এগারো বৎসর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ভাই-এর প্রথম জন্মোৎসবে প্রার্থনা লিখিবার ভার আমার উপর দেওয়া হইয়াছিল। আমি অত্যন্ত খাঁটি ব্রাহ্ম ভাষায় লিখিলাম, 'হে ভগবান, গত বৎসর তুমি আমাকে ফুলের মত এই ছোট ভাইটি দিয়াছিলে…' ইত্যাদি ও একেবারে ব্রাহ্মসুরে পড়িলাম। ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

এই ঘটনাটা ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বরের ধারণা আমার শুধু ব্রহ্মসঙ্গীত হইতেই হইয়াছিল। আমার মার ব্রহ্মসঙ্গীত ছিল। পরে দেখিয়াছি, আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীরও ছিল। মা উহার প্রায় সব গানই জানিতেন ও হার্মোনিয়ামের সঙ্গে গাহিতেন। কখনও কখনও আমার বাবাই সঙ্গে সঙ্গে হার্মোনিয়াম বাজাইতেন। দুইটি গানের উল্লেখ করিব।

খুব ভোরে আমাদের শোবার বড় আটচালার মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র বিছানা হইতে শুনিতাম, মা ললিত রাগিণীতে গাহিতেছেন,—

'অয়ি সুখময়ী ঊষে! কে তোমারে নিরমিল,
বালার্ক-সিন্দুর ফোঁটা কে তোমারি ভালে দিল।'
—ইত্যাদি।

আর একটা গান নৌকায় যাইতে যাইতে শুনিয়াছিলাম। কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্ব-অঞ্চলে একটা বিস্তীর্ণ 'হাওর' ছিল, উহার নাম ছিল 'বড় হাওর'। একদিন আমরা উহার উপর দিয়া নিখলীর দিক হইতে ঢুলদিয়ার দিকে যাইতেছি। নৌকায় পাল তোলা, উহা পশ্চিম দিকে চলিতেছিল। তখন সূর্যাস্তের সময় বাবা মাকে একটা গান গাহিতে বলিলেন। মা পূরবী রাগিণীতে গাহিলেন,—

'দিবা অবসান হলো, কি কর বসিয়া মন,
আয়ুসূর্য অস্ত যায় দেখিয়া না দেখ তায়…' ইত্যাদি।

আমি ছইএর বাহিরে বসিয়াছিলাম। সম্মুখে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলিয়া পড়িয়াছিল, মনে হইল আমারই আয়ুসূর্য অস্ত যাইতেছে। তখন আমার বয়স আট বৎসর। কিন্তু শৈশবে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও গান হইতে যে-ধারণা মনের মধ্যে সৃষ্ট হয়, তাহার প্রভাব চিরজীবন থাকে।

এই ঈশ্বর ব্রাহ্মদের সৃষ্ট বলিয়া গোঁড়া ব্রাহ্মরা তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রেমে হিন্দুরা ভাগ বসাইতে আসিতেছে উহা পছন্দ করিতেন না। শিলং শহরে বাঙালীদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব খুব বেশী ছিল। তাই হিন্দুরাও শিলং-

এর ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। ইহার জন্য একদিন কি হইল আমার মাতার মুখে শুনিলাম। তিনি সেদিনের উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন। একজন দীক্ষিত, গোঁড়া, অসহিষ্ণু ব্রাহ্ম প্রার্থনা করিতেছিলেন। তিনি অন্যান্য প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাও করিলেন,—

'হে ভগবান, যাহারা দুর্গাপূজার ছুটির সময়ে গ্রামে গিয়া দুর্গার প্রতিমাকে প্রণাম করে আর শিলং-এ আসিয়া তোমার উপাসনা করিতে চায় তাহাদের মাথায় কুঠার মারো, কুঠার মারো, কুঠার মারো।'

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শিক্ষিত হিন্দুরা দুই কূলই রাখিয়া দুর্গা পূজা ও ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিল।

এই ঈশ্বরের আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেই। তাঁহার প্রচার প্রথমে হইল রামমোহনের দ্বারা—উপনিষদের ব্রহ্মরূপে। কিন্তু রামমোহনের ব্রহ্ম তর্কের ঈশ্বর ছিলেন, ভক্তির ঈশ্বর হইতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহার বন্ধু ও সহায়ক দ্বারকানাথ ঠাকুরও ব্রহ্মের প্রতি ভক্তিশীল হইতে পারেন নাই। পরন্তু তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথের এই ঝোঁক দেখিয়া বিরক্ত হইতেন। তাঁহার রাগ বিশেষ করিয়া পড়িল তত্ত্ববোধিনী সভার পুরোহিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর। উহার বাংলাটা আমার হাতের কাছে নাই, ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

দ্বারকানাথ বলিলেন,—

> 'I always thought Vidyavagish was a good fellow, but now I find he is spoiling Debendra with his preaching of Brahmo mantras. As it is, he has little head for business ; now he neglects business altogether ; it is nothing but Brahma, Brahma, the whole day.'

মৃত্যুর পূর্বে বিলাত হইতেও তিনি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচর্চা সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তাই ১৮৪৬ সনের ১৯শে মে তারিখে তিনি লিখিলেন।

'My dear Debender [হিন্দী ধরণে পুত্রের নাম ধরিয়া],

> It is a source of wonder to me that all my estates are not ruined. Your time I am sure is being more taken up in writing for the newspapers and in fighting with the missionaries than in watching over and protecting these important matters [বিষয় সংক্রান্ত], which you leave in the hands of your favourite Amlahs instead of attending to them yourself most vigilantly.'

রামমোহনের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে ইহা সত্য যে তিনি বাঙালী জীবনে ঈশ্বর সম্বন্ধে নূতন চিন্তার ধারা জাগাইলেন। কিন্তু উহাকে আলোচনা হইতে অনুভূতির মধ্যে লইয়া যাইতে পারেন নাই। 'ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর,' তিনি যেন এই প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করিলেন। তাঁহার বিলাত

যাওয়ার সঙ্গে তাঁহার প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। ইহাতে নূতন জীবন দিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার পিতার অবিশ্বাস যাহাই হউক, এ-বিষয়ে তিনি কীর্তিমান হইলেন। কিন্তু তিনিও বাঙালী শিক্ষিত সমাজে ব্যাপকভাবে ঈশ্বরানুভূতি বা ঈশ্বরপ্রেম আনিতে পারেন নাই। তবে নিজের জীবনে দুইটি জিনিষকেই একান্তভাবে আনিয়াছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বর-ভক্তিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই ধর্মপুত্র ও উত্তরাধিকারী।

নূতন ঈশ্বর-ভক্তি বাঙালী শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁহার প্রচারের মধ্যে যে-শক্তি দেখা গেল তাহার পিছনে ছিল তাঁহার নিজের ঐকান্তিক বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাস-প্রসূত বাগ্মিতা। কি ইংরেজীতে, কি বাংলাতে যে-ভাষাতেই হউক না কেন, তিনি শ্রোতাদের বিচলিত করিতে পারিতেন। তিনি ১৮৭০ সনে বত্রিশ বৎসর বয়সে বিলাত গিয়াও সাড়া জাগাইয়াছিলেন।

সেখানে তাঁহার যে শুধু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিতই সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা নয়, অক্সফোর্ডে বিখ্যাত ডাঃ পিউজির সহিতও কথাবার্তা হইয়াছিল। ম্যাক্সমূলার তাঁহাকে পিউজির কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে কেশব নিজের ধর্মবিশ্বাসের কথা বলিয়াছিলেন। ম্যাক্সমূলার ডাঃ পিউজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খৃষ্টান না হইলে কাহারও মুক্তি সম্ভব কিনা। ডাঃ পিউজি অবশ্য বলিলেন—'না'। তখন কেশবের সহিত তাঁহার 'বিচার' আরম্ভ হইল। কেশব বলিলেন, ঈশ্বরের সহিত সতত যোগ রাখাই মুক্তি। ডাঃ পিউজি তাহা মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন কেশব বলিলেন, **'My thoughts are never away from God. My life is a constant prayer, and there are but few moments in the day in which I am not praying to God'.** এই কথা শুনিয়া ডাঃ পিউজি কিছু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, **'Then you are all right.'**

১৮৬০ সনের কাছাকাছি হইতে ১৮৭৮ সন পর্যন্ত কেশবই যে বাঙালীর ধর্মজীবনের একমাত্র ও অবিসম্বাদিত নেতা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী অবশেষে যে এক-ও-অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইল, এবং হিন্দু দেবপূজা করিলেও ঈশ্বরের পূজাই চরম পূজা বলিয়া মানিয়া লইল, তাহা কেশবচন্দ্রেরই প্রচারের ফল। অবশ্য ইহার জন্য কেশবকে সামাজিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার নেতৃত্বে ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই উৎপীড়নের কথা ১৮৭৬ সনে জন্মিয়া শরৎচন্দ্র জানিতেন বলিয়াই রাসবিহারীর মুখে এই উক্তি দিয়াছিলেন—'বনমালীর মেয়ে কি তার বাপের গ্রাম থেকে আজীবন নির্বাসন দুঃখও একবার ভেবে দেখলে না ?' এই অত্যাচার গ্রামেই হইত, তাই ব্রাহ্মরা প্রায় সকলেই শহরবাসী হইয়া গেলেন। আমার এক জ্যাঠামহাশয় ঢাকায় পড়িবার সময়ে ব্রাহ্মধর্মের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার উপর একটা মৃদু অত্যাচার করিয়া রোগ ছাড়ানো হইল। তাঁহার এক খুড়া-মহাশয়

পূজার সময়ে তাঁহাকে ঢাকা হইতে ধরিয়া আনিয়া নবমী তিথিতে মহিষ বলি হইবার পর মহিষের রক্তে স্নান করাইয়া দিলেন। তাঁহাকে আর ঢাকায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইল না। তাহার পর তিনি চিরজীবন নিষ্ঠাবান হিন্দু রহিলেন। আমার পিতামাতা আসল অত্যাচারের কথা আমাকে অনেক বলিতেন, এবং মা একটা গান গাহিয়া বুঝাইতেন কাহার উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মগণ এই অত্যাচার সহ্য করিত। গানটা এইরূপ—

'কি ভয় ভাবনা রে মন, লয়েছ যাঁর আশ্রয়,
সর্বশক্তিমান তিনি পরম করুণাময়।
কি করিবে শত্রুগণে অপমানে নির্যাতনে,
না হয় মরিব প্রাণে গাইয়া তাঁহারি জয়।'

মা বলিতেন, 'সে অত্যাচার কি রকম ছিল তার ধারণা তোমরা করতে পারবে না।' ব্রাহ্মদের যে একটা উৎকট গোঁড়ামি পরে দেখা গেল, উহার কারণ এই অত্যাচার।

কিন্তু নূতন একেশ্বরবাদী বাঙালীরা তাঁহাদের এই ঈশ্বরকে নূতন বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। সেন্ট পল যেমন এথেন্সবাসীদের বলিয়াছিলেন, 'হে এথেন্সবাসীগণ, আমি দেখিতে পাইতেছি তোমরা সকল ব্যাপারেই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। কারণ আমি আসিতে আসিতে তোমাদের ভক্তির পরিচয় পাইলাম। দেখিলাম, একটি বেদী, তাহাতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে—"অজানা ঈশ্বরের উদ্দেশে।" তবে তোমরা অজ্ঞাতসারে তাঁহার পূজা কর। আমি তাঁহাকেই তোমাদের কাছে প্রকাশ করিতেছি।' তেমনই ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন-কর্তারাও বলিলেন, 'হিন্দুগণ, তোমাদেরও একজন একক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন। তাঁহার কথা তোমরা বিস্মৃত হইয়াছ। তোমাদের অপৌরুষেয় শ্রুতি হইতেই তাঁহার পরিচয় দিতেছি, এবং আমরা তাঁহারই পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছি।'

সেই ঈশ্বর তাঁহারা আনিলেন উপনিষদ হইতে। তাঁহার নামও দিলেন 'ব্রহ্ম'। সেন্ট পল এথেন্সবাসীদের অজানা ঈশ্বরকে খৃষ্টধর্মের ঈশ্বর বলিয়া যেমন ভুল করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকেরাও তাঁহাদের ঈশ্বরকে উপনিষদের ব্রহ্ম বলিয়া প্রচার করিয়া ভুল করিলেন। তাঁহাদের ঈশ্বরে ও উপনিষদের ঈশ্বরের মধ্যে কোনও একাত্মতা ছিল না। উপনিষদের ব্রহ্ম মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধির অগোচর। তাঁহার প্রতি ভক্তি বা প্রেমের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তিনি মানুষের আয়ত্ত ন'ন। যদিও বা কখনও তিনি মানবের মধ্যে আবির্ভূত হন, সেটা ঘটে তাঁহারই ইচ্ছায়। 'আত্মা প্রবচনের দ্বারা, মেধার দ্বারা বা বহু অধ্যয়নের দ্বারা লভ্য নহেন। যাহাকে তিনি বরণ করেন শুধু তাহার দ্বারাই তিনি লভ্য, তাহার কাছেই তিনি নিজের রূপ প্রকাশ করেন।' (এই অনুবাদে আপত্তি করিয়া যদি কেহ শংকরকৃত অর্থ গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতে বলিব) আত্মাই ব্রহ্ম ইহা বলার আবশ্যক রাখে না।

এই ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মদের 'ব্রহ্মসঙ্গীতে'র ব্রহ্মের কোন যোগ নাই। 'তোমারি

ইচ্ছা হউক পূর্ণ', করুণাময় স্বামী' বা 'অন্ধজনে দেহ আলো মৃত জনে দেহ প্রাণ—তুমি করুণামৃতসিন্ধু, কর করুণা কণা দান'—এই দুইটি গানের 'ব্রহ্ম' (আমার মা প্রায়ই এই দুইটি গান গাহিতেন), এক নহেন। আর একটা গান এত উচ্চস্তরের অনুভূতির পরিচায়ক না হইলেও, অনেক সহজবোধ্য বলিয়া ব্রাহ্মদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। উহার সুরও মাতার মুখে শুনিয়া আমি খুব উৎসাহ ভরে গাহিতাম। গানটির প্রথম কয়েকটি কথা এই—

'জগতে উঠিছে জয়, ব্রহ্ম ব্রহ্ম ধ্বনি।
সে-নামের গন্ধ পেয়ে ছুটে আসে অন্ধ হয়ে,
ব্রহ্ম নামে উঠুক কেঁপে ব্যোম-মেদিনী……..'

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যেমন আমরা গলা ছাড়িয়া গাহিতাম,

'কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি,
জাগিয়া উঠুক মৃতপ্রাণ……..'

—তেমনই এই ব্রহ্মসঙ্গীতটিও গাহিতাম। এই ব্রহ্মসঙ্গীতটির আর দুটি কথা ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে উপনিষদের ব্রহ্ম হইতে আরও দূরে সরাইয়া দিত। কথা দুটি এই—

'ওঁ ব্রহ্মনামের গুণে
ছুটে করে পলায়ন,
পাপ-বারণ।'

আশা করি পাঠক-পাঠিকারা, বিশেষতঃ পাঠিকারা, বুঝিবেন যে, এই 'বারণ' 'যদি বারণ করো তবে গাহিব না', সেই গানের 'বারণ' নয়, উহা হাতী। 'পলায়নে'র সঙ্গে মিল দিবার জন্য বেচারা হাতী ব্রাহ্মদের কাছে শরীরধারী পাপ হইয়া গেল।

ব্রাহ্মরা তাঁহাদের ঈশ্বরের নামকরণ কেন উপনিষদ হইতে করিলেন তাহার কারণ অংশত ধর্মগত, কিন্তু বেশীর ভাগ রাজনৈতিক। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল মিশনারীদের প্রচারের ফলে হিন্দুরা যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেছিল তাহাতে বাধা দেওয়া। উচ্চবর্ণের বাঙালীর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ যে ব্রাহ্ম ধর্মের জন্য বন্ধ হইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেন না যে, তাঁহাদের ঈশ্বর বিদেশ হইতে আনা। দ্বিতীয় কারণ জাতীয়তাবোধ। ইহার জন্য নূতন একেশ্বরবাদকে প্রাচীন হিন্দুত্বের সহিত যুক্ত করিতে হইল। এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মরা হিন্দুধর্মের একটা নিজস্ব ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে আরম্ভ করিলেন।

আমিও এই বিবরণে বাল্যকালে বিশ্বাস করিতাম। বিবরণটা এই—প্রাচীন হিন্দু একেশ্বরবাদী ছিল (উপনিষদ দেখ), কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে সেই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম নষ্ট হইয়া গেল। পরে আবার যখন হিন্দুধর্ম ফিরিয়া আসিল তাহা আর পুরাতন একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্ম রহিল না, বহু দেবতাবাদী পৌত্তলিক, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম হইয়া গেল। আমার মাতাকে প্রচলিত হিন্দু-

ধর্মকে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বলিতে শুনিতাম। আসলে এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক।

ব্রাহ্ম ঈশ্বর যে আসলে খৃষ্টধর্মের ঈশ্বর তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সে-যুগের ব্রাহ্মরা নিজেদেরকে কিছুতেই হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। গোঁড়া ব্রাহ্ম মহিলা নিজের কন্যা কোনও অন্যায় আচরণ করিলে বলিতেন 'হিঁদু বাড়ীর মেয়েরাও এসব করে না।' হিন্দুমাত্রকেই ব্রাহ্মরা বলিতেন, 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু'। তাঁহারা হিন্দুকে হিন্দু না বলিয়া মৌখিক ভাষায় যে 'হিঁদু' বলিতেন তাহা হইতেই বোঝা যাইবে হিন্দুদের উপর ব্রাহ্মদের কিরূপ বিরাগ ছিল।

দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মরা কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন না, এমন কি মহাভারতকে অশ্লীল গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আমি বাল্যকালে কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতাম, কিন্তু উহার আদিপর্ব পড়িতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'তে লিখিয়াছেন,—

> 'সে-সময়ে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষিত দলের মধ্যে ভগবদ্‌গীতা লইয়া আলোচনা ছিল না। কিন্তু পরেশবাবু সুচরিতাকে লইয়া মাঝে মাঝে গীতা পড়িতেন—কালী সিংহের মহাভারতও তিনি প্রায় সমস্তটা* সুচরিতাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হারাণবাবুর তাহা ভাল লাগে নাই। এ-সমস্ত গ্রন্থ তিনি ব্রাহ্ম পরিবার হইতে নির্বাসিত করিবার পক্ষপাতী। তিনি নিজেও এগুলি পড়েন নাই। রামায়ণ মহাভারত-ভগবদ্‌গীতাকে তিনি হিন্দুদের সামগ্রী বলিয়া স্বতন্ত্র রাখিতে চাহিতেন। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বাইবেলই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল।'

তবু পরেশবাবুর বসিবার ঘরে এইসব গ্রন্থ না রাখিয়া রাখা হইয়াছিল অন্য ধরনের গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ এই ঘরটির বর্ণনা দিয়াছেন এইরূপ,—

> 'দেয়ালে একদিকে যিশু খ্রীষ্টের একটি রং-করা ছবি এবং অন্য দিকে কেশববাবুর ফটোগ্রাফ।...কোণে একটি ছোট আলমারী, তাহার উপরের থাকে থিয়োডোর পার্কারের বই সারি সারি সাজানো রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।'

(এই বইগুলি, ১৮৬৩ সন হইতে ১৮৭০ সন পর্যন্ত লন্ডনে চৌদ্দ খন্ডে প্রকাশিত, থিয়োডোর পার্কারের গ্রন্থাবলী।)

এক রাত্রিতে যখন সুচরিতা তাহার মাসীর সম্বন্ধে পরেশবাবুর সহিত পরামর্শ করিতে আসিল, তখন পরেশবাবু 'তাঁহার নির্জন ঘরে আলোটি জ্বালাইয়া এমার্সনের গ্রন্থ পড়িতেছিলেন'। মনে রাখিতে হইবে থিওডোর পার্কার ও এমার্সন দুজনেই 'ইউনিটারিয়ান' খৃষ্টিয়ান। সুচরিতাও গোঁড়া হিন্দু ও পৌত্তলিকতায় আস্থাবান গোরার প্রতি আসক্তি হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রন্থ পড়িল। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

* নিশ্চয়ই আদিপর্ব বাদ দিয়া।

'সুচরিতা আজ প্রাতঃকাল হইতে নিজের শোবার ঘরে নিভৃতে বসিয়া 'খৃষ্টের অনুকরণ'—নামক ইংরেজ ধর্ম গ্রন্থ (টমাস-এ-কেম্পিসের লিখিত, মূলে ল্যাটিন ভাষায়) পড়িবার চেষ্টা করিতেছে…মাঝে মাঝে গ্রন্থ হইতে মন ভ্রষ্ট হইয়া পড়াতে বই-এর লেখাগুলি তাহার কাছে ছায়া হইয়া পড়িতেছিল—আবার পরক্ষণে নিজের উপর রাগ করিয়া বিশেষ বেগের সহিত চিত্তকে গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ করিতেছিল, কোনো-মতেই হার মানিতে চাহিতেছিল না।'

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, নূতন ঈশ্বরভক্তির প্রচারক কেশবচন্দ্র সংস্কৃত জানিতেন না, তাঁহার ভক্তি তিনি বাইবেল ও ইয়ং-এর 'নাইট থট্‌স' হইতে পাইয়াছিলেন। এই ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার কাছে প্রার্থনাও ব্রাহ্মেরা খৃষ্ট ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর ধর্মাচরণে ধ্যান ছিল এবং সাধকদের মধ্যে সমাধিও ছিল। উহা খৃষ্ট ধর্মের উপাসনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমাধির কথা এ-প্রসঙ্গে বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ বাঙালীর নূতন ঈশ্বরভক্তিতে সমাধি ছিল না। কিন্তু ধ্যান ও উপাসনার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা স্পষ্ট করা দরকার। ওয়ারেন হেস্টিংস কাশীতে একদিন হিন্দুর ধ্যান স্বচক্ষে দেখেন ও উহার সম্বন্ধে লেখেন,—

'I myself was once a witness of a man employed in this species of devotion at the principal temple of Banaris. His right hand and arm were enclosed in a loose sleeve or bag of red cloth, within which he passed the beads of his rosary, one after another, through his fingers, repeating with the touch of each (as I was informed) one of the names of God, whilst his mind laboured to catch and dwell on the idea of the quality which appertained to it, and shewed the violence of its exertion to attain this purpose by the convulsive movements of his features, his eyes being at the same time closed, doubtless to assist the abstraction.'

ইহা অবশ্য হিন্দুর ধ্যান। এই আচরণ ইউরোপীয়ের কাছে কিরূপ দুরূহ তাহার কথাও হেস্টিংস লিখিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন,—

'Doctrines as they must differ, yet more than the most abstruse of ours, from the common modes of thinking, so they will require consonant modes of expression, which it may be impossible to render by any known terms of Science in our language, or even to make them intelligible by definition.'

ইহার সহিত ব্রাহ্মদের উপাসনার তুলনা করিলেই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য কি বোঝা যাইবে। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের নিজের উপাসনার কথা বলিতে হয়। আমি উহার বর্ণনা যাঁহারা তাঁহাকে উপাসনা করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি।

একজন বাঙালীও ইয়েট্‌সকে বলিয়াছিলেন,

> 'Every morning at three —I know, for I have seen it, he sits immovable in contemplation, and for two hours does not awake from his reverie upon the nature of God.'

নূতন বাঙালী ঈশ্বরভক্তের চরিত্র এবং আচরণ কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'তে পরেশবাবুর ভক্তি, চরিত্র ও কার্যকলাপের বিবরণে দিয়াছেন। উপন্যাসটির মধ্যে যত তর্কবিতর্ক আছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া পরেশের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম বহু উর্ধে উঠিয়া গিয়াছে। উহার একটি মাত্র জায়গা উদ্ধৃত করিব। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

> 'এখন শীতের দিনে সন্ধ্যার সময় পরেশবাবু বাগানে যাইতেন না। বাড়ীর পশ্চিমদিকের একটি ছোট ঘরে মুক্ত দ্বারের সম্মুখে একখানি আসন পাতিয়া তিনি উপাসনায় বসিতেন, তাঁহার শুভ্রকেশ মুন্ডিত শান্তমুখের উপর সূর্যাস্তের আভা আসিয়া পড়িত।··· ভূমার সহিত মিলনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া যাহা শ্রেয়তম এবং সত্যতম পরেশের চিত্ত সর্বদাই তাহার অভিমুখে ছিল। এইজন্য সংসার কোনমতেই তাঁহার কাছে অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিতে পারিত না। এইরূপে নিজের মধ্যে তিনি একটি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই মত বা আচরণ লইয়া তিনি অন্যের প্রতি জবরদস্তি করিতে পারিতেন না। মঙ্গলের প্রতি নির্ভর এবং সংসারের প্রতি ধৈর্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। তিনি মনের মধ্যে এই কথাটাই কেবল থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন—'আমি আর কাহারও হাত হইতে কিছু লইব না, আমি তাঁহার হাত হইতেই সমস্ত লইব।'

পরেশের শান্তির উৎস কি তাহা দান্তে বলিয়াছিলেন,—

E la sua volontate
`e nostra pace*

আবার উনবিংশ শতাব্দীতে নিউম্যানও বলেন,—

'Lead Kindly Light, amid the encircling gloom,
Lead Thou me on !
The night is dark, and I am far from home—
Lead Thou me on.

* 'তাঁহার ইচ্ছাতেই আমাদের শান্তি।'

ব্রাহ্মধর্মের ঈশ্বর খৃষ্টধর্ম হইতে আসিয়াছিল ইহা ইতিহাসসম্মত সত্য কথা। তবু বলিতে হইবে ইহার সহিত হিন্দুর যুগ-যুগ প্রচলিত ও প্রচারিত ঈশ্বরে আস্থাও জড়িত হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুধর্মে বহু দেবতা এবং বহুদেবতার পূজা থাকিলেও হিন্দুর প্রাণে যে এক সর্বশক্তিমান পরমকরুণাময় ঈশ্বর বিরাজ করিতেন উহাও ইতিহাসসম্মত সত্য। তবে এই ঈশ্বরের উল্লেখ হিন্দুর কোনও শাস্ত্রে নাই, তাঁহার পূজা বা আরাধনার বিধিও নাই, তাঁহার মন্দির কোথাও নাই। তিনি অবস্থান করিতেন একমাত্র মনে—তাহাও সেই হিন্দুরই মনে। তবে একমাত্র দুঃখী হিন্দুই তাঁহাকে মনে রাখিত, অথবা একমাত্র দুঃখে পড়িলেই হিন্দু তাঁহাকে স্মরণ করিত। তিনি সমস্ত হিন্দুর কাছে, অত্যাচারিতের ত্রাণকর্তা, নিরাশ্রয়ের শরণ, দরিদ্রের ভরণকর্তা ও বঞ্চিতের ভিক্ষাদাতা ছিলেন। যে-সব দেবতাকে হিন্দুরা পূজা করিত তাঁহারা যখন হিন্দুর দিকে চোখ ফিরাইতেন না, তখন সমস্ত ভারতবর্ষে সমস্ত হিন্দু তাহাদের মনের মন্দিরে যে-ঈশ্বর সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতেন তাঁহার শরণ লইত। ধনী হিন্দু তাঁহার কথা জানিত না, সুখের সময়েও হিন্দু তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইত না।

কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম যখন হিন্দুর কাছে খৃষ্টধর্মের ঈশ্বরকে ধরিয়া দিলেন, তখন হিন্দুর প্রাণের সেই ঈশ্বর নূতন ঈশ্বরের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন, এবং তাহা দেখা গেল যেমন ব্রাহ্মদের মধ্যে, তেমনি হিন্দুর মধ্যেও। ঈশ্বরকে হৃদয়ে পাইবার যে আকুলতা বাঙালী দেখাইতে আরম্ভ করিল, তাহা নূতনের মধ্যে পুরাতনেরও প্রবেশের জন্য।

ইহার প্রধান ফল দেখা গেল, বৈষয়িক ব্যাপারের সহিত ঈশ্বর-প্রেমের মিশ্রণে। প্রচলিত হিন্দু ধর্মজীবনে উহা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র উহা জানিতেন, তাই লিখিয়াছিলেন,—

> 'আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কি শীত কি বর্ষা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন এবং তখনই পূজাহ্নিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনন্যমনে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহ্নিকের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইলে, মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তারপর অপরাহ্নে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন—ভোজনান্তে জমিদারী কার্য্যে বসেন। তখন কোন্ প্রজার সর্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্ মোকদ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্য্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ-ব্যক্তির পূজায়, আহ্নিকে, ক্রিয়াকর্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতেও

হরিনাম করিয়া থাকেন। মনে করেন, এসময় হরি-স্মরণ করিলে এ জাল করা অবশ্য সার্থক হইবে।'

বঙ্কিম এইসব বলিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এ ব্যক্তি কি হিন্দু?' এ যে হিন্দু সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ সে-সময়ের হিন্দুত্বে ঐহিক ও পারত্রিক ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিল। পারত্রিক হইলে বিষয় ছাড়িতে হইত, যেমন ছাতুবাবু করিয়াছিলেন, ঐহিক হইলে পারত্রিক ছাড়িতে হইত, যেমন এই জমিদারটি ও অন্যান্য সকল বৈষয়িক ব্যক্তিই ছাড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমের এই রচনার তারিখ ১৮৮৪। তখনই কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ফলে ঈশ্বর-ভক্তি হইতে বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টাকে স্বতন্ত্র রাখা সম্ভব ত আর একেবারেই রহিল না, এমনকি বিষয়বুদ্ধি ঈশ্বর-ভক্তির দ্বারা যতদূর সম্ভব ধর্মনিষ্ঠ হইল। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাস হইতেই দিতে পারিতাম, যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উল্লেখ করিয়া। কিন্তু দিব শরৎচন্দ্রের উপন্যাস হইতে—উহাতে ব্যাপারটার আরও অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক রূপ দেখা যাইবে। 'দত্তা' উপন্যাসে ব্রাহ্ম বনমালী জমিদার এবং ব্যবসা করিয়াও যথেষ্ট টাকা উপার্জন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে নরেনের মার উল্লেখ করিয়া বিজয়াকে বলিলেন,—

> 'তিনি মৃত্যুকালে নরেনকে কাছে ডেকে শুধু বলেছিলেন, "বাবা, শুধু এই আশীর্বাদ করে যাই, যেন ভগবানের ওপর তোমার অচল বিশ্বাস থাকে।" শুনেছি নাকি মায়ের এই শেষ আশীর্বাদটুকু নিষ্ফল হয়নি। নরেন এইটুকু বয়সেই ভগবানকে তার মায়ের মতই ভালবাসতে শিখেছে। যে এ পেরেছে, সংসারে তার আর বাকী কি আছে, মা?'
>
> বিজয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, 'এইটাই কি সংসারে সবচেয়ে বড় পারা, বাবা?'
>
> বনমালী দুই হাত দিয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া বলিয়াছিলেন, 'এইটেই সবচেয়ে বড় পারা, মা! সংসারের বাইরে—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এত বড় পারা আর কিছু নেই, বিজয়া। তুমি নিজে কোনদিন পারো আর না পারো, এ যে পারে তার পায়ে যেন মাথা পাততে পারো—আমিও মরণকালে তোমাকে এই আশীর্বাদ করে যাই।'

যখন ঈশ্বর-প্রেম জীবনে এইভাবে আনা হইতেছিল তখন নরনারীর প্রেমকে তাহার সহিত যুক্ত না করিলে সে প্রেমকে দেহোত্তর করা যাইত না। তখনকার বাঙালী সমাজে ইহার প্রয়োজন আরও বেশী ছিল। আমার অল্প বয়সেও যাহারা এইভাবে নরনারীর প্রেমকে দেহোত্তর করিতে পারে নাই তাহারা স্ত্রীর সহিত নিজেদের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ লইয়া কি কুৎসিত ধরনের কথা বলিতে পারিত তাহা আমি যখন কেরানী ছিলাম, শুনিতে না চাহিয়াও শুনিতে পাইতাম। আমার কাছে কেউ বলিত না বটে, কিন্তু কানে আসিত। লোকে যে জিনিষটাকে 'পর্ণোগ্রাফি' বলিয়া বলে তাহাকে বেশ্যাবৃত্তির

সহিত জড়িত করে। সেটা আসলে বেশ্যার অপমান। 'পর্ণোগ্রাফী' বেশ্যার নিজের উপভোগ্য নয়, এটা তাহার দোকানদারি—মক্কেলের জন্য। 'পর্ণোগ্রাফি'র আসল প্রচলন ও আদর যে গৃহস্থঘরে তাহা আমি দেখিলাম। ইহা হইতে নরনারীর প্রেমকে উদ্ধার করিবার জন্যই ঈশ্বর-প্রেমের সহিত যুক্ত করিতে হইল। উহার কিছু পরিচয় দিব। আমাদের বাল্যকালে বিবাহের উৎসবে একটা ধরণে 'প্রীতি উপহার' দিবার যে রেওয়াজ হইয়াছিল তাহা হইতেই।

এই 'প্রীতি উপহার' আর কিছু নয়, একটা ছাপানো কবিতা। কাগজটা অনেক সময়ই ক্রেপ পেপারে হইত। উহাতে ফুল-পাতাও ছাপা থাকিত। উহা বিবাহ সভায় বিতরণ করা হইত। কবিতাটি লিখিতেন, বরপক্ষ ও কন্যা পক্ষ দুই পক্ষেরই কোন বিদুষী মহিলা। সাধারণত, উহাতে তিনটি ভাগ থাকিত—(১) উৎসবের কথা; (২) বর ও বধূকে উপদেশ; (৩) ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। আমার মাতা কবিতা লিখিতে পারিতেন না, তাই তিনি আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে (আমি দশ বছরের, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র কুড়ির এদিক-ওদিক) রবীন্দ্রনাথের একটি গান ছাপাইয়া বিতরণ করেন, ও একটিকে ফ্রেম করিয়া বর-কন্যাকে দেন। কবিতাটি এই,—

'দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
বল, দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্তহৃদে দুটিতে মিলিতে চায়॥

* * *

অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে,
দুটি হৃদয়ের সুখ দুটি হৃদয়ের দুখ
দুটি হৃদয়ের আশা মিলায় তোমার পায়।

কবিতাটি লাল কালিতে ছাপা হইল, মা-ই পড়িয়া শুনাইলেন। তখন আমি ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিলেও বেশী যে বুঝিতাম তাহা নয়। তবে মহাভারত পড়িতাম ও বুঝিতাম। তাই যখন মা পড়িলেন—

'বল, দেব, কার পানে…' ইত্যাদি।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইহার মধ্যে বলরাম কি করিয়া আসিলেন।

সে যাহাই হউক, ইহা হইতেই বোঝা যাইবে যে বিলাস নরনারীর প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল উহা তাহার স্বকপোল-কল্পিত নয়। তবে একেবারে নিষ্কামভাবেও বলিতে পারে নাই। 'সকাম রূপতৃষ্ণা যাকে ভালবাসা ব'লে মানুষে ভুল করে…' ইত্যাদি যে সে বলিয়াছিল তাহার কারণ সে নিজে 'সকাম রূপতৃষ্ণা' জাগাইতে পারে না বলিয়া। সে বুঝিতে পারে নাই যে উহাও ঈশ্বরের দান, ঈশ্বরের আশীর্বাদেই পবিত্রীকৃত।

কিন্তু প্রেমের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্কের সমস্ত ধারণাটা বাঙালীর মধ্যে

আসিয়াছিল খৃষ্ট ধর্মের প্রোটেস্টাণ্ট রূপ হইতে। মার্টিন লুথার খৃষ্টান পুরোহিতদের চিরকৌমার্যের বিরোধী ছিলেন, ও বলিয়াছিলেন যে বিবাহ ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট। সেই মত প্রোটেস্টাণ্ট খৃষ্টান মাত্রেই গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

আমি উহার অন্তরতম উপলব্ধির প্রমাণ পাইলাম ম্যাক্সমূলারের জীবনী লিখিবার সময়ে। তখন তাঁহার স্ত্রী জর্জিনার লিখিত একটি ডায়ারী দেখি। উহার বেশীর ভাগ বিবাহের পূর্বে লেখা। তখন তিনি মিস্ গ্রেন্‌ফেল ছিলেন। প্রায় ছয় বৎসর তাঁহার পিতা এই বিবাহে সম্মতি দেন নাই ম্যাক্স-মূলারের আয় যথেষ্ট নয় বলিয়া। তবু জর্জিনা লিখিলেন যে, তাঁহার প্রথম কর্তব্য পিতৃ-আজ্ঞা পালন। কিন্তু চার বৎসরের বিবহের কষ্টে অবশেষে তিনি এত অসুস্থ হইয়া পড়েন যে ডাক্তার বলেন, পিতা বিবাহে স্বীকৃত না হইলে তাঁহার জীবনের আশা নাই। তখন পিতা সম্মত হইলেন। বহু বৎসর বিচ্ছেদের পর এই সংবাদ পাইয়া ম্যাক্সমূলার (বয়স চৌত্রিশ) অক্স্‌ফোর্ড হইতে মেইডেন্‌হেডে ভাবী শ্বশুরের বাড়ীতে গেলেন। তাঁহার ট্রেন সকাল ১১টা ২৫ মিনিটের সময় মেইডেন্‌হেড ষ্টেশনে পৌঁছিবার কথা। জর্জিনা তাঁহার শোবার ঘরে বসিয়া ১১টা ৪ মিনিটে লিখিলেন,—

'I am waiting for my great joy. God give me grace to bear it rightly.'

বিবাহের আগের দিন লিখিলেন,

'Oh! how happy we have been, sitting under our own ilex, and next time we are together it will be as husband and wife. What solemn words, yet how blessed. "Oh! God our heavenly father, thou hast led us hitherto and ordered everything to this end. Do thou still lead and guide us and enable us to offer ourselves, our souls and bodies as a sacrifice to thee···

বিবাহের দিন লিখিলেন,

'My weddingDay. "Bless the Lord, oh, my soul."* I go with perfect confidence and trust. May God bless us both and may our lives be devoted to Him, Amen.'

বিবাহের পর পত্নীর ডায়ারীটি দেখিয়া উহার একটি পৃষ্ঠায় ম্যাক্সমূলার লিখিলেন,

'There can be no true and lasting love that has not its spring and life in God.'

* **'Magnificat anima mea dominum'** এই স্তুতির প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ

ইহা হইতেই বোঝা যাইবে নূতন যুগের বাঙালীর মধ্যে ঈশ্বরে-ভক্তির সহিত নর-নারীর প্রেমকে যুক্ত করিবার ধারণা কোথা হইতে আসিল।

ম্যাক্সমূলারের পত্নী তাঁহার স্বামীর জীবনী দুই খণ্ডে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি নিজের বিবাহে বাধার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলেন, ডায়ারীর কথা বলেনই নাই। ম্যাক্সমূলারের মৃত্যু হয় ১৯০০ সনে, তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয় ১৯১৬ সনে। তখন পর্যন্ত নিশ্চয়ই তিনি ডায়ারীটি কাহাকেও দেখান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু সবটা পড়িয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। তাঁহার দুই পৌত্র (যাহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল) পড়িয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং এক আমি ছাড়া এই ডায়ারীটা আদ্যোপান্ত কেহই হয়ত পড়ে নাই। উহার গৌরবের কথা আমি আমার লিখিত ম্যাক্সমূলারের জীবনীতে বলিয়াছি। যে পৃষ্ঠাতে জর্জিনা গ্রেনফেল ম্যাক্সের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন লিখিয়াছিলেন, এই বই-এ তাহার প্রতিলিপি দিতেছি।

আশা করি বাঙালী পাঠক উহা আগ্রহের সহিত দেখিবেন।

ঈশ্বরে ভক্তিই হউক, কিংবা প্রেমের আরাধনাই হউক, আমাদের অল্প

June 9 - 1859 - "Thou doest all things well"! Great joy given me - God help me to bear it. Papa removes his veto & Max & I meet the day after tomorrow - "Tarry thou the Lord's leisure, be strong, & he shall comfort thine heart.

June 11. 11¼ AM. I am waiting for my great joy. God give us grace to bear it rightly.

বিবাহের পূর্বে ম্যাক্সমূলারের পত্নী, (তখন মিস জর্জিনা গ্রেনফেল) যে ডায়ারী রাখিয়াছিলেন, উহার একটি পৃষ্ঠা। ১১ই জুন ম্যাক্সমূলারের আসার অপেক্ষায়।

বয়স পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর একটা অভ্যাস ছিল নিজেদের বিশ্বাস ও আচরণ সম্বন্ধে বিচার করা। তাহারা যে-মতই ধরুক না, কিংবা যে-আচরণই করুক না কেন, উহার স্বপক্ষে-বিপক্ষে কি যুক্তি আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিত, বিনা বিচারে কিছুই করিত না। ইহা প্লেটোর উপদেশ মানিবার মত। তিনি বলিয়াছিলেন, 'যে-জীবন পরীক্ষিত হয় নাই, সে-জীবনের কোন মূল্য নাই।' সে যুগের বাঙালীর পরীক্ষা নির্ভুল হউক আর না-ই হউক, পরীক্ষার ত্রুটি হইত না। তাই আমরা অতি অল্প বয়সেও ধর্ম সম্বন্ধে বিচার এবং তর্কাতর্কি শুনিতাম এবং নিজেরাও করিতাম। ইহার ফলে বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে কি প্রভেদ আছে তাহাও বুঝিতাম। উহা গুরুগম্ভীর ভাবেও হইত, হাসিতামাসার ভাবেও হইত। আগে হাসিতামাসার ভাবে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে প্রভেদজ্ঞান দেখাইবার একটা দৃষ্টান্ত দিব। তখন আমি কলিকাতায় পড়ি, আমার বিবাহিতা বোনটি কিশোরগঞ্জ আসিয়াছে। তাহার বয়স আঠারো হয় নাই। সে আমাকে একটা চিঠিতে লিখিল যে, একটি অত্যন্ত গোঁড়া ব্রাহ্ম-প্রচারক আমাদের কিশোরগঞ্জের বাড়ীতে আসিয়া মার কাছে বক্তৃতা করিতেছেন, এবং তাহাতে মা বিরক্তি বোধ করিতেছেন। তারপর বোন লিখিল, 'ভাবছি, তাঁকে আমি "কালী গো কেন ল্যাংটা ফেরো" গেয়ে তাড়াব।' আমার বোনকে প্রচারক-মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতে বলিতেন। উহার সহিত শ্যামাবিষয়ের কি বিরোধ তাহা বোন বুঝিত।

কিন্তু ধর্মে ধর্মে প্রভেদ লইয়া আমরা যে শুধু হাসিতামাসাই করিতাম তাহা নয়, সত্যকার পার্থক্যের অনুভূতি অতি অল্প বয়সেও আসিত, পরে উপলব্ধিও আসিতে আরম্ভ করিল। একটা দৃষ্টান্ত দিব। আমি ১৯১৪ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া রিপন কলেজে আই-এ পড়িতে আসি। তখন আমার ষোল বছর পূর্ণ হইয়াছে। সে সময়ে আই-এ ক্লাসের ইংরেজী পুস্তকের মধ্যে অন্তত দুইজন বড় লেখকের পুরাপুরি জীবনী থাকিত। উহার একটি হইত ইংরেজ লেখকের, অপরটি কোন-না-কোন গ্রীক লেখকের। ইংরেজ লেখকের মধ্যে আমাকে মিল্টনের জীবনী পড়িতে হইয়াছিল, গ্রীক লেখকের মধ্যে জেনোফোনের। ১৯১৪ সনে আমি দ্বিতীয় বইটি নিজে পড়িতে আরম্ভ করি, কলেজের অধ্যাপকের সহায়তা ছাড়া। জেনোফোনের জীবনীতে একটি অধ্যায় ছিল জেনোফোন-লিখিত সক্রেটিসের মৃত্যুর বিবরণের আলোচনা। জেনোফোন উহা অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে লিখিয়াছিলেন, যেন তিনি সক্রেটিসের মৃত্যুতে দুঃখ বা ঐরূপ কোন আবেগ অনুভব করেন নাই। তাই জেনোফোনের জীবনীকার স্যার আলেকজাণ্ডার গ্র্যাণ্ট (তিনি এডিনবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন) লিখিলেন,—

> **To modern minds ideas there may seem to be something wanting in this picture, we might have prefcrred·to see the strong light relieved by shadow**

by some touch of nature at the thought of parting from family and friends, by some human misgiving on the threshold of the unknown.

তারপর তিনি লিখিলেন,

'But the ancients must be judged by their own standards. The Greek ideal was one of strength, and widely different from the later and deeper Christian ideal of strength made perfect in weakness.'

তখন আমার একটা অভ্যাস ছিল যেখানে কোন নূতন ধারণা বা ভাব পাইতাম তাহার নীচে লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দিয়া রাখিতাম, যাহাতে এগুলি ভাল করিয়া প্রণিধান করিতে পারি ও আমার পরিচিত ধারণা বা ভাবের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। জেনোফোনের জীবনীতে আমি এই দুইটি জায়গার নীচে লাল পেন্সিলে দাগ দিয়া রাখিলাম। আমার বুঝিতে কষ্ট হইল না গ্রান্ট কি পার্থক্যের কথা বলিতেছেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি গ্রীক অনুভূতি ও খৃষ্টীয় অনুভূতির মধ্যে যে পার্থক্য দেখিলেন, আমি ঠিক সেই পার্থক্য হিন্দু অনুভূতি ও খৃষ্টীয় অনুভূতির মধ্যেও আছে অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের বংশ শাক্ত ছিল, তাহার জন্য ধর্মের সঙ্গে শক্তিকে আশ্লিষ্ট করাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং গ্রীক মনোবৃত্তি বুঝিতে আমার কোনও কষ্ট হইল না। তবে এটাও বুঝিতে পারিলাম যে, খৃষ্টীয় মনোবৃত্তিতে মানুষের অসহায় অবস্থার অনুভূতিই প্রধান ছিল। সুতরাং খৃষ্টানগণ মনে করিত, ভগবানের করুণা ও সহায়তা ভিন্ন মানুষের নিজের চেষ্টায় ও শক্তিতে নিজেদের মঙ্গল করিবার সাধ্য নাই।

তখনকার দিনে বাঙালীর মধ্যে যদি ধর্মানুভূতি লইয়া চিন্তা করার অভ্যাস না থাকিত, এবং সেই অনুভূতির দ্বারা অল্প বয়সেও আমার মন গঠিত না হইত, তাহা হইলে আমি গ্রান্টের উক্তি পড়িয়া উহা যে বিশেষ করিয়া প্রণিধানের যোগ্য তাহা মনে করিতাম না।

তবে উপলব্ধির আগে অনুভূতি আসে। আগে হইতেই যদি অনুভূতি না থাকে তাহা হইলে উপলব্ধি শুধু তর্কের ব্যাপার হইয়া যায়, প্রাণে প্রবেশ করিতে পারে না। এই অনুভূতি আমার জীবনে অতি অল্প বয়সে ক্রমাগত ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিবার ও গাহিবার ফলে হইয়াছিল। কয়েকটি গানের কথা আগেও উল্লেখ করিয়াছি, আরও কয়েকটির উল্লেখ করা প্রয়োজন, কারণ অল্পবয়সে আমার যতটুকু ধর্মানুভূতি হইয়াছিল, তাহা অন্য গান ছাড়া এগুলির দ্বারা বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়াছিল।

এই গানগুলির একটি আমি প্রথম শুনি ১৯০৪ সনে। আমি এখনও উহা ছাপার অক্ষরে দেখি নাই, তবু কয়েকটা চরণ মনে আছে। সেগুলি এই,—

'জাগো, পুরবাসি! ভগবত প্রেমপিয়াসী!

... ...

শূন্য হৃদয় লয়ে নিরাশায় পথ চেয়ে
বরষ কাহার কাটিয়াছে ?
এস গো, কাঙ্গাল জন,
আজি তব নিমন্ত্রণ
জগতের জননীর কাছে।'

পরে শুনিয়াছি ইহা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা। আর একটি গান অবশ্য সুপরিচিত, উহা এই,—

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
রয়েছ হৃদয়ে গোপনে।'

এই গানটির অন্য যে-কথাগুলি আমার মনে বিশেষ করিয়া সাড়া জাগাইত সেগুলি এই,—

'কাল-পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।

এবং,—

'জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর
লোকলোকান্তরে যুগযুগান্তর—
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোনো বাধা নাই ভুবনে।'

আশ্চর্যের কথা এই যে, বিবাহের পর দেখিলাম, আমার স্ত্রীরও এইগুলি এবং আরও অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত শুধু যে জানা আছে তাহাই নয়, তাঁহার খুবই প্রিয়। ইহার একটা কারণ অবশ্য তাঁহার শিলং শহরে জন্ম ও বড় হওয়া; তারপর কলিকাতায় ব্রাহ্মগার্লস স্কুলে শিক্ষা। কিন্তু শিলং-এর ও ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের অন্য মেয়েও আমি দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এই ব্যাপার দেখি নাই। আসলে আমার পিতামাতা ও তাঁহার পিতামাতা একই ধরণের ছিলেন, আমাদের পরিবার ও তাঁহাদের পরিবার একই ভাবাপন্ন ছিল। এ-কথাও বলা প্রয়োজন, আমরা যেমন হিন্দু ছিলাম তেমনই তাঁহারও হিন্দু ছিলেন। আমি যে ধর্মানুভূতির কথা বলিতেছি, তাহা এক শ্রেণীর সমস্ত বাঙালীরই ছিল, ইহাতে হিন্দু ও ব্রাহ্মের মধ্যে কোনো বিরোধ দূরে থাকুক, প্রভেদও ছিল না। তাই বিবাহের পর দেখিলাম, আমি যে ব্রহ্মসঙ্গীত গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে পারি, সেগুলি আমার স্ত্রীও তেমনি পারেন। এমন কি তিনি 'জাগো, পুরবাসি, ভগবত-প্রেমপ্রয়াসী' গানটিও গাহিতেন।

তবে আমার ক্ষেত্রে গান ছাড়া আর একটা বড় জিনিষও আমার ধর্মানুভূতির পিছনে ছিল। সেটা পূর্ববঙ্গের আকাশ। আমার বাল্যকাল পূর্ববঙ্গের গ্রাম অঞ্চলে কাটিয়াছিল বলিয়া আমি সেই আকাশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পূর্ণিমার রাত্রিতে, শীতকালে

হইলেও আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। বর্ষাকালে মেঘ ও চন্দ্রের খেলা দেখিতাম। আকাশ মেঘলা হইলে চন্দ্রের চারিদিকে রামধনুর রং-এর একটা মন্ডল দেখা যাইত। আমাদের বিশ্বাস ছিল, আমাদের মৃত পিতৃপুরুষেরা, সেই মন্ডলের মধ্যে বাস করেন। ধর্মের অনুভূতি বেশী হইত অন্ধকার রাত্রিতে তারাখচিত আকাশ দেখিয়া। আমি সর্বদাই সেই আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। বিশেষ করিয়া ১৯১০ সনের কথা বলি। তখন আমার বারো বৎসর বয়স। বনগ্রামে গিয়া মুক্ত উঠানে পাটির উপর শুইয়া প্রথম হ্যালীর ধূমকেতু দেখিতাম। ক্রমে ক্রমে উহা নামিতে নামিতে আমাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশঝাড়ের পিছনে ডুবিয়া গেল। তখন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে তারা ও ছায়াপথ দেখিতে আরম্ভ করিলাম। একটা ছোট দূরবীন ছিল, তাহার ভিতর দিয়া যাহা দেখিতাম তাহা যেন ছায়াপথ ও তারামন্ডলীর পিছনেও আর এক অনন্ত লোক। উহার দিকে চাহিয়া শুধু পার্থিব জীবনের ব্যাপারই নয়, পৃথিবীর অস্তিত্বও ভুলিয়া যাইতাম। সেই অনন্তলোকে যাইবার জন্য একটা ব্যাকুলতা জাগিত। জিজ্ঞাসা করিতাম না—

> 'স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়
> আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমির-তলে ?'

—স্থির বিশ্বাস ছিল—আছেই। হয়ত শুধু আমারই নয়, সমস্ত বাঙালীরই সেই বিশ্বাস ছিল।

কিন্তু সে বিশ্বাসের ও অনুভূতির যুগ চলিয়া গিয়াছে। বাঙালী এক সংস্কারের পরিবর্তে আর এক সংস্কার পাইয়াছে। আমি কোন দিন বাঙালীর সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করি নাই বলিয়া আমাকে বলিতে হয় নাই—

'বাঙালী, তুমি এক সংস্কারের পরিবর্তে আর এক সংস্কার পাইয়াছ। আমি এক জীবন যৌবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় পাইব ?' আমি আমার জীবন আমার বিশ্বাসের মধ্যে যাপন করিয়াছি। কিন্তু নিজের কথা ভুলিয়া জাতির কথা মনে করিলে, আমার মনে ইংরেজ কবির এই কথাগুলি আসে—

> 'The sea of faith
> Was once, too, at the full, and round earth's shore
> Lay like the folds of a bright girdle furl'd.
> But now I only hear
> Its melancholy, long, withdrawing roar,
> Retreating, to the breath
> Of the night-wind, down the vast edges drear
> And naked shingles of the world.'

নবম অধ্যায়

কল্পনা না সত্য

'আজি হ'তে শতবর্ষ আগে' বাঙালীর জীবন ও মনের রূপ কি ছিল তাহার বর্ণনা শেষ করিলাম। মনে হইতেছে, ইহার পরও কথা উঠিবে। যাঁহারা এই কাহিনী এতদূর পর্যন্ত পড়িবেন তাঁহারা হয়ত, হয়ত বলি কেন—নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটা তুলিবেন—'ইহা কি সত্য বিবরণ, না লেখকের রচা কথা ?' আমি এই আপত্তি অবশ্য মানি না, তবে কখনই বলিব না যে, উহা অসঙ্গত বা অযৌক্তিক সেজন্যই এ অধ্যায়টি লিখিতেছি।

আমার কাহিনী অবিশ্বাস করিবার একটা কারণের কথা আমি সর্বদাই স্মরণ রাখিয়াছি। বর্তমানে বাঙালী জীবন যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা আগেকার জীবন হইতে এত বিভিন্ন যে, আজিকার বাঙালীর পক্ষে উহার যথাযথ ধারণা করা শক্ত কাজ। এছাড়া আর একটা বাধাও আছে। আমি বর্তমান যুগের বাঙালী লেখকের ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবন সম্বন্ধে লেখা যতটুকু পড়িয়াছি—বেশী পড়িয়াছি বলিতে পারি না, তবে ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য এক হাঁড়ি ভাত টিপিতে হয় না—তাহাতে মনে হইয়াছে, তাঁহারা সে যুগের বর্ণনা দিবার সময়ে বর্তমান কালের যত পাশ্চাত্ত্য ফ্যাশনেবল্ বুকনী আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা আরোপ করিতেছেন। ইহাতে যে চিত্র সৃষ্ট হইয়াছে তাহা প্রায় 'কিউবিস্ট' ছবির মত। আমি যাহা নাকি স্বাভাবিক তাহার উপর জ্যামিতিক 'কিউব' চাপাইতে প্রস্তুত নই। তবু দুই যুগের স্বাভাবিক চিন্তা ও অনুভূতি দুই রকমের হইতে পারে। সেজন্যই আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে।

প্রথম কৈফিয়ৎ এই যে, আমি যে-জীবনের কথা লিখিয়াছি সেটা সে-যুগেরও লৌকিক জীবন নয়, উহা সংসার-যাত্রার মধ্যে আবদ্ধ থাকা দূরে থাকুক, সংসার যাত্রাকে অতিক্রম করিয়া অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছিল। এই দুই স্তরের জীবনের কথা সে যুগের সকল বাঙালী লেখকই দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শুধু রবীন্দ্রনাথের কথাই উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিলেন,—

> 'গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা, এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্য চর্চা করিত কেবল শশিভূষণ ও গিরিবালা। ইহাতে কাহারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোনো বিষয় নাই। কারণ গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্যবিকশিত এম-এ, বি-এল।'

কিন্তু এই জীবনও প্রচলিত সংসারযাত্রা হইতে স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন হইতে পারিত না, মুস্কিল হইত ইহা হইতেই। দুই ধারার জীবন পরস্পর সংলগ্ন থাকার ফল কখনও সুখের হইত, কিন্তু অনেক সময়েই দুঃখের হইত। অবশ্য ইহার কারণ ছিল। সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া বাঙালীর ইতিহাসের

মূল কথাই ছিল প্রচলিত ধারার সহিত নূতন ধারার সংঘাত। এই সংঘাতে নূতন যেখানে জয়ী হইত সেখানে সুখ দেখা যাইত, যেখানে পরাজিত হইত সেখানে দুঃখ দেখা যাইত। জাতীয় ক্ষেত্রে মোটের উপর নূতনই জয়ী হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। যুদ্ধে জিতিতে হইলে যেমন বহু ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে হয়, অথবা আহত হইতে হয়, সামাজিক এবং সংস্কৃতিগত সংঘাতের সম্বন্ধেও তাহা বলা চলে। শেষ জাতীয় জয় বহু ব্যক্তিবিশেষের আত্মবলিদানের দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছিল।

কিন্তু অনেক সময়ে সাংসারিক পরাজয় মানসিক বিজয়ে রূপান্তরিত হইত। শশিভূষণ ও গিরিবালার বেলাতে তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহারা দুইজনেই দুঃখ পাইল বটে, কিন্তু এত দুঃখেও সুখের ভাগী হইল। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটির গৌরবই এই শেষ মানসিক সুখে। এক বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শূন্যহৃদয় লইয়া যখন শশিভূষণ কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দৈবক্রমে হারানো পুরানো জীবনের সঙ্গে তাহার আবার যোগ হইয়া গেল। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

> 'সেদিনকার সেই সুখের জীবন কিছুই অসামান্য বা অত্যধিক নহে, দিনের পর দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাহার নিজের অধ্যয়ন কার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপনা কার্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল ; কিন্তু গ্রাম প্রান্তরের সেই নির্জন দিন যাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সুখ, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি সমস্তই যেন স্বর্গের মত দেশকাল বহির্ভূত এবং আয়ত্তের অতীত রূপে কেবল আকাঙ্ক্ষা-রাজ্যের কল্পনাছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল।'

যাঁহারা শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা', 'পল্লী-সমাজ', 'পথ নির্দেশ' ইত্যাদি গল্প ও তাঁহার 'দত্তা' উপন্যাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন শেখর, রমেশ, গুণীন্দ্র ও নরেন্দ্র কোথা হইতে আসিল। এমন কি নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' উপন্যাসেও এইরূপ একটি বাঙালী যুবক আছে।

এ সব তো গেল উপন্যাসের কথা, বাস্তব জীবনেও এই ধরণের চরিত্র ছিল, এবং ছিল বলিয়াই গল্প-উপন্যাসে এই ধরনের চরিত্রের আরও পূর্ণতর রূপ দেখানো সম্ভব হইয়াছিল। তবে এই ধরনের জীবন-বরণের প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা দরকার। আমি যে বলিয়াছি, আমার পাঠকবর্গের মনে আমি যে-বর্ণনা দিয়াছি তাহা সত্য কি না এই প্রশ্ন উঠিতে পারে—ঠিক এই প্রশ্ন যাহারা এই মানসিক জীবন আমাদের মরুতুল্য ঐহিক অস্তিত্বের মধ্যেও যাপন করিত তাহাদের মনেও জাগিত। তাহারা এই জীবনের ভাবে বিভোর থাকিয়াও হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিত ও নিজেদের জিজ্ঞাসা করিত—তাহারা যে-জগতে বাস করিতেছে তাহা সত্যই পার্থিব, না কল্পনা-রাজ্যের মায়া ; তাহাদের জীবন কি স্বপ্ন-সঞ্চরণের মত ? এইরূপ সংশয়ের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

আমার বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ। একদিন হঠাৎ, আমার মা আমার কাছে

আসিয়া বলিলেন, 'নীরু একটা গান শুনবি?' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গাহিলেন,—

'সখী, ওই বুঝি বাঁশী বাজে—বন মাঝে কি মনোমাঝে।
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল।
বলগো, সজনি, এ-সুখ রজনী
কোনখানে উদিয়াছে, বনমাঝে কি মনোমাঝে।'

আমি গানটা শুনিলাম বটে, কিন্তু সে-বয়সে উহার পুরোপুরি অর্থটা বুঝিতে পারিলাম না, শুধু এইটুকু উপলব্ধি হইল যে কোনও একটা সুখানুভূতির ব্যাপার সত্য না কল্পিত এই প্রশ্নটা এই গানের মধ্যে আছে। মা-ও আমাকে বুঝাইবার কোনও চেষ্টা না করিয়া, নিজের মনে 'বনমাঝে কি মনোমাঝে' এই কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখন অবশ্য তাঁহার এরূপ দোমনা হইবার কারণ বুঝিয়াছি। তখনকার দিনের বাঙালী জীবনে—অবশ্য যে জীবনের কথা আমি লিখিতেছি তাহাতে যে-সব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আসা-যাওয়া করিতেছিল সেগুলি সত্য না কল্পিত এই প্রশ্ন জাগিত—অতি অস্পষ্টভাবে হইলেও। সুখের মধ্যেও মানুষ যে অকারণে পর্যোৎসুক হইয়া পড়ে তাহার কথা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিও বলিয়াছেন। পর্যোৎসুকতার আনন্দ-বিষাদের অধীর খেলা যে-মানুষের মধ্যে নাই, তাহাকে আমি মনুষ্য-পদবাচ্য মনে করি না। সে-যুগে যাঁহাদের মনে আমি যে-প্রশ্নের কথা বলিলাম সে-প্রশ্ন জাগিত, তোলাপাড়া করিত, তাঁহারা এটাও বুঝিতে পারিতেন যে উঁহাদের জীবনে বাহির ও ভিতর, সংসার এবং মন যেমন পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, তেমনি পরস্পরের সহিত আড়াআড়িও করিত। সুতরাং কখনই বলা যাইত না যে, কোন একটা ব্যাপার শুধু বাহিরের এবং অন্য একটা ব্যাপার ভিতরের অর্থাৎ মনের।

তাঁহাদের জীবন অনেকটা সমুদ্রের নিকটে নদীর মত ছিল। উহাতে দিনে ও রাত্রে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা আসিত—জোয়ারের জল মানসিক ভাব, ও ভাঁটার কাদা বাস্তব জীবন। এই ওঠা-পড়ার ধাক্কায় পড়িয়া আমার মা হয়ত তাঁহার সংশয় চাপিতে না পারিয়া বালক পুত্রের কাছেই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়া। আমি তাঁহার গাহিবার ধরনেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি শুধু গান শুনাইতেই চাহেন নাই, একটা মনোভাবের কথাও প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন।

আমরা একটা দিবারাত্রির আবর্তনের মধ্যে আছি, আলো-আঁধারের আসা-যাওয়ার মধ্যে আছি, সুতরাং দোমনাও হইতেছি, এই অনুভূতি আমাদের অল্প বয়সেও ছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯১৯ সনের গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি কিশোরগঞ্জ গিয়াছি। তখন এম-এ পড়ি। আমার দুইটি বোনের মধ্যে যেটি বড় সে বিবাহিতা, তখন সে বাপের বাড়ী আসিয়াছিল। আমায় বয়স একুশ ও তাহার বয়স সতেরো। আমার বোনেরা তখন রবীন্দ্রনাথের নূতন

প্রকাশিত 'গীত-পঞ্চাশিকা' হইতে কতকগুলি গান শিখিয়াছে। হঠাৎ বড় বোনটি 'তোমার বাস কোথা যে পথিক' এই গান হইতে হাসিমুখে হাত নাড়িয়া এই কয়টা কথা আবৃত্তি করিল, 'হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানিনে, মোদের বলে দেবে কে ?' কি ঝোঁকের বশে উহা করিল তার আভাসও অবশ্য দিল না।

আসল কথাটা কি তাহা বলি। আমাদের জীবনে তখন 'একি হেলাফেলা সারা বেলা, একি খেলা আপন সনে' ক্রমাগত চলিত। মন ও জীবন সর্বদাই দোলায়মান থাকিত। সুতরাং তাহাতে পূর্ণ স্থিরতা যেমন কখনই আসিত না, তেমনি পূর্ণ-অস্থিরতাও অবিচ্ছিন্ন হইত না। স্থিরতা-অস্থিরতার মধ্যেই আমাদের মানসিক জীবন কাটিত।

সেই মানসিক জীবন ছিল লোকোত্তর অনুভূতির জীবন। উহার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা সংসারী লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, কারণ জ্ঞানেন্দ্রিয় দেখে শুধু আর একজনের বাহ্যিক আচরণ। সেই আচরণের আন্তরিক তাৎপর্য সকলেই বিচার করে নিজের মন দিয়া, অর্থাৎ নিজের মন অন্যের উপর আরোপ করিয়া। সুতরাং কাহারও মন যদি সঙ্কীর্ণ ও বৈষয়িক হয়, তাহা হইলেই সে অন্য ব্যক্তি আসলে যাহাই হউক না কেন তাহাকে তেমনি সঙ্কীর্ণ ও বৈষয়িক বলিয়াই মনে করে। যাহারা চোর তাহারা বলে, 'সব শালাই চোর।' অন্যের মনের যে জায়গা বোম্বার মনের পরিধির বাহিরে তাহার অস্তিত্ব সে কখনও স্বীকার করে না, করিতে পারেও না। লৌকিক ও লোকোত্তরের মধ্যে এই অপরিচয় কখনও পরিচয়ে পরিণত করা যায় না। জীবনে এই অপরিচয় সবচেয়ে দুঃখ ও যাতনার কারণ হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘটিলে।

কিন্তু লোকোত্তর জীবনও দেখা যাইত প্রায় সমস্তটাই বাঙালীর বাল্যে ও যৌবনে। এই জীবন হইতেই তাহার সমস্ত অবৈষয়িক প্রচেষ্টা আসিত। যেমন, আর কিছু না করিলেও সে পড়াশুনা লইয়া থাকিত; আরও একধাপ উঠিলে লেখক বা ধর্ম্মপ্রচারক হইত; ১৯০৫ সন হইতে যখন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরম্ভ হইল, তখন হইতে তাহারা হয় কংগ্রেসকর্মী বা বিপ্লববাদী হইতে আরম্ভ করিল। কি করিয়া টাকা উপার্জন করিবে, এমন কি, কি করিয়া সংসার চালাইবে ও সংসার করিবে তাহার চিন্তা পর্যন্ত করিত না।

ছাত্রাবস্থায় এইসব 'আদর্শবাদীরা' কি করিত তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। উহা এইরূপ,—

> 'আমরা পাঁড়াগেয়ে ছেলে, কলিকাতার ইঁচড়ে পাকা ছেলের মত সকল জিনিষকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই, সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম,'রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া

বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেঞ্চ চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। শহরের ছেলেরা এইসব লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙাল বলিত।'

যখন অনেক ক্ষেত্রেই 'লোকোত্তর' জীবন ছাত্রাবস্থার সঙ্গেই শেষ হইয়া যাইত, তখন প্রায়শই জীবিকা বা অর্থ এই দুইই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু সে সময়েও যাহারা 'লোকোত্তর' জীবন বজায় রাখিত তাহাদের পরিচয় শরৎচন্দ্র তাঁহার একটি গল্পে দিয়াছেন।

সে-গল্পের নায়কটি এইরূপ,—

'পথিক যেমন গাছতলায় রাঁধিয়া খাইয়া হাঁড়িটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায় এবং তখন যেমন চাহিয়া দেখে না হাঁড়িটা ভাঙিল কি বাঁচিল, সংসারে শতকরা নব্বুই জন লোক ঠিক এমনি করিয়াই সরস্বতীর কাছ হইতে কাজ আদায় করিয়া মা-লক্ষ্মীর রাজপথের ধারে নির্মমভাবে তাঁহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়—একবার ফিরিয়াও দেখে না, তিনি ভাঙ্গিলেন, কি বাঁচিলেন। গুণেন্দ্র সেইরূপ করে নাই। সে চিরদিন যে-ভাবে শ্রদ্ধা করিয়া সেবা করিয়া আসিয়াছিল, উকিল হইয়াও ঠিক তেমনই সরস্বতীর সেবা করিতে লাগিল। তাহার পড়িবার ঘর পুস্তকে ভরিয়া উঠিয়াছিল।'

এইভাবে যাহারা এক ধরণে বা অন্য ধরণে অথবা নানা ধরণে 'লোকোত্তর' জীবন চালাইয়া যাইত তাহাদের আমি 'আপন ভোলা' বাঙালী বলিয়া থাকি। তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র কি ছিল তাহার আভাস রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখায় অনেকবার দিয়াছেন। দুইটির উল্লেখ করিব। যে একটি গানে তিনি ইহা বলিয়াছেন, উহার প্রথম কথা এই—

'এই তো ভালো লেগেছিল, আলোর নাচন পাতায় পাতায়।'

শেষ কথাগুলি এইরূপ—

'লাগলো ভালো, মন ভুলালো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই
দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাই তো এড়াই।
মজেছে মন, মজলো আঁখি—
মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি,
ওদের আছে অনেক আশা, ওরা করুক অনেক জড়ো—
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই, চাইনে হতে আরো বড়ো।'

তরুণ বয়সে আমরা ভাইবোনে মিলিয়া সব সময়েই এই গানটা গাহিতাম। বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য লইয়া যে গাহিতাম তাহা নয়, ভাল লাগিত বলিয়াই গাহিতাম। কিন্তু তখন বুঝিতাম না যে, অজ্ঞাতসারে আপনভোলা বাঙালীর মনের কথা বলিতেছি।

আপনভোলা বাঙালীর আর একটি মূলমন্ত্র বা প্রাণের গভীরতম কথা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাতে আছে। উহার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি,—

'বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে।
ধন নয়, মান নয়
একটুকু বাসা করেছিনু আশা।

*　　　*　　　*

'তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক' দিনের
কাঁদা আর হাসা
ধন নয়, মান নয়,
কিছু ভালবাসা
করেছিনু আশা।'

বাঙালীর বাঙালী বলিয়া যতদিনের ইতিহাস আছে তাহার সবটুকু জুড়িয়া ভাল বাঙালী শুধু আপন ভোলা বাঙালীর মধ্যেই দেখা দিয়াছে। বাকী যাহারা ধন, মান, ঐহিক ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছে তাহাদের বাসনা যখন শক্তির অল্পতা বা সমাজের ভয়ের দ্বারা সংযত থাকে নাই তখন তাহারা নামে চোর-ডাকাত না হইলেও চরিত্র ধর্মে তাহাই হইয়াছে। খুব ভালর দিকে গেলে জুগুপ্সাজনক বিষয়ী লোক হইয়াছে। আমি আমার দীর্ঘ জীবনে ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই।

বেশীর ভাগ বাঙালী অবশ্য আপনভোলা হইয়া জন্মে না, তাহারা বিষয়ী হইয়াই জন্মে। সুতরাং তাহারা নিজেদের শক্তি অনুযায়ী অল্পবিস্তর বৈষয়িক সাফল্য লাভ করে। শোচনীয় ব্যাপার ঘটে তখন, যখন যে-বাঙালী চরিত্রধর্মে আপনভোলা হইয়া জন্মে সে হঠাৎ প্রবৃত্তির বশে অথবা না খাইতে পাইবার মিথ্যা ভয়ে নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৈষয়িক হইতে চায়। সে দুই কূলই হারায়। ইহাও আমি অনেক দেখিয়াছি।

একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষের আসল জীবন মানসিক জীবন। এই জীবনেই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রকাশ। গরু সারা জীবন ঘাস খাইয়াই তাহার নিজের ধর্মে স্থিত থাকিয়া জৈব ধর্ম পালন করে। মানুষ যতটা প্রাণী তাহারও কৃত্য ক্রমাগত ঘাস খাইয়া যাওয়া। তবে মানুষের মন আছে বলিয়া সে সাক্ষাৎভাবে ঘাস খায় না, গৌণভাবে ঘাস খায়—যেমন ওকালতী করিয়া, চাকরী করিয়া, ব্যবসা করিয়া রূপান্তরিত ঘাস খায়। যাহারা জীবধর্মেরই দাস তাহারা মনে করে ইহাই জীবনের সার্থকতা। জীবধর্মে যে উহা সার্থক তাহা আমি অস্বীকার করিব না। কারণ তাহারাও সন্তানের জন্ম দিয়া মানুষের জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। কিন্তু ইহার বেশী কিছু নয়। তবে মনুষ্যধর্ম যাহার আছে, তাহার সংসারকে ভুলিয়া থাকিবার প্রয়োজন আছে। বাঙালীর পক্ষে ইহার প্রয়োজন আরও বেশী,

কারণ বাঙালী একদিকে মন দিলে সবদিকে দূরে থাকুক অন্য কোনো দিকেই মন দিতে পারে না। এমন কি সে মানসিক জীবনের দিকে ঝুঁকিলেও অতীতে কেবল স্মার্ত ও নৈয়ায়িক হইয়াছে। তখন তাহার মানসিক জীবনের সৃষ্টি মাকড়সার জাল তৈরী করার মত হইয়াছে। এর বেশী কিছু করিতে হইলে বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের যোগ করিতে হয়। কিন্তু এখানেও একরোখা হইবার অভ্যাস থাকার জন্য একটা উল্টা উৎপত্তি দেখা দেয়, সেটা আপন ভোলা হওয়া। তবে এই ভাবে 'এক-বগ্গা' হওয়া ও অন্যভাবে 'এক-বগ্গা' হওয়ার মধ্যে মূলগত প্রভেদ আছে। বাঙালীর ইতিহাসে যাহাদের কাজ বা কথা চিরস্থায়ী হইয়া আছে তাহাদের সকলেই 'আপন ভোলা' বাঙালী—সহজিয়া, আউল, বাউল, বৈষ্ণব, সাধক কবি, এমন কি কথক। অন্য সকলের স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে যে-বাঙালীর আজও মানসিক জীবন লাভ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা আছে, তাঁহারা সকলেই নব্যতম নৈয়ায়িক বা নব্যতম স্মার্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বড়াই করিয়া বলেন 'আমরা মার্কসিস্ট'। নিজেদের সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের সামান্যমাত্রও বিচারবুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে বুঝিতেন যে তাঁহাদের 'মার্কসিস্ট' হওয়ার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই, কেবলমাত্র বাঙালী চরিত্রের যাহা চরম ধর্ম তাহারই বশে তাঁহারা 'মার্কসিস্ট' হইতেছেন। সে ধর্মের কথা বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে বলিয়াছেন—'বাঙালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা কখনও বাঙালীর বশীভূত নহে।' মার্কসও বলিয়াছিলেন যে, মানব চরিত্র ও জীবন বাহ্যিক অবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহার মত মিথ্যা কথা তাঁহার পূর্বে কোন মনীষী বলেন নাই। মানুষ যদি অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, সে মানুষই হইত না, জন্তু হইয়া থাকিত। মানুষের নিজস্ব ধর্ম বাহ্যিক অবস্থা না মানা। তাহা না হইলে মানুষ যেখানে সহজে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়—যেমন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, সেই স্থান স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া শীতপ্রধান দেশে, এমন কি দারুণ শীতের দেশেও চলিয়া যাইত না। মানুষ আফ্রিকা ছাড়িয়া ইউরোপে গেল, আবার যখন এসিয়া ছাড়িয়া এখন যাহা আমেরিকা হইয়াছে সেখানে, এমন কি সেই আমেরিকারও দক্ষিণ প্রান্তে ভয়াবহ প্যাটাগোনিয়া পর্যন্ত হাঁটিয়া হাঁটিয়া গেল, তখন মানুষের সংখ্যা এত বেশী ছিল না, কিংবা বাসস্থানের অল্পতা, এমন কি শিকারের জন্য প্রতিযোগিতা এমন ছিল না যে, তাহাকে পুরাতন বাসস্থান ছাড়িয়া অজানা নূতন দেশের দিকে যাইতে হইবে। মানুষ সর্বদাই মনুষ্যধর্মের বশে পুরাতন ও পরিচিতকে ছাড়িয়া নূতন ও অপরিচিতের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই বৃত্তি না থাকিলে প্রস্তর যুগের মানুষ বর্তমান যুগের মানুষ হইত না। কিন্তু এইভাবে মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে হইলে মানুষকে আপনভোলা হইতে হয়।

জ্ঞানমার্গের পন্থী হইলেও, অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির দ্বারা মানবজীবনের সার্থকতা বিচার করিলেও, মানসিক জীবনই যে মানুষের সর্বোচ্চ জীবন তাহা স্বীকার করিতে হয়। বিশ্বে কোনও অনৈসর্গিক স্রষ্টার দ্বারা বা প্রাকৃতিক

নিয়মে যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা, নৈসর্গিক স্তরেই রহিয়াছে, একমাত্র মানুষই তাহার মনের দ্বারা বিশ্বে নূতন জিনিষ আনিতে পারিয়াছে—যেমন মন্দির-প্রাসাদ, ক্ষেত ও উদ্যান, জীবনযাত্রার সহায়তার জন্য মনুষ্য নির্মিত যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি। আবার বিশ্বে সম্পূর্ণ নূতন একটা সৃষ্টি মানুষের মন হইতে হইয়াছে, যেমন বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা। যে সুখ মানুষের জীবনে আসিতে পারে তাহা যত না আসে প্রাকৃতিক জিনিষ হইতে, তাহার চেয়েও অনেক বেশী আসে মানুষের মানসিক সৃষ্টি হইতে। এই কথা নব্য জড়বাদীরা কেন ভুলিয়া যান তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।

কিন্তু বাঙালী কেন অবস্থাচক্রে অবস্থায় বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহার কারণও আমি ভাল করিয়াই জানি। তাহার এতটুকু আত্মপ্রত্যয় নাই, এতটুকু নিজের শক্তিতে আস্থা নাই যাহাতে তাহার ভরসা থাকে যে, অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক না কেন সে উহাকে অতিক্রম করিয়া নিজের প্রাপ্য লাভ করিতে পারিবে বা নিজের জীবনে সার্থকতা আনিতে পারিবে। তাই তাহার জীবনের যত ব্যর্থতা, যে-ব্যর্থতা তাহার মানসিক শক্তির অভাব বা চরিত্রের দুর্বলতা হইতে আসিয়াছে, তাহা বাহ্যিক অবস্থার উপর চাপাইয়া আত্মগ্লানি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিষ্কৃতি পায় কি? সব সময়েই তাহার আত্মপ্রবোধ আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

আমি সারাজীবনে কখনও বাহ্যিক অবস্থাকে আমার জীবনের একমাত্র বা সর্বাপেক্ষা প্রবল নিয়ন্ত্রক বলিয়া মানি নাই। যাঁহারা আমার ইংরেজীতে লেখা আত্মজীবনীর দ্বিতীয়খণ্ড পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাছে ইহা অজানা নাই যে, কি বাহ্যিক অবস্থার ভিতর দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছে। কিন্তু প্রতিকূল বাহ্যিক অবস্থার আঘাতে আমি ভাঙিয়া পড়ি নাই। যখন জীবিকার দায়ে আমার জীবনের কৃত্য প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, সে-সময়ে একদিন কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচী আমাকে বলিলেন, 'ভাই, আগুন ছিল, কিন্তু পেটের দায়ে চাপা পড়ে গেল।' তিনি কথাটা স্নেহের বশেই বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার ভাল লাগে নাই। চাপা-পড়া সব সময়েই চাপা-পড়া মানিয়া লওয়ার উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমি চাপা পড়ি নাই এই কারণে যে, আমি আপনভোলা হইয়া জন্মিয়াছিলাম। ইহার জন্য আমার বুদ্ধিপ্রসূত কোনও কৃতিত্ব নাই। আমি সজ্ঞানে আপন ভোলা হইতে পারি নাই, কেহ তাহা পারে না। আমি যে আপনভোলা তাহা বুঝিয়াছি মাত্র বৃদ্ধ বয়সে, আপনভোলা হইবার জন্য যতটুকু ক্ষতি হইতে পারে তাহা ভোগ করিবার পর। তবে আশ্চর্যের কথা এই আপনভোলা হইবার লাভও আছে। সেই লাভও আমার হইয়াছে।

আমার চরিত্রের এই ধর্মের জন্য আমি বাল্য বয়স হইতে আজ পর্যন্ত নিন্দাভাজন হইয়াছি। বাল্যকালে আমাকে সকলেই অকর্মণ্য মনে করিত; যুবাবয়সে আমাকে হয় পাগল না হয় দায়িত্বজ্ঞানশূন্য বাউণ্ডুলে বলিত; তারপর যখন লেখক হিসাবে নিজেকে কিছু কর্মক্ষম বলিয়া দেখাইলাম তখন হইতে দেশদ্রোহী বলিতে আরম্ভ করিল। আমাকে দেশদ্রোহী বলা খুবই সহজ,

কারণ বর্তমানে দেশপ্রেমিক হওয়ার অর্থ দেশের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থকে এক করা। সুতরাং যে আপনভোলা হইয়া নিজের স্বার্থ দেখে না, উপরন্তু পরের স্বার্থে ব্যাঘাত জন্মায় তাহাকে ঐহিক স্বার্থের উপাসকেরা দেশদ্রোহী বলিবে না কেন? তাহারা মনে করিবেই আমি জীবনে স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারি নাই বলিয়াই স্বার্থবোধের বশবর্তী হইয়া দেশের নিন্দা করিতেছি। আমি আপনভোলা হইতেও পারি ইহা কেহ ভাবিতেও পারে নাই।

আশ্চর্যের কথা এই যে, বিদেশীরা আমার এই চরিত্রধর্ম দেখিয়াছে। উহার বহু দৃষ্টান্ত দেশে থাকিয়া বিদেশীর সহিত পরিচয় হইবার পর পাইয়াছি, আবার প্রবাসী হইয়া যত বিদেশে গিয়াছি সর্বত্রই দেখিয়াছি। শুধু একটি ঘটনার কথা বলিব, কারণ এ-ধরণের ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা কল্পনা করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তখন আমি দিল্লীতে আছি, প্রবাসী হইবার বৎসর দুই-তিন আগেকার কথা। একদিন একটি পরমা সুন্দরী ইতালিয়ান তরুণী দিল্লীর বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে পড়াশোনা করিয়া আমাদের দেশ দেখিতে আসিয়াছিল। আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পর সে ইংরেজীতে বলিয়া উঠিল, '**you are a Baul** (বাউল)।' আমি তো হতভম্ব। একটি ইতালীয়ান তরুণী আমাকে চরম আপনভোলা বাঙালী বলিয়া কি করিয়া চিনিল? সে তো আগে ভারতবর্ষে আসে নাই। কিন্তু সে যে চিনিল তাহাতেও সন্দেহ নাই।

বিদায় লইবার সময়ে সে আমাকে আরও পুরস্কার দিয়া গেল, ফরাসী ভাষায় বলিল, '**Je vous embrasse** (আমি আপনাকে চুম্বন করি)' ও আমার গলা জড়াইয়া চুম্বন করিল। ইহা কি রবীন্দ্রনাথের 'কবির পুরস্কার' নয়? কোন লেখক ইহার বেশী সমাদর প্রত্যাশা করিতে পারে?*

সে যাহাই হউক, আমাদের সমাজে বৈষয়িক ব্যক্তি আছে উহা নিন্দার বিষয় নয়। সকল দেশে ও সকল সমাজেই বৈষয়িক ব্যক্তি থাকে ও থাকিবে, তাহাদের সংখ্যা বেশী হইতে বাধ্য। আসলে দুঃখের বিষয় যেটা সেটা এই—আমাদের সমাজ হইতে অবৈষয়িক ব্যক্তি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তবে বাঙালী সমাজে যে তাহারা একেবারে লোপ পাইয়াছে তাহা বলিব না, বলিতে পারি না। কিন্তু অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা নিপীড়িত, বঞ্চিত, ও লাঞ্ছিত হইয়া হার মানিয়াছে, সুতরাং বৈষয়িক বাঙালীর সম্মুখে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সাহস নাই।

সেই সাহস নাই বলিয়া যাঁহারা আমার বর্ণনায় বিশ্বাস করিতে পারেন, যাঁহাদের ভরসাতেই আমি বইখানা লিখিতেছি তাঁহারাও সহজে আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই অবিশ্বাস বা সন্দেহ যে পুরাপুরি শুধু বৈষয়িকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা আক্রমণ হইতেই আসিবে তাহা নয়,

* তবে আমি বাঙালী পুণ্ডরীকের কাছেও পরাজয় স্বীকার করি নাই। আমি দেশে পুণ্ডরীক ও বাহিরের জগতে কবি।

তাঁহাদের জীবনে একটা শোচনীয় অভাব হইতেও আসিবে। সেটা বাংলার নৈসর্গিক মূর্তির সহিত অপরিচয়। এখন যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে থাকেন, তাঁহাদের সকলকে কলিকাতাবাসী বলিলেই চলে—যাঁহারা দেহে কলিকাতায় থাকিতে পারেন না, তাঁহারাও মনে কলিকাতায় থাকেন। কলিকাতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৮ সনেও লিখিয়াছিলেন—'হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া !'

'সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা।
ইঁটের 'পরে ইঁট,
মাঝে মানুষ কীট—
নাইকো ভালবাসা, নাইকো খেলা।'

তাই তিনি নদীয়া পাবনা অঞ্চলে অথবা বীরভূম অঞ্চলে চলিয়া যাইতেন। এখনকার কলিকাতা তো আরও ইঁটের কারাগার। তবে আমার ব্যাপার আশ্চর্য। আমি বারো বৎসর বয়সে আমার জন্মস্থান ও আমার মনের একমাত্র মাতৃভূমি পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসি। তাহার পর বত্রিশ বৎসর কলিকাতায় বাস করি। ১৯৪২ সনে বাংলা দেশও ছাড়িয়া আসি, ছাব্বিশ বছর পরে অল্প কয়েকদিনের জন্য আবার কলিকাতায় যাই। সুতরাং প্রাকৃতিক বাংলা দেশ প্রায় আশীবৎসর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই। মনুষ্যনির্মিত বাংলাদেশও ছেচল্লিশ বৎসর দেখি নাই। তবুও প্রাকৃতিক বাংলাদেশই আমার কাছে সত্যকার বাংলা দেশ, আমি আপনভোলা বলিয়া।

আমার প্রথম বাংলা বই-এ আমি বলিয়াছি যে, একবার এক সুদূর দেশে, ইস্রায়েলে, গিয়া বাংলার জলের দেখা পাইলাম। উহার পর আবার দেখা পাইলাম একটা সুদূরতর দেশে—ক্যানাডায়, ১৯৭৬ সনে। ক্যানাডায় মনুষ্য-জীবন যাহাই হউক, সেই দেশটা এমন জিনিষ যে, মানুষের অস্তিত্বকে খর্ব করিয়া দিতে পারে,—এমন কি লোপ পর্যন্ত করিয়া দিতে পারে। আমি বাংলার বিরাট প্রান্তর দেখিয়া ভাবিতাম, উহার কি বিস্তার! কিন্তু শস্য-প্রসূতি মধ্যক্যানাডার বিস্তারের কাছে কিছুই নয়। আমি উইনিপেগ হইতে চারদিকে গিয়াছি, উহা ম্যানিটোবা প্রদেশের মধ্যে। কিন্তু চেহারায় মহাদেশ, কোথায় যে শস্যক্ষেত্রের শেষ হইয়াছে তাহার ধারণাও হয় না। উইনিপেগ হইতে উত্তর দিকে যাইতে যাইতে শূন্য প্রান্তর দেখিলাম, তখন বহু দূরে হইলেও মনে হইল হাড্‌সন-বে'র কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। এই বুঝি বিশালকায় হরিণ 'মুস্' বা সাদা ভালুক দেখা দিবে! উইনিপেগ, হ্রদ, সেও কম বিস্তৃত নয়, কাছেই ছিল।

আবার দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের মত হ্রদ ও তাহার ভিতর দিয়া স্রোতস্বতী নদী অন্তঃসলিলা হইয়া বহিয়াছে। হ্রদের একপার হইতে অন্যপার কোথাও দেখা যায় না—তাহা মিশিগান হ্রদের তীরে, ঈরি হ্রদের তীরে, অন্টারিও হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি। শুধু এক জায়গায় দেখিলাম, এই জলরাশি

বাংলার জলের মত নয়—তাহা নায়গ্রা প্রপাতে। উহা যেন ক্যানাডার স্থির জলরাশিকে মন্দ্রিত করিবার 'অরগ্যান', দিনরাত গম্ভীর গর্জনে, সঙ্গীতের মত গর্জনে ক্যানাডার জলের অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অন্যত্র জল স্থির; হ্রদেও স্থির, নদীতেও স্থির। সেই জল আমার বাল্যকালের দেখা বিরাট নদীর জলের মত।

ক্যানাডার যে নদীকে ক্যানাডার গঙ্গা বলা যায় সেই সেণ্ট-লরেন্স আমি নানা জায়গায় দেখিয়াছি। শুধু একটি জায়গার কথা বলিব। জায়গাটা শহর, অণ্টারিও হ্রদের তীরে 'কিংস্টন'। তবে আমি অণ্টারিও হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া পিছনে যে কোনও শহর আছে তাহা অনুভবও করি নাই, কারণ আমার সামনে ছিল অণ্টারিও হ্রদের পূর্বপ্রান্ত, যেখান হইতে সেণ্ট-লরেন্স আবার নদী হইয়া বাহির হইতেছে। দেখিলাম দূরে শ্যামায়মান, এমন কি ধূসর, একটা ছোট দ্বীপ। কিন্তু চারিদিকে জল। একবার এই দৃশ্য ১৯০৭ সনে ত্রিপুরা জেলার আজবপুর স্টীমার-স্টেশনে দাঁড়াইয়া ভৈরব-বাজারের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলাম। প্রায় সত্তর বৎসর পরে আবার সেই দৃশ্য চোখের সম্মুখে ক্যানাডায় দেখা দিল।

জল দেখিলে নির্বাসিত ব্যক্তির দেশের কথা মনে পড়ে। তাই নির্বাসিত ইহুদীরা ব্যাবিলনের নদীর তীরে বসিয়া জেরুজালেমকে স্মরণ করিয়া বলিত,—

'Super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus
Cum recordaremur Sion.……'

'By the rivers of Babylon, there we sat down, yea we wept, when we remembered Zion.

'We hanged our harps upon the willows in the midst there of···

'How shall we sing the Lord's song in a strange land ?

'If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget *her cunning.*'

(The Old Testesment, Psalm 137)

তবু তাহারা এই গানটি গাহিয়াছিল। অণ্টারিও হ্রদের পূর্বপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সম্মুখে সেণ্ট-লরেন্সের জল দেখিয়া আমারও মনে একটা গানের ভাব ও সুর জাগিয়াছিল, মেঘনার কথা মনে করিয়া। কিন্তু সে গানের ভাষা বা সুর দিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাই যিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁহার ভাষায় ও সুরে আমার সেই ভাবের স্বরূপ দেখাইব।

আমি আমার বঙ্গজননীকে যেন বলিলাম,—

'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে ॥
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,

আমার   লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে—
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে ॥
ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান।
পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে—
তুমি,   অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে ॥*

আপনভোলা হইলেও আমার প্রাণের জোয়ার কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা আমি কখনও ভুলি নাই।

* আমার মনের ভাবের পুরাপুরি ধারণা করিতে হইলে পাঠক-পাঠিকা এই গানটির যে-রেকর্ডটি কলিম সরাফী সাহেব করিয়াছেন, সেটি শুনিবেন।

দশম অধ্যায়

বাঙালীর জাতীয় অদৃষ্ট

এই বইএর পরের খণ্ডে বাঙালী কেন আত্মঘাতী হইল তাহার মূলগত কারণ দেখাইতে চেষ্টা করিব। এখানে সমগ্র বইটার সূত্র রাখিবার জন্য উহার আভাষ দিতেছি। ব্যক্তিবিশেষের অকাল মৃত্যু হইলে তাহার ক্ষেত্রে জন্মগত দোষ বা দৌর্বল্যের সঙ্গত কোনো কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া লোকে উহাকে অদৃষ্টের উপর আরোপ করে। জাতির ক্ষেত্রেও কি তাহা বলা যায়?

আমি অন্তত বাঙালীর জাতীয় জীবনের দুর্নিবার অধোগতি দেখিয়া এক ধরণের অদৃষ্টবাদে আস্থাবান হইয়াছি। আমি ব্যক্তির বেলাতে জনপ্রচলিত অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করি না, সুতরাং জাতির ক্ষেত্রে যে-অদৃষ্টের কথা বলিতেছি তাহাও পরিচিত অদৃষ্টবাদের মত নয়। একটা নূতন ধরণের অদৃষ্টের ধারণা আমার মনে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে প্রথমে আসে। তিনি এই নূতন অদৃষ্টবাদ তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে উপস্থাপিত করেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, 'কপালকুণ্ডলা'র সাহিত্যিক বিচার করিতে গিয়া কেহই উহার উল্লেখ করেন নাই। এই উপন্যাসটি ১৯১৬-১৮ সনে আমার বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক ছিল। সেই সময় পর্যন্ত উপন্যাসটি লইয়া যত আলোচনা হইয়াছিল, তাহার সবই আমি পড়িয়াছিলাম। কিন্তু কোনো আলোচনাতেই 'কপালকুণ্ডলা'র আসল অর্থ পাই নাই।

আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র উনত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবা হইলেও প্রথম সংস্করণেই উহার একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু ভুল বুঝিবার অবকাশও তিনিই দিলেন পরের সংস্করণে এই ব্যাখ্যা যে-পরিচ্ছেদে ছিল, সেটিকে বাদ দিয়া। নিজের রচনার ব্যাখ্যা নিজে করা অন্যায়, এই কথা তিনি ১৮৯৩ সনে 'ইন্দিরা'র পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করিবার সময়ে লিখিয়াছিলেন। ১৮৭৩ সনে প্রথম প্রকাশের সময়ে 'ইন্দিরা'র দৈর্ঘ্য ছিল ৪৫ পৃষ্ঠা, ১৮৯৩ সনে উহার দৈর্ঘ্য হয় ১৭৭ পৃষ্ঠা। সেজন্য এই সংস্করণের 'ইন্দিরা'কে তিনি নূতন বই বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তিনি লিখিলেন, 'পাঠক বোধহয় "ইন্দিরা"র কলেবর-বৃদ্ধির কারণ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহা বুঝাইতে গেলে আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে অবিধেয় কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি নাই।' নিশ্চয়ই এই ধারণা হইতেই তিনি 'কপালকুণ্ডলা'র স্বকৃত ব্যাখ্যাটি বাদ দিয়াছিলেন। বাঙালী পাঠকের সাহিত্যিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উপর আস্থা রাখিয়া তিনি তাহা করেন। কিন্তু সেটা তাঁহার ভুল হইয়াছিল। একটু রসবিরোধী হইলেও বাঙালীর মানসিক পরিণতির কথা মনে রাখিয়া তাঁহার সেই অধ্যায়টি রাখা উচিত ছিল।

আমার মাতার সেই প্রথম সংস্করণের 'কপালকুণ্ডলা' ছিল। তাহাতে আমি সেই ব্যাখ্যাটি পড়ি। সুতরাং সাহিত্য-পরিষদের তরফ হইতে যখন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন সংস্করণ সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন আমার বইখানা তাঁহাদের দেই। উহা হইতে পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদটি তাঁহারা একটি পরিশিষ্টে (ঐ সংস্করণের ৯৮-পৃষ্ঠায়) ছাপান। সেই ব্যাখ্যার প্রধান প্রধান অংশ উদ্ধৃত করিয়া 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের সূত্রে বাঙালী জাতির আত্মঘাতী হইবার মূলতত্ত্ব বুঝাইব।

এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে জন স্টুয়ার্ট মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজীতেই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কথাগুলি এই—

> 'Real Fatalism is of two kinds. Pure or Asiatic Fatalism, the Fatalism of OEdipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract Destiny, will overrule them, and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined. The other kind, modified Fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desires, and our desires by the joint influence of the motives presented to us and of our individual character.'

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার জীবনে এই অদৃষ্টের সংঘাতের কথা লিখিয়াছিলেন। সেই আলোচনার প্রায় সবটুকুই উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিলেন,—

> 'পাঠক মহাশয় "অদৃষ্ট" স্বীকার করেন ? ললাটলিপির কথা বলিতেছি না, সে ত অলস ব্যক্তির আত্মপ্রবোধ জন্য কল্পিত গল্পমাত্র। কিন্তু কখন কখন যে, ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য পূর্ব্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, তৎসিদ্ধিসূচক কার্য্যসকল এরূপ দুর্দ্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মানুষিক শক্তি তাহার নিবারণে অসমর্থ হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন কিনা ? সর্ব্বকালে দূরদর্শিগণ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদৃষ্ট য়ুনানী* নাটকাবলির প্রাণ ; সর্ব্বজ্ঞ সেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাক্‌বেথের আধার ; ওয়ালটর স্কটের "ব্রাইড্‌ অব লেমারমুরে" ইহার ছায়াপাত হইয়াছে ; গেটে প্রভৃতি জর্ম্মান কবিগুরুগণ ইহার স্পষ্টতঃ সমালোচনা করিয়াছেন। রূপান্তরে, "ফেট্‌" ও "নেসেসিটি" নাম ধারণ করিয়া ইহা ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রধান মতভেদের কারণ হইয়াছে।

* য়ুনানী অর্থাৎ গ্রীক অ্যাটিক ড্রামা—এস্কিলস, সোফোক্লেস ও ইউরিপিডিস্‌ প্রণীত। 'য়ুনানী' শব্দটা Ionian হইতে আসিয়াছে, যবনও তাই।

'অস্মদ্দেশে এই "অদৃষ্ট" জনসমাজে বিলক্ষণ পরিচিত। যে কবিগুরু কুরুকুলসংহার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি এই মোহমন্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে দীক্ষিত ; কৌরব-পাণ্ডবের বাল্যক্রীড়াবধি এই করালছায়া কুরুশিরে বিদ্যমান ; শ্রীকৃষ্ণ ইহার অবতার স্বরূপ। "যদাশ্রৌষং জাতুষাদ্বেশ্মনস্তান্" ইত্যাদি ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে কবি স্বয়ং ইহা প্রাঞ্জলীকৃত করিয়াছেন। দার্শনিকদের মধ্যে অদৃষ্টবাদীর অভাব নাই। শ্রীমদ্ভগবদগীতা এই অদৃষ্টবাদে পরিপূর্ণ। অধুনা "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইতি কবিতার্দ্ধ পাঠ করিয়া অনেকে অদৃষ্টের পূজা করেন। অপর সকলে "কপাল!" বলিয়া নিশ্চিত থাকেন।

'অদৃষ্টের তাৎপর্য্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অস্মদাদির কার্য্য সকলকে গতিবিশেষ প্রাপ্ত করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদীও অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মনুষ্যচরিত্রের অনিবার্য্য ফল ; মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল ; সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল ; কিন্তু সেই সকল নিয়ম মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে।'

এইখানে বঙ্কিম আর একটা মন্তব্য প্রসঙ্গক্রমে করিলেন। সেটা এই—'কবিদিগের "Destiny" দার্শনিকদিগের "Fate" এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি, ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিতেছি না।'

ইহার পর বঙ্কিম 'কপালকুণ্ডলা'র কথায় আসিলেন। তিনি বলিলেন,—

'কোন কোন পাঠক এ গ্রন্থশেষ পাঠ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বলিতে পারেন, "এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না ; গ্রন্থকার অন্যরূপ করিতে পারিতেন।" ইহার উত্তর, "অদৃষ্টের গতি। অদৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। গ্রন্থারম্ভে যেখানে যে বীজ বপন হইয়াছে, সেইখানে সেই বীজের ফল ফলিবে। তদ্বিপরীতে সত্যের বিঘ্ন ঘটিবে।"

'এক্ষণে আমরা অদৃষ্টগতির অনুগামী হই। সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে ; গ্রন্থি বন্ধন করি।'

ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃষ্টবাদ, ব্যক্তিবিশেষের জীবন সম্বন্ধে। ব্যক্তির জীবনের মত জাতির জীবনও এইরূপ অদৃষ্টের নিয়মে আবদ্ধ। বাঙালীর জাতীয় জীবনে আমি এইরূপ অদৃষ্টেরই লীলা দেখিলাম। ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থান বাঙালীর চরিত্রকে যে ধর্ম দিয়াছিল তাহাই তাহাকে সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে চালাইয়াছে। এই চরিত্রে কতকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল, আবার কতকগুলি অসাধারণ দোষও ছিল। বাঙালী ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিজের চেষ্টায় উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার চরিত্রের দোষ ও দুর্বলতা দূর করিতে পারে নাই। তবে নূতন জীবন গড়িয়া

তুলিবার প্রবল ইচ্ছার জন্য সেগুলি সংযমিত ছিল। ১৯১৭-১৮ সন হইতে যখন বাঙালী-জীবনে শক্তিক্ষয় দেখা দিতে আরম্ভ করিল, তখন আবার বাগানে আগাছার মত দোষগুলি গুণকে চাপা দিয়া বাড়িতে লাগিল। চরিত্রধর্মের জন্য কপালকুণ্ডলার মৃত্যু হইল. কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য সে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়া লইল, নবকুমারকে বলিল, 'আমি অবিশ্বাসিনী নহি। একথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।'

বাঙালীর চরিত্রে সেই দৃঢ়তা ছিল না। তাই সে বলিতে পারে নাই, 'আমি দেশের জন্য প্রাণ দিতে বদ্ধপরিকর। তাহাব জন্য বিনা দুঃখে, বিনা ক্ষোভে মরিব।' সে দেশের সেবাও অজ্ঞানে প্রবৃত্তির ঝোঁকে করিয়াছে, আবার অজ্ঞানে প্রবৃত্তির বশেই আত্মহত্যাও করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অদৃষ্টের কথা বলিতে গিয়া ধৃতরাষ্ট্রের কথা বলিয়াছিলেন। আমার যে-বয়স তাহাতে বাঙালী জীবনের পরিণাম দেখিয়া আমি ধৃতরাষ্ট্রের মত বিলাপ করিতে পারি এই রূপে—'যদা শ্রৌষং ১৯২০ সনে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধতা করিবার জন্য সদলবলে নাগপুর গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং ১৯২৪ সনে সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইল ও পরে এই ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতা করিয়া মহাত্মা গান্ধী মাত্র আট ভোটে জিতিবার পর কংগ্রেস ত্যাগ করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং ১৯২৫ সনে চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু হইল তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং ১৯৩০ সনে কলিকাতার উপকণ্ঠে বাদায় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত আইনবিরুদ্ধ লবণ প্রস্তুত করিলেন কিন্তু চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুন্ঠন করিয়া বহু বাঙালী যুবক প্রাণ হারাইল, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং ১৯৩২ সনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাংলা দেশ সম্বন্ধে 'কম্যুনাল অ্যায়োআর্ড' দিলেন কিন্তু বাঙালী তাহাতে বাধা দিল না, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং ১৯৩৭ সনে ভারতীয় কংগ্রেস বাংলার কংগ্রেসকে ফজলুল হকের প্রজাপার্টির সহিত সহযোগিতা করিতে দিলেন না. তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং পরে সেই সনেই মুসলিম লীগ ও প্রজাপার্টি মিলিয়া বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন করিল, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং ১৯৩৯ সনে সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীকে ভোটে হারাইয়া পরে তাঁহার বিরুদ্ধতার জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রেয় বাংলা দেশকে বিভক্ত করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং ১৯৪৭ সনে মুসলমান বাঙালীর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও হিন্দু বাঙালীর ভোটে বাংলাদেশ বিভক্ত হইল, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং স্বাধীন ভারত সৃষ্ট হইবার পর শরৎচন্দ্র বসু বাংলা

দেশের রাজনৈতিক জীবন হইতে নির্বাসিত হইলেন ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হইলেন, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয় !'

শুধু রাজনৈতিক ব্যাপারের কথাই বলিলাম, আরও অনেক বিলাপ করিতে পারিতাম। এই সকল হেঁয়ালির মত মন্তব্যের বিস্তারিত আলোচনা এই বই-এর শেষ খণ্ডে করিব।

বাঙালী জাতির অদৃষ্টের ফল দেখিয়া সে-যুগের একজন বিশিষ্ট বাঙালীর কর্মফলের কথা আমার মনে পড়ে। তিনি তুলসী গোস্বামী, শ্রীরামপুরের বিখ্যাত জমিদার রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর পুত্র ও বাংলার কংগ্রেসের 'বিগ্ ফাইভে'র একজন ছিলেন। অল্প লোকেরই জন্ম হইতে এরূপ সৌভাগ্য হয়। কুলগৌরব, অর্থ, রূপ, শিক্ষা কিছুরই তাঁহার অভাব হয় নাই। তাঁহার সামাজিক আচার-ব্যবহারও অতি ভদ্র ও অমায়িক ছিল। আমি শরৎচন্দ্র বসুর সেক্রেটারীর কাজ করিবার সময়ে কংগ্রেস দলের প্রায় সমস্ত গণ্য-মান্য ব্যক্তিকেই দেখিতাম। কিন্তু অবিচার হইলেও অন্য সকলকে বাদ দিয়া কেবল মাত্র শরৎ ও সুভাষ বসু, কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ ও তুলসীবাবুকেই প্রকৃত ভদ্রলোক বলিয়া মনে করিতাম। তাঁহার জীবনের গতি তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল! চারিত্রিক দুর্বলতা হইতে তিনি সবই হারাইলেন।

তিনি বিলাতফেরৎ ছিলেন এবং সাহেবী বালিগঞ্জের রেনীপার্কের বাড়ীতে সাহেবী ধরনেই লর্ডসিংহের স্বামিত্যাগিনী কন্যার সহিত থাকিতেন। তিনি অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, ও ইংরেজী এত শুদ্ধ উচ্চারণে বলিতে পারিতেন যে অ্যাসেম্বলীর সভাপতি স্যর জর্জ হোয়াইট বলিয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অক্সফোর্ড অ্যাক্সেন্ট শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু আমি সেই বালিগঞ্জের বাড়ীতেও তাঁহাকে বাঙালী পোশাক-পরা বাঙালী ভদ্রলোকের মতই দেখিয়াছি। পরেও কখনও তাঁহাকে সাহেবী পোশাকে সাহেবী ঢং করিতে দেখি নাই।

তবে শরৎবাবুর কাজ করিবার সময়ে তাঁহার জীবনের আর একটা দিক দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখ পাইতাম। শরৎবাবু তাঁহার সহিত আলাপ করিতে চাহিলে তুলসীবাবুকে টেলিফোনে জানাইতে আমাকে বলিতেন। তখন (প্রায়ই সকাল বেলা দশটা-এগারোটার সময়ে) একটি ভৃত্য টেলিফোন ধরিয়া আমাকে বলিত যে, তুলসীবাবুর শরীর অসুস্থ, তিনি টেলিফোনে আসিতে পারিবেন না। শরৎবাবুকে এই কথা জানাইলে তিনি শুধু মুখ বিকৃত করিয়া থাকিতেন। প্রথম আমি ব্যাপারটা কি বুঝি নাই, পরে বুঝিলাম সেই সময়ে তুলসীবাবু মত্তাবস্থায় অজ্ঞান হইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া উত্তরাধিকার ক্রমে লক্ষপতি হইয়াও শেষে আর্থিক ব্যাপারে তিনি এমনই অবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, অতি সামান্য টাকার জন্যও ছোট আদালতে তাঁহার উপর ডিক্রীজারী হইত। আমাকে কলিকাতার খবরের কাগজে কাগজে সাব-এডিটরদের বলিয়া দিতে হইত এই খবরটা যেন প্রকাশিত না হয়।

সব চেয়ে আমার পীড়াদায়ক হইয়াছিল এই কথাটা জানা থাকাতে যে, তিনি

লর্ডসিংহের কন্যার মোহে পড়িয়া ধর্মপত্নী পরিত্যাগী হইয়াছিলেন। আমাকে এই দুঃখের ব্যাপারে কখনও কখনও জড়িত হইতে হইত। মাঝে মাঝে একটি বাঙালী মহিলা টেলিফোনে অতি মিষ্ট ও করুণ কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তুলসীবাবু শরৎবাবুর কাছে আছেন কিনা! যদি বলিতাম আছেন, তখন অত্যন্ত মিনতি জানাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া দিতে বলিতেন, সে কি সঙ্কোচ ও কি আর্ত ভাব আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। আমি অবশ্য বুঝিতাম মহিলাটি কে, এবং শুধু কন্ঠস্বর শুনিয়াও আমার চক্ষে কালিদাস ও ভবভূতির বর্ণনা ভাসিয়া উঠিত। প্রথমে—

"বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি ॥"

কিংবা—

"পরিপান্ডু দুর্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী ॥"

তুলসীবাবুর পত্নীও সুপরিচিত জমিদারের কন্যা ছিলেন। তিনি অবশেষে স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। আশা করি তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেহ মধ্যবর্তিনী হইয়া বাধার সৃষ্টি করে নাই। তখন তুলসীবাবু প্রধানত আর্থিক কারণে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। আমি সে-সময়ে তাঁহার বালিগঞ্জের বাঙালী অঞ্চলের বাড়ীতে গিয়াছি। সেখানে তাঁহার প্রতি আমার আরও বেশী সহানুভূতি হয়। উহার পরই আমি দিল্লী চলিয়া আসি। সুতরাং তাঁহার জীবনের পরিণাম আমি দেখি নাই।

তেমনি বাঙালী জীবনের পরিণামও স্বচক্ষে দেখি নাই। ১৯৪২ সন হইতে ১৯৭০ সন পর্যন্ত দিল্লীতে ছিলাম, তাহার পর হইতে ইংলন্ডে আছি। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে ভুলিয়া থাকা যত সহজ, নিজের জাতিকে ভোলা তত সহজ নয়। তবে সে মনে রাখা তো দুঃখ ছাড়া কিছুই নয়।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥